নারায়ণ দেবনাথ

কমিক্স-সমগ্র

এই পর্বে থরে থরে সাজানো রয়েছে অগ্রন্থিত ও দুষ্প্রাপ্য বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা, শুঁটকি মুটকি, বাহাদুর বেড়াল ও ডানপিটে খাঁদু। কৌশিকের সম্পূর্ণ রঙিন তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের অ্যাডভেঞ্চার কমিক্সের পাশাপাশি ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইন্দ্রজিৎ রায়ের গোয়েন্দা কাহিনি। এছাড়া ঐতিহাসিক কমিক্স, পাদপূরণ, ছবিতে ধাঁধা সমেত আরও অনেক চমক।

এই প্রথম শিল্পীর দুর্লভ স্কেচবুকের খসড়া পাতা মেলে ধরা হল পাঠকের দরবারে। সঙ্গে একাধিক বিলুপ্তপ্রায় অলংকরণের সংকলন। তবে বিস্ময়ের টুপিতে সেরা পালকটি হল তাঁর নির্ভেজাল আত্মকথা।

এ ছাড়াও ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং নারায়ণ দেবনাথ।

প্রচ্ছদচিত্র- নারায়ণ দেবনাথ
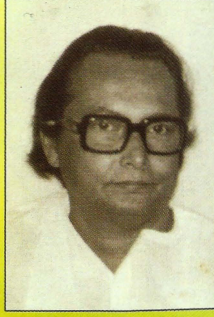
নারায়ণ দেবনাথ

চিত্র-সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ দেবনাথের জন্ম ১৯২৫ সালে হাওড়া শিবপুরে। গত ষাট বছরের অধিক সময় ধরে দেড় হাজারেরও বেশি সিরিয়াস ও মজার কমিক্স সৃষ্টি করে বাংলার শিশু-সাহিত্যে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বেশির ভাগ কমিক্সের কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও চিত্ররূপ তাঁর নিজেরই। এমন নজির বিশ্বে বিরল। তাঁর প্রথম মজার কমিক্স হাঁদা-ভোঁদা ২০১২ সালে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল।

কমিক্সে জনপ্রিয়তা লাভের অনেক আগে থেকেই তিনি ছিলেন নিখুঁত অলংকরণ শিল্পী। সমকালীন প্রায় সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকের লেখার অলংকরণ করেছেন। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ-অলংকরণগুলি বিশ্ব-প্রকাশনার এক দুর্লভ সম্পদ।

স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ এই শিল্পী আজ ৮৬ বছর বয়সেও সমান দক্ষতায় এঁকে চলেছেন চিত্তহারী হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, নন্টে-ফন্টে...।

পশ্চাৎ চিত্র- অর্ক পৈতণ্ডী

নারায়ণ দেবনাথ
কমিক্‌স-সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

লালমাটি

নারায়ণ দেবনাথ
কমিক্স-সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

চণ্ডী লাহিড়ী

শান্তনু ঘোষ

লা ল মা টি

Narayan Debnath Comics-samagra-ii
Edited by
Chandi Lahiri & Santanu Ghosh

ISBN 978-93-81174-04-3

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১১

গ্রন্থনা স্বত্ব
লালমাটি

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

গ্রাফিক্স
সুব্রত মাজী
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শান্তনু ঘোষ

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ৫০০ টাকা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় তারা দেবনাথের স্মৃতির উদ্দেশে

প্রকাশকের নিবেদন

কমিক্‌সের জগতে নারায়ণ দেবনাথ একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তাঁর সৃষ্ট 'হাঁদাভোঁদা' কমিক্‌স পদার্পণ করল ৫০ বছরে!

১৯৬২ সালে এই কমিক্‌সের জনপ্রিয়তার শুরু। সম্পূর্ণ কমিক্‌স বই আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৮০-র দশকে। ইতিমধ্যে 'বাঁটুল দি গ্রেট'-ও পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। এই কর্মকাণ্ডের পেছনের মানুষটির নাম শুনে থাকলেও তাঁকে চেনেন কয়জন? এই প্রজন্মের খুদে পাঠক (তথা দর্শক)-দের কাছে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় মূলত টেলি-অ্যানিমেশনের দৌলতে। জানার মাঝে অজানা সেই মানুষটিকে নতুন প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত করাবার তাগিদেই লালমাটি প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত হচ্ছে 'নারায়ণ দেবনাথ কমিক্‌স-সমগ্র'। মূলত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বহু মজার ও অ্যাডভেঞ্চারের আশ্চর্য চিত্রকাহিনি ও দুষ্প্রাপ্য তথ্যের এই সংকলন।

প্রতিভাবান এই মানুষটি বাংলা তথা ভারতের গর্ব। শান্ত ও প্রচারবিমুখ এই শিল্পীর প্রতি আমাদের বিনম্র নিবেদন 'কমিক্‌স-সমগ্র'-র দ্বিতীয় খণ্ড। স্বল্পভাষী এই মানুষটি নীরবে শিল্পকর্ম নিয়ে মগ্ন থাকেন। তাঁর সেই সরলতা ও শিশুমনের পরিচয় এই খণ্ডের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। কৈশোর ও যৌবনে তিনি রোমাঞ্চিত হতেন বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ইংরাজি সিনেমা দেখে। বিশেষ করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সাঁতারু জনি ওয়েসমুলার-অভিনীত 'টারজান'-এর সিনেমাগুলি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, পরবর্তীকালে যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একদা বিখ্যাত টারজান গল্পের অলংকরণে। প্রথমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পরে সুধীন্দ্রনাথ রাহা (সব্যসাচী)-প্রণীত 'টারজান' সিরিজের গল্পের সঙ্গে নারায়ণ দেবনাথের আঁকা ছবিগুলি বাংলা সাহিত্যের অলংকরণের এক দুর্লভ সম্পদ। সেই মহামূল্যবান অলংকরণের একটি অ্যালবাম তুলে ধরা হয়েছে এই খণ্ডে। এ ছাড়াও রয়েছে দুষ্প্রাপ্য অগ্রন্থিত বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদাভোঁদা, সম্পূর্ণ রঙিন কৌশিকের তিনটি অ্যাডভেঞ্চার, ছবির ধাঁধাসহ আরও অনেক চিত্রকাহিনি। রয়েছে, সময়ের অন্ধকারে ভুলে যাওয়া ঐতিহাসিক কমিক্‌স— চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী, বিদেশি অনুবাদ গল্পের রঙিন প্রচ্ছদ ও খসড়া আঁকা। ছেলেমানুষি মন নিয়ে আপন খেয়ালে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন নিজের সৃষ্টির জগতে গত ষাট বছর ধরে।

নারায়ণ দেবনাথের তুলিতে বার বার ধরা দিয়েছে গ্রামবাংলার দৃশ্য— নদীনালা, গাছপালা, যার উৎস ছেলেবেলায় দেখা বাংলাদেশের স্মৃতি। সেই স্মৃতিকথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতির সোপান বেয়ে' লেখাটিতে, যা সমৃদ্ধ করেছে এই 'সমগ্র'কে। নারায়ণ দেবনাথের বহু মূল্যবান অগ্রন্থিত চিত্রকাহিনি যা ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি আজকাল আর প্রায় অপ্রাপ্য। ফলে সেসব সৃষ্টির কথা আজ বহু পাঠকেরই অজানা। সেই সমস্ত অলংকরণ ও কমিক্‌স দেখে বর্তমান প্রজন্ম যদি উপকৃত হয় এবং আনন্দ পায় তবেই এই সংকলন প্রকাশ সার্থক হবে।

কলকাতা
অক্টোবর ২০১১

বিনীত
নিমাই গরাই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতী নমিতা মজুমদার (দেবনাথ)
শ্রীতাপস দেবনাথ শ্রীঅজয় দত্ত শ্রীশুভময় দাস শ্রীইন্দ্রনীল দাস কুমারী অভ্রনীলা দাস
শ্রীঅর্ক পৈতন্দী শ্রীপিণ্টু কর্মকার শ্রীসুমিত গাঙ্গুলী শ্রীশুভজিৎ বিশ্বাস শ্রীসুকল্যাণ রায়
শ্রীপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় শ্রীরাতুল ভট্টাচার্য
এবং
দেবসাহিত্য কুটির, পত্রভারতী
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি ও দমদম লাইব্রেরি (গোরাবাজার)

ভূমিকা

কমিক্‌স. বাংলায় চিত্র কাহিনী। আমি কোনদিন ভাবিনি যে আমাকে ছোটদের জন্যে ছবি দিয়ে গল্প বলতে হবে। আসলে আমি শুধু ছবি আঁকতাম নানা ধরনের গল্পের নানা ধরনের ছবি গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী। সেই সময় বাংলায় চিত্র কাহিনী ছিলো কিনা আমার মনে নেই. তবে ইংরেজি কমিক্‌স ছিলো। কিন্তু আমি তখনো চিত্র কাহিনী শুরুই করিনি তখন এখানে বাংলা যুগান্তর আর ইংরেজি পত্রিকা অমৃতবাজারে প্রফুল্ল লাহিড়ী কাফি খাঁ ছদ্মনামে করতো শেয়াল পণ্ডিত আর খুড়োর নামে তিন চারটে খোপের মধ্যে আঁকতেন আর যতদূর মনে হয় রবিবার ছাপা বেরোতো আর ঐ তিন চার খোপের মধ্যেই শেষ হতো। ছবি কিন্তু কার্টুনের মতোই ছিলো দেখতে পড়তে বেশ মজা লাগতো। তবে তখন ওগুলোকে কি বলা হতো তা জানা ছিলো না।

বিদেশে কমিক্‌সের লম্বা ইতিহাস আছে যেমন কিং ফিচার সিন্ডিকেট, মার্ভেল কমিক্‌স আরো হয়তো আছে ওখানে নানা বিভাগ আছে গল্প লেখা, ছবি আঁকার সব আলাদা বিভাগ। ছোটবেলায় আমরা কিন্তু ব্যাটম্যান, সুপারম্যান টিনটিন এসব কমিক্‌স দেখিনি। এখন দেখছি আর ভাবছি কি দারুণ সব কমিক্‌স যেমন গল্প আর তেমনি ছবি। আর আরো জনপ্রিয় হয়েছে মুভি আর অ্যানিমেশনের জোয়ারে। আমাদের এখানে এখন মনে হয় কমিক্‌স সম্বন্ধে আগ্রহ খুবই কম। মানুষ খুব একটা গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। বিদেশে কিন্তু কমিক্‌সের খুবই রমরমা। অবশ্য এখন লেখকদের গল্প নিয়ে অনেক শিল্পীই কমিক্‌স আঁকছেন এবং ভালোই আঁকছেন। আগামী দিনে যাতে এখানেও সেই রমরমা হয় সেই আশা করবো। নিশ্চয় সেই দিন খুব আসবে।

প্রায় সে সময় সব বিদেশী কমিক্‌স নানা পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে
যেমন ডিস্‌নি কমিক, ফ্যান্টম বাংলা অনুবাদ অরণ্যদেব ম্যানড্রেক ইত্যাদি।
ছবিও দারুণ সুন্দর এগুলো আমরা দেখেছি. কিন্তু বাংলায় এই রকম চিত্রকাহিনী
সহজলভ্য ছিলো না। আমি সেই সময় বাংলার ছোটদের সেরা পত্রিকা
শুকতারায় মাঝে মাঝে ছবি আঁকি। তখন একদিন পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা
ক্ষীরোদ মজুমদার মহাশয় আমাকে বললেন যে আমি চিত্রকাহিনী করতে পারব
কিনা। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন ক্ষীরোদবাবু
কিছু কাল। আমাদের সময়ের ছেলেদের ছিল বড় মজার ভাবেই সেই সময় আমারই
বয়সী কিছু ছেলে নিয়ে বাদ এ ওর পেছনে লাগা এসব, নানা কাণ্ডকারখানা হয়তো আমি লোকজনের
রকে বসে দেখতাম আর বেশ মজা পেতাম। পরবর্তীকালে দেখা সেই
কাণ্ডকারখানাই যে হাঁদা-ভোঁদার কাণ্ডকারখানা নামে আমার হাত দিয়ে
কমিক্‌সে রূপান্তরিত হয়ে বেরোবে তখন স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমার কর্মকাণ্ড নিয়ে এত বই মেলায় লালমাটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে
স্নেহের শ্রীমান নিমাই গরাই আর শান্তনু ঘোষের প্রচেষ্টায় নারায়ণ দেবনাথ কমিক্‌স-সমগ্র
নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এবার আবার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মুখে।
আমার করা কমিক্‌স আর নানা চরিত্রের গল্পের আঁকা ছবি আবারও বই আকারে
বেরোলে আমার ভালো লাগারই কথা। কিন্তু আমার ভালো লাগার যে দাম সেই
দাম হচ্ছে পাঠকেরা যদি পড়ে, দেখে আনন্দ আর তৃপ্তি পায় তাহলে সেটাই হবে
ভালো লাগা আর আনন্দের। পরিশেষে বই প্রকাশের জন্য স্নেহের নিমাই আর
শান্তনুকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নারায়ণ দেবনাথ
২০.৬.২০১১

মুখবন্ধ

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ো। এখনও এই পরিণত বার্ধক্যে ছোটো ছেলে-মেয়েদের জন্য ছবি আঁকার যে নিষ্ঠা নিত্যনূতনভাবে দেখিয়ে চলেছেন, সেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় গোটা বিশ্বে এক বিস্ময়! গোটা বিশ্বে অবশ্য তাঁর নাম ছড়ায়নি। সেটা বাইরের দুনিয়ার লজ্জা, নারায়ণবাবুর নয়। স্রষ্টার বয়সের জন্য টিনটিন বন্ধ হয়ে গেছে। নারায়ণবাবু বয়সের কাছে হার মানেননি। বড়ো দৈনিকটি টিনটিন নিয়ে হইচই করছে। নারায়ণকে তাঁদের মনে পড়েনি। আমাদের এই কলকাতা শহরে কার্টুন স্ট্রিপের ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। আমার চোখের সামনেই সব কিছু ঘটেছে। কাফি খাঁ অর্থাৎ প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী প্রথম যুগান্তরের জন্য পাতাজোড়া কার্টুন স্ট্রিপ আঁকেন। রিকশাওয়ালা দিয়ে তিনি শুরু করেন। পরে দীর্ঘদিন মহাভারতের কথা নাম দিয়ে অনেক মজার স্ট্রিপ চালু রাখেন। একটি বড়ো সংবাদপত্রের বাঁ-দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত সুদীর্ঘ অঞ্চলকে মাথায় রেখে কার্টুন বানানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

কাফি খাঁ-র মৃত্যুর পর আনন্দবাজারের মাথায় ভূত চাপে, কার্টুন স্ট্রিপ বানাতে হবে। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তকে নিয়ে গৌরাঙ্গ বসু চলে গেলেন বার্তা-সম্পাদক সন্তোষ ঘোষের ঘরে। গৌরাঙ্গ কাহিনির লেখক এবং সুবোধ চিত্রকর। সে-স্ট্রিপ একমাসেই উঠে গেল। আদৌ জমল না। এবার ডাক পড়ল আমার। শোনামাত্রই না করে দিলাম। আমি তখন আনন্দবাজারে তির্যক ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে থার্ড আই ভিউ নিয়ে প্রবল ব্যস্ত। সেইসঙ্গে অ্যানিমেশন নিয়ে মেতে আছি। মাথা জ্যাম। হাতে কোনো সময় নেই।

নারায়ণবাবু বড়ো পত্রিকায় কমিক্স করার জন্য ডাক পেয়েছিলেন ছোটো পত্রিকা তাঁকে বিখ্যাত করার পর। গুণী শিল্পী, দুঃসময়ের বন্ধু ছোটো পত্রিকা কিশোর ভারতী শুকতারা এবং দেবসাহিত্য কুটীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। এই বিশ্বস্ততার জন্যও তিনি আমার শ্রদ্ধেয়।

আমাদের দেশে কার্টুন স্ট্রিপ বাণিজ্যিকভাবে সফল না-হবার কারণ বাংলা বা হিন্দি ভাষায় সফল এবং উদ্যোগী পত্রিকা নেই। কিং ফিচার্স সিন্ডিকেট যখন কোনো শিল্পীর ছবি সিন্ডিকেশনের জন্য নির্বাচন করেন তখন একই ছবি ইংরেজিতে সারাবিশ্বে অন্তত দু-হাজার ইংরেজি পত্রিকায় ছাপা হয়।

টিনটিন এবং অ্যাসটেরিক্স দুটোই শুরুতে ফরাসি জার্মান সুইডিশ এসব ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল অনেক পরে। আজ ইংরেজিতে অনুবাদের ফলে ভারতের বিপুল সংখ্যক পাঠকের প্রিয় পাঠ্য হয়ে ওঠে।

নারায়ণবাবু শুরুতে ইংরেজির আনুকূল্য পাননি। এখন অবশ্য ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে বলে শুনেছি। স্বীকার করতেই হবে— বৃহৎ হাউসের পৃষ্ঠপোষণ না-পেয়েও নারায়ণ দেবনাথ আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত।

আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান নিমাই গরাই সমগ্র নারায়ণ দেবনাথ দু-মলাটের মধ্যে নিয়ে আসার যে-পরিকল্পনা করেছেন, বাংলা চিত্রসাহিত্যে সেটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে চিহ্নিত হবে।

প্রথমত যে সম্মান নারায়ণবাবুর প্রাপ্য কিশোর সাহিত্যে সেবার জন্য, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সেই দুর্লভ সম্মানে (এদেশে কেউ সে-কাজ করেছেন বলে জানা নেই) তিনি ভূষিত হবেন। দ্বিতীয়ত আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের জন্য হাস্যরসের যে বিপুল সম্পদ তিনি রেখে যাচ্ছেন, অল্প পরিশ্রমে তার হদিশ মিলবে। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমারও গর্ব। আমার কালে আমার জানা আমার শ্রদ্ধেয় একজন চিত্রকরের সমগ্র শিল্পকর্ম দু-মলাটে প্রকাশিত হতে দেখে গেলাম।

বাংলা সাহিত্যের গুণগত মান এখন খুব নিম্নগামী। আর্থিক দিকে থেকেও লোকসানের পথে। ছোটোরা ঝুঁকেছে কমিক্সের দিকে। সেটা খুবই সুলক্ষণ। লেখক নয়, চিত্রকররাই এখন সাহিত্যের প্রধান কাণ্ডারী। নারায়ণ দেবনাথ তা প্রমাণ করেছেন। শিশুসাহিত্যকে বাঁচতে হলে তাকে চিত্রনির্ভর হতে হবে। একদা সুকুমার রায় সেই পথ দেখিয়েছিলেন। নারায়ণবাবু আমাদের শেষ ভরসা। বয়সের জন্য যেন তাঁর সৃষ্টিশীলতা কমে না-যায়।

কলকাতা
০৩.০৭.২০১১

চণ্ডী লাহিড়ী

সূচিপত্র

নারায়ণ দেবনাথ ও স্ত্রী তারা দেবনাথ

সপরিবারের নারায়ণ দেবনাথ

শ্রীনারায়ণ দেবনাথ জন্ম-১৯২৫

আলোকচিত্র - অরিজিৎ ঘোষ

জনপ্রিয় মজার কমিক্স

অক্টোবর, ২০১১ সালে এই জনপ্রিয় কমিক্স চরিত্রগুলি একত্রে এঁকে লালমাটিকে উপহার দেন শ্রীনারায়ণ দেবনাথ। দীর্ঘ চার প্রজন্ম ধরে চলা কমিক্স চরিত্রগুলির বর্তমান রূপ ধরা পড়েছে এই দুর্লভ ছবিটিতে। গত পঞ্চাশ বছরে এই প্রথমবার শিল্পী তাঁর সবকটি জনপ্রিয় চরিত্র একত্রে হাজির করলেন।

বাহাদুর বেড়াল

প্রায় মানুষের মতোই চরিত্র 'বাহাদুর বেড়ালের'। তাকে অন্য সকলে ডাকে 'বাহাদুর' বলে। কেননা, তার বুদ্ধি আর বাহাদুরি বলিহারী। কখনো তার 'জিত' হয় তো কখনো 'হার'। শিশু ও কিশোর মনে দুষ্টু-মিষ্টি বুদ্ধির উপস্থিতি হল বাহাদুরের জমজমাট কাণ্ডকারখানা। আসলে শৈশব জীবনে জুড়ে থাকা দস্যিপনাগুলিই কি বাহাদুরের রূপ!

বাহাদুর বেড়াল

হিঃ হিঃ! বাহাদুর জলের নলটাকে সাপুড়ের বাঁশী বাজিয়ে সাপের মতো নাচাতে চাইছে।

আরিব্বাস!

দুর্দান্ত, বাহাদুর! কি করে করছো আমাদের দেখাও।
অবশ্যই না!
আমি এর চেয়ে একটা ভালো কৌশল জানি- দেখো!

ছপাস!

গরর! আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই যে এ ব্যাপার আর না ঘটে- এটা আমি কর্কের ছিপি এঁটে বন্ধ করে দিচ্ছি!
এই নলটাকে আমি আবার টেনে তুলবো বাহাদুরদা।

তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না বাহাদুর- পর্দার আড়াল থেকে কেউ সুতো দিয়ে ওটা তুলছে!
আচ্ছা, এসব ও এই ভাবে করে!

এটা কি করে হচ্ছে তোমাকে বলবো না-আর এবার আমাকে জলে চোবাতে পারবে না- আমি নলের মুখ এঁটে দিয়েছি।
তাই বুঝি-ঠিক আছে দেখি!
ফ্যাৎ!
ছিপি গিলে বাহাদুরের সব বাহাদুরি একেবারে ঢিলে হয়ে গেলো! হিঃ হিঃ!

বাহাদুর বেড়াল

খাওয়ার মাছ নেই ! কাছাকাছি কোন পুকুরে মাছ ধরতে দেবে না তাহলে এই পুজোর দিনে কি না খেয়ে থাকতে হবে?

না-কি করে খাবার সংগ্রহ করতে হবে আমি জানি !

আমার তৈরি এই রকেট কেমন লাগছে ?

মাছ ধরা নিষেধ
এই আলিশান রকেট শুধু লোকালয়ের বাইরে ব্যবহার করতে হবে !

মাছ ধরার জন্যে আজ আর কাউকে তাড়া করতে হবে না।
মাছ ধরা নিষেধ
সবাই পুজো উৎসবে মেতে আছে। কে আর মাছ চুরি করতে আসবে !

এমন কি বাহাদুরও বিরাট এক রকেট বাজি নিয়ে মেতেছে !

হেঃ হেঃ! এটা সে রকেট নয় রে, বুদ্ধুরা! দ্যাখ্ এর পকেট থেকে কি জিনিস বেরোচ্ছে মাছ ধরার ছিপ আর **মাছ!**

বাহাদুর বেড়াল

গ্র্যাণ্ড সার্কাস এবং পোষ মানা পশুপাখী
টিকিট ঘর
মুখ খোলো!
ঠ্যপ!ঠ্যপ!

আচ্ছা! পয়সা না দিয়ে ভেতরে ঢোকার মতলব, অ্যাঁঃ?

গ্র্যাণ্ড সার্কাস এবং পোষা পশুপাখী
বেরোও!
গেছি রে!

হুম! ক্যাঙ্গারুর থলেটা বেশী ভর্তি বলে আমার মনে হচ্ছে!

আমি ঠিক যা ভেবেছি—
আবার তুই!

ভাগ এখান থেকে!

কি করে ঢুকতে হয় আমার জানা আছে!

হেল্প! বাঘের খাঁচা থেকে আমাকে বাঁচাও!

আশ্বিন ১৩৯৪ ১৯৮৭

বাহাদুর বেড়াল

রংচং করার
জন্যে আমার
বাড়িটা দেখতে
খাসা হচ্ছে।

আর কিছুক্ষণের
মধ্যেই রং শুকিয়ে
যাবে।

ক্যাঁচর-ক্যাঁচ-ক্যাঁচর
ওঃ! বাইরে থেকে
কি বিচ্ছিরি চ্যাঁচামেচির
শব্দ আসছে!

চিকির চিক
চিকির চিক
মরেছে! এবার
ভেতরে ইঁদুর।

এই হতচ্ছাড়া
মতিচ্ছন্ন ক্ষতিকর
জীবগুলোর হাড্ডি
গুঁড়ো করে দেবো!
চিকির চিক
চিকির চিক
চিকির চিক

একটু অপেক্ষা করো!
মনে হয় এই দু'রকমের
চ্যাঁচামেচি বন্ধ করার উপায়
আমার জানা আছে!

বৈশাখ ১৩৯৫ ১৯৮৮

বাহাদুর বেড়াল

নিজের সজীব প্রতিমূর্তি গঠন করুন
ভাস্কর
গদাই পাণ্ডা
এই পোস্টার আমাকে দারুণ একটা আইডিয়া দিয়েছে!

মোমের কাজ
চমৎকার জীবন্ত মূর্তি তাই নয় কি?
একেবারে নিশ্চিত!

আপনি কি মোম দিয়ে আমার একটা মূর্তি তৈরি করে দিতে পারেন?
নিশ্চয় পারি, বাহাদুর!

এটা করতে বেশী সময় লাগবে না।

ঝিলের মালিককে বোকা বানানোর জন্যে আমি এটা ব্যবহার করবো!
মাছধরা নিষেধ

হিঃ হিঃ! ঐ যে তিনি এসে গেছেন!
যতক্ষণে জলার মালিক আমার নকলকে পাকড়াও করবে ততক্ষণে আমি একটা মাছ পাকড়াও করি।

আশ্বিন ১৩৯৯ ১৯৯২

বাহাদুর বেড়াল

আজ গোঁদুবাবুর বাড়ির পার্টির নেমন্তন্নে যাচ্ছি।

আশা করি পার্টিতে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন!
না, পাচ্ছি না! এটা প্রাণবন্ত হওয়া দরকার!

শুনুন, সবাই! আমি এই টেবিলঢাকনাটা থালা বাটি না নড়িয়েই টেনে তুলে নেবো!

ঝনননন

এই কৌশল অসফল! এই ক্ষতির জন্যে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বাজে বকিস না!

পরে, বাড়ির বাইরে
ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো!

হেল্প! আমি সেঁটে গেছি! আমাকে টেনে তুলুন!

আমরা তুলবো— যতো তাড়াতাড়ি আপনি ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবেন!

হোঃ হোঃ! বাহাদুরের কায়দা কেঁদো নেদোবাবুর থেকে অনেক বেশী কার্যকারী।

আশ্বিন ১৪০১ ১৯৯৪

বাহাদুর বেড়াল

বেশ ক্ষিদে ক্ষিদে লাগছে, দেখি কিছু খাবার জোগাড় করা যায় কিনা।
আরে ওখানে কিছু একটা হচ্ছে!

অ্যাকোয়েরিয়াম
বাহবা!
ওস্তাদ পোপোট
তলোয়ার খেকো

অ্যাকোয়েরিয়ামের দরজা থেকে হঠো!

অ্যাকো
অ্যাই! রাস্তায় এই সব খেলা দেখাবার তোমার অনুমতি পত্র আছে?

ও ওর সব সরঞ্জাম ফেলে পালিয়েছে — কিন্তু আমি ওর কাছে এগুলি নিয়ে যাবো।

এই যে আপনার জিনিসপত্র পোপোটলালজী!
ধন্যবাদ, বাহাদুর! এমন কিছু আছে যা আমি তোমার জন্যে করতে পারি?
বেশ, আমাকে একটা তলোয়ারধার দিন!

হিঃ হিঃ! যে লোকটা পোপোটলালকে পদাঘাত করে হাঁকিয়ে দিয়েছে সে ব্যাটা এই ব্যাপারের পর ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে থাকবে!

উলক! আমার মাছ! ওটা উধাও!

হিঃ হিঃ! আমি একজন তলোয়ার গিলিয়ে না হতে পারি কিন্তু আমি একজন বৃহৎ তলোয়ার মাছ গিলিয়ে!

বাহাদুর বেড়াল

এটা শুধু লক্ষ্য করো।

এই শটগুলো কেমন মনে হচ্ছে? প্রতিবারেই একটা করে গোল!

হ্যাঁ, মোহনবেঙ্গল আমাকে ওদের সেন্টার ফরওয়ার্ড করতে চায়!

এই যে, বাহাদুর! এইটা কেমন –

– শট হয়েছে বলোতো?

পায়ের নয় আমার হাতের বরফের বলের শট কেমন ঝট করে তোমার মুখে গিয়ে লাগলো!
ওঃ, তাই বুঝি?

ওয়াঁফস্!

হাঃ হাঃ! আমার হাতের নয়, চামড়ার বলে পায়ের শট কেমন ফট করে তোর মতো দামড়ার মুখে, কেমন লাগছে বলতো ?
গররর!

ভালোই হলো। পাজীটা মোহনবেঙ্গলের ক্যাপটেন জানতে পেরে আমিও ওদিক ছেড়ে সোজা ইস্টবাগানে সই করে এলাম, হেঃ হেঃ!

অগ্রন্থিত

বাঁটুল দি গ্রেট

ক.স.II - ৫

এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র।
এর অদ্ভুত কার্যকলাপের সন্ধান দিতেই
[illegible] সাথে এর আবির্ভাব।

নারায়ণ দেবনাথ

বাংলা ভাষায় কমিক্স যতদিন থাকবে ততদিন বাঁটুলকে হারাবে এ সাধ্য কার! পঞ্চাশ বছর ছুঁই ছুঁই এই কমিক্সের রাজত্ব। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে প্রায় সমস্ত বাঙালির মনে চিরনবীন হিরো 'বাঁটুল দি গ্রেট'।

অসীম সাহসী, অপ্রতিরোধ্য গায়ের জোর বাঁটুলের, তবু তার মন শিশিরের মতো নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ। তার কাজ 'দুষ্টের দমন'। দুরন্ত, ডানপিটে, বিচ্ছু দুই ভাগনে ভজা-গজা কতই ফন্দি আঁটে 'বাঁটলোকে' জব্দ করতে। কিন্তু কিছুতেই বাঁটুলকে 'সায়েস্তা' করতে পারে না তারা। প্রতিবারেই শাস্তি হয় তাদেরই।

বাঁটুলের শাগরেদ অতি উচ্চ শ্রবণক্ষমতাসম্পন্ন 'লম্বকর্ণ', পোষা কুকুর 'ভেদো' আর উটপাখি 'উটো' ও অন্যান্য চরিত্ররা সকলেই প্রাণোচ্ছল ও স্বমহিমায় ভাস্বর।

এই কমিক্সের সমস্ত ছবি কেবল দু-রঙে ছাপা, কিন্তু কখনোই মনে হয় না তাতে কিছু সীমাবদ্ধ রয়েছে। আর নারায়ণ দেবনাথের সমস্ত সৃষ্টির মতোই আলাদাভাবে ছবি, perspective, মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরের গড়ন, চিত্রনাট্য, পটভূমি, চরিত্র, সংলাপ ও সর্বোপরি নীতি বোধ এদেশের 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ' হিসাবেই আদৃত হবে।

বাঁটুল দি গ্রেট

✷ নারায়ণ দেবনাথের অগ্রন্থিত প্রথম বাঁটুল। শুকতারা — জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ ১৯৬৫ প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা।

✷ নারায়ণ দেবনাথের অগ্রন্থিত প্রথম বাঁটুল। শুকতারা— জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ ১৯৬৫ প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা।

এবারে পোল জাম্প!

লাফটা বড্ড জোর দেওয়া হয়ে গেছে!

ওঃ! একখানা লাফের মত লাফ!

এবারে কাঠের দণ্ড ছোড়া!

এর বেশী কেউ পারবে না।

সব্বনেশে ব্যাপার!

থ্রি চিয়ার্স ফর বাঁটুলদা
হিপ্ হিপ্ হুররে

বাঁটুল দি গ্রেট

১২ ১৩৭২ ১৯৬৫ প্রথম বছরের তৃতীয় সংখ্যা।

ভাদ্র ১৩৭২ ১৯৬৫

বাঁটুল দি গ্রেট

চৈত্র ১৩৭৩ ১৯৬৭

চৈত্র ১৩৭৩ ১৯৬৭

বাঁটুল দি গ্রেট

তোর মত এরকম একটা যোয়ান মদ্দ থাকতে বাগানটা আগাছায় ভরে আছে, এটা লজ্জার কথা! স্রেফ তোর কুঁড়েমি!

আগাছা মারবার জন্যে আগে সব জিনিস মিশিয়ে একটা কড়া ওষুধ তৈরি করি!
পেট্রোল
বারুদ
ডি.ডি.টি
লবণ

যতক্ষণ না মেশে— ভালভাবে নাড়ি!

তারপর এইভাবে!

মাইলখানেক দূরে
আরে! বৃষ্টি পড়ছে যে! শিগগির ভিতরে চলো! কি বিদঘুটে গন্ধ এই বৃষ্টির!
আর রংটাও অদ্ভুত!

ছোট পেরিস্কোপটা দিয়ে ওধারটা এখন দেখতে পাচ্ছি। ওরে ব্বাস্! পেল্লায় একটা ব্যাঙের ছাতা!

সব আগাছা খতম! আমার কাজ শেষ।
বাঁটলো! সেমাইয়ের পায়েস খেয়ে যা।

বৈশাখ ১৩৭৪ ১৯৬৭ এই গল্পে 'ভজা'-কে বাঁটুল ভাগ্নে বলে সম্বোধন করেছে।

বাঁটুল দি গ্রেট

কার্তিক ১৩৭৪ ১৯৬৭

কার্তিক ১৩৭৪ ১৯৬৭

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটুলদা ! সেই ছোঁড়া দুটো আজ ইস্কুল পালিয়ে রাস্তায় মস্তানি করে বেড়াবার জন্যে জানলা গলে পালাবার মতলব করেছে !

আমাদের প্ল্যান বাঁটলোটা জানলো কি করে বলতো ?
ভেবেছিস আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবি ?

টানের চোটে জানলা ভেঙে খাট শুদ্ধু উপড়ে এসে দুটোকে পিপের মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছে! হাঃ-হাঃ !

ইস্কুল পালাবার মতলব, কেমন ?

তোদের কষ্ট করে হেঁটে যেতে হবেনা, পিপে গাড়িতে বসে গড়াতে গড়াতে চলে যা !

এইসান পিপা চালাচ্ছে কৌন বেতমিজ !

বিনা হরেন্ সে পিপা গাড়ি ছুটাতা ! হাম কেস কর দেগা !

আরে আরে — এসব কি ব্যাপার হচ্ছে !

সার মাইরি মিছিমিছি আমাদের ধরে রামধোলাই লাগালে ? আচ্ছা আমরাও এর রিভেন্জ্ নেবো !

আষাঢ় ১৩৭৭ ১৯৭০

বাঁটুল দি গ্রেট

গুপ্তধনের সব সোনা মাটি খুঁড়ে তুলে এনেছি! এখন এটা ব্যাঙ্কে রেখে পরে এদিয়ে হাসপাতাল তৈরি হবে!

মরেচে! আচমকা কে আমাকে গোঁত্তা মারলো?

গোঁত্তাটা দেখছি একপক্ষে ভালোই হয়েছে! এবার আমার সোনার থলেটা ফিরে পাবো!

তোমার ঐ সোনা দিয়ে দাদামশায়ের আমলের এই ঘড়িটা কিনে ফেলো দিকি ঝট্ করে!

হঠাৎ

সেরেছে! বুনোরা ক্ষেপেছে! ভালোই হয়েছে, ওদের ভড়কি দিয়ে ওদের দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিক্‌টক শব্দ করছেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা!

ইনি বোধহয় টিক্‌টক দেবতা!

শ্রাবণ ১৩৭৭ ১৯৭০

বাঁটুল দি গ্রেট

শহরের ফান্ ফেয়ার নাকি দারুণ হয়েছে — এই তালে একবার ঘুরে দেখে আসি।

সত্যি, চমৎকার! বেশ মজার মজার জিনিস রয়েছে। সবগুলিই চড়ে দেখতে হবে। প্রথমে চেয়ারোপ্লেনে চড়ি।

ভারী মজা লাগছে আস্তে আস্তে ঘুরতে।
ওরে বাঁটুলোটাকে এইবার মওকায় পেয়েছি! এটার স্পীড় বাড়িয়ে ওকে ছিটকে ফেলে দেবো।

আরে আরে একি?

মরেছে! কত আলতোভাবে বসেছি তাতেও ছিঁড়ল কেন কে জানে!

প্লাস্টিক মানুষ দেখুন
প্রবেশ মূল্য ১·২৫
দেখুন! আমি এই প্লাস্টিক মানুষকে কেমন গিঁট দিয়েছি। ভিতরে এসে দেখুন একে দিয়ে কি না করতে পারি।

আহারে, কোন হতভাগ্যের ওপরে পতিত হলুম কে জানে!
যাঃ!

তুমি আমার প্লাস্টিক মানুষের বারোটা বাজিয়েছ। এখন আমি খেলা দেখাই কি করে?

আমি এর জন্যে দায়ী নই। নিশ্চয়ই পাড়ার ঐ দুই মস্তান এখানে এসেছে, ওরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।
সেই দুটোকে একবার আমার হাতে পেলে হয়।

ঐ, এতো দুই মূর্তিমান গম্বুজের ভেতরে ঢুকছে
এ্যাই! দাঁড়া বলছি!
এই যে ওস্তাদ! মালকড়ি কি আছে চটপট ছাড়ো দেখি!
বটে!
তার চেয়ে চটপট তোকেই সোজা পথে ছেড়ে দিলুম হতচ্ছাড়া!
গেছিরে!
বাঁটলো এই পথে হড়কে নামলে এখানে এসে বিরাট চমক খাবে!
হিঃ হিঃ!
ধোয়াৎ!
এই দুটোই কি আমার খেলা দেখানো পণ্ড করেছে?
হ্যাঁ! ওদের কিছু উত্তম মধ্যম দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি!
এখন ভিজে বেড়ালটি হয়ে আছে। একটু চাঙ্গা হলেই আবার পালাবে!
ঠিক আছে, তুমি ওদের আমার হাতে ছেড়ে দাও!
কেমন হয়েছে বাঁটুল? এবার নিশ্চয়ই আর পালাতে পারবে না!
হাঃ হাঃ — চমৎকার!
একিরে! এযে বেঞ্চির পায়ার সঙ্গে আমাদের পায়া গিঁট দিয়ে দিলে মাইরি।

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটুল, তুমিও এই মজার রেসে যোগ দাও। জিতলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে!
প্রীতি ঘোড়দৌড়
ঠিক আছে! তবে আমি ঘোড়ায় ভালো চড়তে জানিনা!

দাঁড়া, বাঁটলোকে উড়নস্টার্ট দিয়ে দি!

মরেছে! হোয়া!
চটাস!

ধুর! হতচ্ছাড়া ঘোড়া বাঁটলোটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেনা!
কুছ্ পরোয়া নেই! চ আমরা সর্টকাটে ওদের এগিয়ে যাই, তারপর আমার নতুন কায়দা জানা আছে!

ঐ ওরা আসছে। ক্যাপগুলো আমার হাতে দে!

ফট! ফটাস! ফট!

এ্যাই! তুমি তোমার ঘোড়া থেকে উড়ে এসে আমার ঘোড়ায় জুড়ে বসলে — শিগগির নামো জিমে খুলে যাচ্ছে।

বাঃ! বাঁটলোটার বরাত দ্যাখ মাইরি! ঠিক মোক্ষম সময়ে ডালটা ধরে ফেললো।
ধপাস!

ভেবোনা বাঁটুলদা। তুমি এই ঘোড়াটার ওপর নেমে পড়ো!
হিঃ হিঃ! এটা বুনো ঘোড়া!

গেছিগো!
হেই!
এই মরেচে! ওরা আমাকে বুনো ঘোড়া দিয়েছে! এটা অন্য সব সওয়াদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে!

হুইই!!

আলতোভাবে পড়েছি, তাই বেচারা গাড়োয়ানের গাড়িটা বেঁচে গেল!

তোমার খড়ের গাড়িতে এসে পড়ার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এর জন্যে দায়ী ঐ দুটো উঠতি মস্তান!
ঠিক আছে বাঁটুলবাবু! কিন্তু আপনার ঘোড়াটা যে পালালো।

ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই! একটা মতলব এসেছে! তোমাকে চুপি চুপি বলি!

ওদের ধরেছি! এবার ওদের গ্রামের থিয়েটারের সাজঘরে নিয়ে যাবো, তারপর.....
আরে, আরে, একি? বাঁটলোটা ঐ খড়ের ভেতরে লুকিয়ে ছিল!

তারপর
তাড়াতাড়ি! আরো তাড়াতাড়ি!
জয় সীমানা
সপাং!
হাঁস! ফাঁস!
নকল ঘোড়ায় চড়ে বাঁটুলই ঘোড়দৌড়ে জিতেছে!
আউফ্!

এই নাও টাকা! আমার ঘোড়াটাকে বেশ ভালো করে ঘাস, খড়, দানাপানি খাওয়াও!
আরে বাঃ! বাটলো উলটে আমাদেরই প্যাঁচে ফেলে দিলে!

বাঁটুল দি গ্রেট

পিপেগুলোকে ঠিক করে রাখতে গিয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো লেগে গেল। এগুলি ছেড়ে লন্ড্রিতে দিতে হবে।

যা ভুঁদো! বাঁটলোটাকে পাকড়া!
গর্‌র্‌র্‌! গর্‌র্‌র্‌!

কুকুরটা পাগলা মনে হচ্ছে। এই যাঃ, পুটলিটা হাত ফস্কে পড়ে গেল।

আরে আরে একি! লন্ড্রিতে দেবার ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিল যে হাত থেকে চলে গেল।

গেল, গেল! আমার পোষাকের বাণ্ডিল ঘাস ছাটা মেসিনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

যদি একবার জানতে পারি যে এই পুটলি কার, তাহলে —
মরেচে! মহা ঝামেলায় পড়া গেল। এখন ঐ পুটলি ফেরত পাই কি করে।

আমরা তোমার পুটলি আনার ব্যবস্থা করছি বাঁটুলদা!
যা ভুঁদো! এবারে ঐ পুলিসটাকে পাকড়া।

বাপ্‌রে!

হেল্‌প! কার খুঁচকি আমাকে গোঁত্তা মেরে ফেলে দিল, আর আমার ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিলটা হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে গেল।

শ্রাবণ ১৩৭৮ ১৯৭১

উদ্বোধন আশ্বিন ১৩৭৮ ১৯৭১, রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী ১৩৮০

বাইরে আসার আগেই
চালাও গোলি—আরে আরে—অ্যাঁক্ !
অ্যাঁক্ নয় রে খ্যাঁক! ব্যাটা খ্যাঁক্‌শেয়াল কোথাকার !
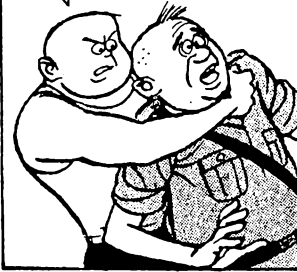
এই নে তোদের কর্তাকে আবার তোদের ঘাড়েই দিলুম।

আলো নিভিয়ে দুষমণটাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দল বল ডেকে এনে মজা দেখাচ্ছি !
ব্যাটার কোন মতলব আছে।

যা ভেবেছি! ঘর অন্ধকার করে হতচ্ছাড়ারা আরো সঙ্গী ডাকতে যাবে! কিন্তু দরজা কোন দিকে বুঝতে পারছি না আলোটা জ্বালি !

এই তো সুইচ্ আলোটা আগে জ্বালি — এই যে দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে দেখছি!

টানটা একটু কড়া হয়ে গেল। কিন্তু শয়তানগুলো গেল কোথায়? দেখি ভেতরে।

এ যে দেখছি বেতার ঘর! এখান থেকেই সব খবর পাচার হয় তাহলে। এবার পাচার করাচ্ছি!

কিছু পরে
এবার দেখি বাইরে কি আছে!
পায়ের শব্দ হচ্ছে! যে দুষমণকে পাহারা দিতে বলে দোস্তরা সঙ্গীদের ডাকতে গেল সে নয় তো!

আশ্বিন ১৩৭৮ ১৯৭১

আরো এগিয়ে
আচ্ছা—এখানে রসদ জমা করা হয়েছে। ঠিক হ্যায়, খরচের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

ঘাঁটি থেকে খবর দেওয়া সেই ব্যাটা দুষমণ! বেত্তমিজটা খড়ে আগ লাগাচ্ছে ব্যাটাকে বেয়নেট দিয়ে একেবারে ফুঁড়ে ফেলবো!

পেছন থেকে খচাং করে লাগিয়ে দেবো। কিছু বোঝার আগেই খতম!

সবকটাই বোধ হয় খড়ের তলায়! কিন্তু এতো ধোঁয়াতেও পিঠেতে মশা হুল ফোটাচ্ছে!
চটাং!

আশ্বিন ১৩৭৮ ১৯৭১

আইরে চাচা, এবার আপনা জান বাঁচা !

আরো একটু এগিয়ে
ঐ যে ব্যাটাদের আর একটা ঘাঁটি। ওটাকেও মাটিতে মেশাতে হবে।

এই পিলারটা দিয়েই কাজ হাঁসিল !

আশ্বিন ১৩৭৮ ১৯৭১

বাঁটুল দি গ্রেট

খবর পেয়েছি, বাঁটলো আমাদের পেটাবার জন্যে ঘোড়ার গাড়িতে করে লাঠি, বেত সব নিয়ে একটু পরেই এখান দিয়ে যাবে।

ঐ যে আসছে বাঁটলোকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি!

মড়াৎ!

সব্বনাশ! ভাগ্যিস গাড়িতে লোক ছিলো না!
বাহ্! বাঁটলো নিশ্চয়ই অন্য রাস্তায় গ্যাছে!

হিঃ হিঃ! নৌকোয় গিয়ে বিচ্ছু দুটোকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে!
বেত

না, ফাঁকি দেওয়া যায় নি!
বেত

মরেছে!
হুস্ সস্!
মড়াৎ!

শীগগীর নামো! নাহলে আমার প্লেন তুমি ভেঙ্গে ফেলবে!

অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ ১৯৭১

বাঁটুল দি গ্রেট

আপনাদের পাড়ায় কোন অশান্তি নেই তো
না ইনস্পেক্টর সাহেব! এখন এখানে সব সময় শান্তি, কোন ঝামেলা নেই!

খ্যাঁচ!
পিং

প্রাণে বাঁচতে হলে শুয়ে পড়ুন! এ যে গোলা গুলি চলছে! আর আসছে বাঁটুলের ঘর থেকে! কিন্তু ও তো কখনো গুলি ছোঁড়ে না!

টুপিটা ধরে দেখি ও আমাকেই তাক করছে কি না!

টুপি দিয়ে ওকে বোকা বানিয়েছি, কিন্তু এটা নিশ্চিত—আমিই ওর লক্ষ্যবস্তু!
হুউউইই!
একটা পড়েছে!

তুমি পেছন থেকে নজর রাখো, আমি গুঁড়ি মেরে গিয়ে চট করে জানলা দিয়ে ব্যাপারটা দেখি!

কেউ নির্ঘাত আমার গুলি গোলা কুড়িয়ে নিচ্ছে!

এইযে, এইই নিচ্ছে! দ্বিপদসঞ্চালন করে!
মরেছে! স্যার যে শূণ্যমার্গে চললো!

এই তো এখানে আমার কিছু গুলি গোলা পড়ে আছে! আহা, বেচারার উপর পদসঞ্চালনটা কিঞ্চিৎ তেজী হয়ে যাওয়ায় দুশো গজ দূরে গিয়ে পড়েছে!
গুলি করে ওর খুলি উড়িয়ে দাওনা বোকারাম!
গুলিতে ওর কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে খোঁচা খেয়ে আরো খেপে গিয়ে আমাদের বুলি বন্ধ করে দেবে!
ঠিক আছে, আমিই ওর জানলা দিয়ে পিস্তল খালি করে ফেলছি!
দেখেছিস, পুঁচকেগুলি আবার পাল্টা আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছে. কিন্তু কেমন করে রে?
আমিও মুখের মতো পাল্টা জবাব দিচ্ছি!
হুউউইইই!
হুউউইইই!
প্রাণ বাঁচাতে হলে শুয়ে পড়ুন!
তুমি মাত্র তিনটেকে ফেলেছো বাঁটুলদা!
তিনটে! কই আমাদের তো লাগাতে পারেনি! ব্যাপারটা কি!
খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে দেখা যাক কি হচ্ছে এখানে!
দেখো! বাঁটুল পুতুল সৈন্যদের গুলি করে ফেলছে!
খেজুর বিচিকে গুলি বানিয়ে রুটিকাটা ছুরি দিয়ে সেগুলিকে ছুড়ছে!
তুমি আরো একটাকে ফেলেছো বাঁটুলদা!

বাঁটুল দি গ্রেট

মেইল বিভাগের কর্মীরা আজ কর্ম-বিরতি পালন করছে। তুমি যদি এ কাজটা করে দাও তো খুব ভালো হয় বাঁটুল!
কোন ভাবনা নেই। আমি নিশ্চয়ই এ কাজ করে দেবো।

যে দায়িত্ব নিয়েছি তা ঠিক মতো পালন করতে হবে। এসব অবশ্য আমার কাছে নতুন কিছু নয়! আর আমার ভ্যান গাড়িও লাগে না।

এই মরেছে! ডাক বাক্স খোলবার চাবি আনতে ভুলে গেছি!

যাকগে, এমনিই খুলে নি!
ঠকাং!

পুলিশের ডিউটিতে এসে ঘুম! এ তো ঘোরতর অন্যায়! রিপোর্ট করে দিতে হবে!
পিপ! পিপ!

সব মেইল সংগ্রহ হয়ে গেছে, এবার এগুলো পৌঁছে দেওয়া যাক!
বাঁটলো মেলব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে রে! বস্তাটা হাতাতে হবে! চ' সর্টকাটে গিয়ে ওর রাস্তা আটকাই

গ্যারেজ
কোন বে আক্কেলে এখানে এই ভাঙা ভ্যানটাকে রেখেছে! মেইলব্যাগ রেখে এটাকে এখন সরাতে হবে।
বাঁটলো যখন গাড়ি সরাবে, আমরা তখন ওর মেলব্যাগ সরাবো।

যাক্, রাস্তা সাফ, এবারে চটপট পৌঁছে যাবো।
মোড়ে রাখা ভ্যানগাড়িটাতে— কুইক!
গ্যারেজ
বাঁটলো টা-টা!
কী! মেলব্যাগ নিয়ে হাওয়া দেওয়ার মতলব! দেখাচ্ছি মজা!
এই ক্রেনটাকেই কাজে লাগাই!
ক্রেন ছিপে ভালোই মাছ ধরা যাবে!
যাবে কোথায় চাঁদেরা!
ক্রেন ছিপে বেশ ভালো মাছ উঠেছে দেখছি!
ভালোই হয়েছে, একটা ব্যাগ যাবে পোস্ট অফিসে, আর একটা বাণ্ডিল যাবে থানায়!
বাঃ!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার উটপাখী খবরের কাগজ আনতে যাচ্ছে। কিরকম ট্রেনিং দিয়েছি দ্যাখ্!

তিন মিনিট পরে
কি হলো! কাগজ না নিয়েই ওটা ফিরে এলো!

এই ব্যাটা গিদ্ধর, কাগজ কই?
কাগজ নিশ্চয় ও গিলে ফেলেছে ওর পাকস্থলী তোমার চেয়ে বড়ো। খাওয়ার ব্যাপারে ও তোমাকে হারিয়ে দিতে পারে বাঁটুলদা!

ঠিক আছে। আজ রাতে আমাদের খাওয়ার প্রতিযোগীতা হবে। এখন সারাদিন আমরা উপোস থাকবো। আর আমি ওর ঠোঁটে তালা এঁটে দিচ্ছি যাতে ও প্রতিযোগীতার আগে কিছু খেতে না পারে।

একঘন্টা পরে
মরেছে! হতভাগা কখন চেন আর তালা খুলে গিলে ফেলেছে!

এবারে একটা বাক্স দিয়ে দেখি। হতভাগা মেরে আগে একটা গর্ত করে নি!

এইবার হতভাগা ঠিক জব্দ হবে!

প্রতিযোগীতা
এক-দুই-তিন-স্টার্ট! ওরা ভাজা মাছ দিয়ে শুরু করেছে। ওটা বাক্স শুদ্ধু খাচ্ছে!

হঃ হাঃ! বাঁটুলদাও হঠবার পাত্র নয়। বাঁটুল একেবারে বাক্সের মধ্যে মাছ দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে নিয়েছে!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

বেচারা হুলো বোধহয় ভেতরে ঢুকতে চাইছে!
মিয়াঁও!
ভেতরে যা হুলো, তোর জন্যেই দরজা খুলে দিলুম।
আরে আরে, সর্বনাশ করলে বাঁটুলদা!
বেড়ালটাকে কে ভেতরে ঢুকতে দিলো?
শোনো!

দ্যাখো কি করেছো! বেড়ালটা খেলা দেখাবার সব ইঁদুর গুলোকে তাড়া করেছে!
প্রোঃ উদ্ভটেশ্বরের ইঁদুর সার্কাস
আসুন, এই অভাবনীয় প্রদর্শণী দেখুন

এর জন্যে তুমি দায়ী। আমি এখন এই কেকের টুকরো দিয়ে আমার ইঁদুরগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।
আমি ভালো উপায় জানি!

তোরা ইঁদুর ধরার জন্যে ওদের গর্তের কাছে ঘাপটি মেরে থাক। আমি ভেতরে গিয়ে ওদের তাড়া দিয়ে বের করি।
ঠিক আছে বাঁটুলদা!

এ ঘরে দেখছি একটাও গর্ত নেই। আমি বরঞ্চ দেয়ালে একটা গর্ত তৈরী করে নি।

শ্রাবণ ১৩৮২ ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

আজ আমার জন্মদিন। সে উপলক্ষে একটা উৎসবের আয়োজন করেছি।
এই আমার পয়লা অতিথি আসছেন।

বাঁটুল, তোমার জন্মদিনে আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার
ধন্যবাদ!

বাঁটলো জন্মদিনের পার্টি নিয়ে ব্যস্ত। চ', এই তালে ওর ঘোড়াটাকে ঝেড়ে দি!
খাসা আইডিয়া মাইরি!

হিঃ হিঃ! বাঁটলো হদিশই পাবেনা যে, ঘোড়া কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো!

লাগাম খোলা হলো এইবার— ওঁক!
কোঁক!
দমাক!

এইযে, আপনারা সবাই এসে গেছেন! আসুন আসুন।

হতচ্ছাড়া ঘোড়া চাঁট মেরে খোঁড়া করার তালে ছিলোরে! কিন্তু এবার যা একখানা আইডিয়া মগজে নাড়া দিয়েছে, দুর্দান্ত!
কি আইডিয়া স্যাঙ্গাৎ?

বাটলোর জন্মদিনের কেকে এই বিশেষ ডিনামাইট মোমবাতিটা পুঁতে দিয়ে আমরা সামনের ব্যাঙ্কটা লুটতে যাচ্ছি। এটা ফেটে সবশুদ্ধ বাঁটলোকে উড়িয়ে দেবে। আমাদের তখন আর কেউ বাধা দিতে পারবে না।

আশ্বিন ১৩৮২ ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

চল লম্বকর্ণ, আমরা কার্ণিভাল দেখে আসি।
চলো বাঁটুলদা!

জল শুদ্ধ মাছ গিলে আবার উগড়ে দিলো! দারুণ, না রে লম্বু?
সত্যি বাঁটুলদা!

ঘুরে ঘুরে খুব খিদে পেয়ে গেছে বাঁটুলদা! চলো, কিছু খাওয়া যাক।
ঠিক বলেছিস লম্বু! চল দেখি কি আছে।

ওদিকে
কার্ণিভালে স্ফূর্তি করতে এসে রেস্ত ফাঁক, অথচ মজাই জমলো না।
যা বলেছিস মাইরি! কিন্তু রেস্তর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।

আরে সাবাশ! ব্যাঙ্ক মেরে!
কিন্তু বন্ধ যে!
ব্যাঙ্ক

আরে বন্ধ ব্যাঙ্ক খুলতে কতক্ষণ। দাঁড়া, দারুণ একটা আইডিয়া মগজে খোঁচা মেরেছে!

কিছুক্ষণ পরে
এইখানে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে জোরে বাজাবে!

ভোঁপ-ভোঁপ!
ঝনাৎ ঝন-ন!
বন্ধ ব্যাঙ্কের সামনে বাজনা বাজিয়ে কি কাজ আমাদের হবে গুরু?
গুম!
গদাম

চৈত্র ১৩৮২ ১৯৭৬

বাঁটুল দি গ্রেট

মে ১৩৮৪ ১৯৭৮

আমরা এই হাতে চালানো ট্রলিটা নেবো! এই রেল লাইন গোল্লাপুরের কাছ দিয়েই গেছে।
আমরা বেশ ভালো স্পীডে চলছি, তাই না ডাক্তারবাবু?
এবার আস্তে! সামনেই বাঁক!
মরেছে! আমরা রেললাইন ছেড়ে এখন সোজা সাঁওতাল বস্তির দিকে চলেছি!
আমি থামাতে পারছি না ডাক্তারবাবু!
এখন থামার নাম করো না! তুমি ওদের বারোটা বাজিয়েছো! এবার আরো জোরে ছোটাও!
ওরে বাবা! ওরা আমাদের দিকে তীর ছুঁড়ছে যে!
তীরে আমার কিছু করতে পারবে না, কিন্তু ডাক্তারকে আড়াল দিতে হবে।
দৌড়োন, ট্রলিকে এখন আমি ঢাল বানিয়েছি!
আমরা পেরে গেছি ডাক্তারবাবু! এই আপনার রুগীর বাড়ি!
থামুন ডাক্তারবাবু! এই নার্ভ টনিক তো আপনার রোগীর জন্যে!
অ্যাই! ওটা আমার ওষুধ!
হোঁক্‌৫! এই দৌড় ঝাঁপের পরে ওর চেয়ে এটা আমার বেশী দরকার!

মাঘ ১৩৮৪ ১৯৭৮

বাঁটুল দি গ্রেট

ওফস! এমন চমৎকার বিরিয়ানী নড়া দাঁতের ব্যথার জন্যে খেতে পারছি না। আমাকে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেখাতে হবে।

নিশ্চয় তোমার দাঁত তুলে দেবো, বাঁটুল। কিন্তু এই আমার দক্ষিণা।
দাঁত তোলা
প্রতি দাঁত ৫০ টাকা
অ্যাঁ? প-ন-চা-শ টাকা!

আমি আমার দাঁত তুলতে এতো টাকা যোগাতে পারবো না। তাই নিজেই একবার চেস্টা করে দেখি!

এতো জোরে ছোঁড়ায় নির্ঘাত কাজ হাসিল হবে!

আহ্!

সাঁওতালদের গ্রামে বেড়াতে এলে সর্দারকে জড়কি দিয়ে বেশ তোয়াজে আছি, কি বলিস?
তা আর বলতে।

ওটা আবার কি আসছে রে মাইরি!
উড়ন্ত চাকি বলে মনে হচ্ছে!

ঘচাৎ!
অ্যাই মরেচে!

সর্দার! বাঁটুল কোত্থেকে উড়ে এসে আমাদের দেবতাকে গুঁড়ো করে দিয়েছে!

ও আমাদের দেবতা ভেঙেছে, ওকেও আমরা ভাঙবো!
নিশ্চয়! এই বিশেষ ধরণের মিক্সচার পাইপে ভরে দিচ্ছি ওকে টানতে দিয়ে এসো সর্দার। দেখো কি হয়।
বারুদ
বাঁটলোকে শায়েস্তা করার কি দারুণ মওকা মিলেছে বল্‌তো দোস্ত? আর একটু পরেই ওর মুণ্ডু উড়ে যাবে! হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
আমরা মোটেই রাগ করিনি বাঁটুল তারই নমুনা স্বরূপ তোমাকে এই পাইপটা দিচ্ছি তুমি আয়েস করে টানো।
এখান থেকে কেটে পড়ো— শিগগির!
দুড়ুম!
বাপরে! এতো শব্দতেও ওর কিচ্ছুটি হয়নি! এবারে উল্টে আমরাই গেছি!
ব্রাদার, এই স্থান আমাদের এখনই পরিত্যাগ করা উচিত!
আরে! আমার নড়া দাঁতটা গেছে! সর্দারের দাওয়াইটা বেশ ভালোই কাজ করেছে দেখছি!
এর জন্যে আমরা দায়ী নই বাঁটুল। পাইপটা ঐ মিচকে শয়তান দুটো তোমাকে দিতে দিয়েছিলো। বলো তো দুটোকে ধরে এনে বাঁশডলা দিয়ে দি।
দরকার নেই। ওরা এবারে আমার উপকারই করেছে। আমি তোমাদের জন্যে নতুন ঠাকুর তৈরি করে নিয়ে আসবো।

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটুল, বলছি কি, তুমি আমার জন্যে কিছু লটারির টিকিট বিক্রি করে দেবে? এসব দুঃস্থ এবং বৃদ্ধ দাঁতের ডাক্তারদের সাহায্যের জন্যে।
নিশ্চয়! জিনিস বিক্রি করতে আমি খুবই ওস্তাদ।
ডেন্টিস্ট

সবাই আসুন! লটারির টিকিট কিনুন এবং গরীব বৃদ্ধ দাঁতের ডাক্তারদের সাহায্য করুন।
না শোনার ভান করে সবাই পালান।

লটারির টিকিট বিক্রি হচ্ছে! সবাই দলে দলে এসে একটা করে কিনুন! সব গেলো কোথায়? দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা জনশূণ্য! এ যেন মৃত সহর!
হুঁঃ! তুমি কিছু বিক্রি করছো এটা ওরা একমাইল দূর থেকে টের পেয়ে সব লুকিয়ে পড়েছে।

আমি এগুলি ফিরিয়ে দেবো। আমার মতো সেরা বিক্রয়কারী যখন পারলো না তখন আর কেউ পারবে না!
ডেন্টিস্ট

ইয়ে, এই যে ডাক্তারবাবু!
হ্যাঁ, বাঁটুল, ঠিক আছে— পরে।

সামনে বিরাট ভিড় নিয়ে আমাদের অনন্তকাল ধরে বসে থাকতে হবে দেখছি।
একটা খুব জলো মতলব মাথায় এসেছে বাঁটুলদা। শোনো...

ও ঠিক বলেছে। আমি ওর মতলবটা কাজে লাগিয়ে দেখবো।
ওহ, ইয়ে আপনার গোলমালটা কিসের?
এই দাঁতটা বড়ো মন্ত্রণা দিচ্ছে!

এক মিনিট পরে
এই যে, ওটা বেরিয়েছে!

বাঁচিয়েছো, বাঁটুল! তোমার ঋণ কি ভাবে শোধ করবো?
কিছু না! শুধু একটা লটারির টিকিট কিনুন।
এই যে, একখানা! দশ টাকা।

অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ ১৯৭৯

বাঁটুল দি গ্রেট

হাঃ হাঃ! তোমার মাছ ধরার ছিপ তুমি আবার ভেঙেছো, বাঁটুল! তুমি ঠিক ওস্তাদ মাছ ধরিয়ে নও!

একটা সত্যিকার শক্তপোক্ত ছিপ তৈরির অনেক জিনিস রেলের এই পুরোনো লোহালক্কড়ের গুদোমে রয়েছে।

যখন আমি মাছ ধরবো এই ছিপ আর ভাঙবে না।
হাঃ হাঃ! ওএটা রেলের লাইন আর স্টিলের তার দিয়ে তৈরি করেছে!

এবার এটা আমি বেশ ভালোভাবে দূর সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারছি।

কড়াক!

হুঃ! এবার বিরাট মাছ ছিপে গেঁথেছি!

মরেচে! এটা যে ডুবোজাহাজ!
টপাস!

বুদ্ধু ভোঁদড়! এবার আমরা সমুদ্রে ফিরে যাবো কি করে?

চৈত্র ১৩৮৮ ১৯৮২

বাঁটুল দি গ্রেট

খেয়াল রেখো এ ম্যাচে মোহনবেঙ্গল ক্লাবকে জিততেই হবে, বাঁটুল! বেশী জোরে লাথি হাঁকড়াবে না! গত খেলায় প্রত্যেকটা বল তুমি ফাটিয়েছো!
এবার ডুবুরির লোহার বুট পরেছো কেন?
এটা আমার পা ভারী রাখবে, সুতরাং বেশী জোরে না মারার কথাটা মনে থাকবে ক্যাপটেন!

বলটা থামাও, বাঁটুল! কিন্তু ওতে লাথি মেরে ফেঁড়ে ফেলো না!
আমি জানি! এখন মাথা দিয়ে ওটাকে থামা দিতে হবে। তাহলে মনে হয় ফাটার ভয় আর থাকবে না!

দুম!
তাজ্জব! এবারও ফেটে গেলো!

তোমার ছোট কাঁটার মতো চুলের খোঁচা লেগে বল ফেটেছে! এরপর কপাল দিয়ে হেড করবে!

এবার আমার কপাল দিয়ে ওটাকে ঢুঁ লাগাবো!

চমৎকার! এবার ফাটেনি!

ধেৎ! আমি এতো জোরে পড়েছি যে, মাঠে গর্ত করে ফেলেছি— আঃ! এইতো বলটা আসছে!

গড়িয়ে গর্তে পড়েছে। আমি এটা তুলি!
পেনালটি! ও বলে হাত লাগিয়েছে!

পেনাল্টি কিক
দেখ, শেষে আমি একটা গোল হতে দিলাম!

এর মধ্যেই এক গোলে পিছিয়ে! আমাকে এবার লাথি হাঁকড়াতেই হবে!

কার্তিক ১৩৯০ ১৯৮৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫০-এর দশকে (শুরু কার্তিক, ১৩৫৮/১৯৫১) হাঁদা ও ভোঁদা নাম দিয়ে অনিয়মিত ভাবে কিছু ছবিতে গল্প প্রকাশিত হয় শুকতারায় যার চরিত্রের চেহারা ছিল সিরিয়াস। চারটি ছবি নিয়ে একপাতার সেই সিরিয়াস হাঁদা ভোঁদার 'ছবি ও কথা'র স্থানে ছিল বোলতার ছবি । নারায়ণ দেবনাথ জানান সেই 'সিরিয়াস' চেহারার হাঁদা ভোঁদার রচয়িতা 'বোলতা' প্রকৃতপক্ষে তখনকার প্রখ্যাত শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৬৭ সালে সেই কমিক্সগুলি গল্পসহ পৃথক বই আকারে 'হাসির এ্যাটম বোম' নামে প্রকাশ করে দেব সাহিত্য কুটীর। বইটির জ্যাকেট প্রচ্ছদটি আঁকেন প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানতে পারলাম যে শুকতারা পত্রিকায় আমার
ছোটদের জন্য করা কমিকস হাঁদা-ভোঁদা পঞ্চাশ
বছরে পা দিয়েছে। বেশ খুব ভালো লাগলো।

এজন্য দেবসাহিত্যকুটিরকে আমার শুভেচ্ছা রইলো
এটা আমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য।

শুভেচ্ছা সহ— নারায়ণ দেবনাথ

৩১ . ৭ . ২০১১

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত 'শুকতারা' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা 'হাঁদা-ভোঁদা' কমিক্স প্রথম প্রকাশ পায়। শুকতারা পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের পরিকল্পনায় চারটি ছবির ফ্রেমে আঁকা 'হাঁদা-ভোঁদা'-র কমিক্সের 'ছবি ও কথা'-র স্থানে শিল্পী শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নাম ব্যবহার না-করে 'বোলতা'-র ছবি আঁকতেন। উক্ত 'বোলতা' ছদ্ম-ছবির আড়ালের প্রকৃত মানুষটি যে শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা তাঁর 'হাঁদা-ভোঁদা' কমিক্সে ব্যবহৃত হাতের লেখা দেখে চিনে নেওয়া যায়।

প্রসঙ্গত প্রতুলবাবুর আঁকা 'হাঁদা-ভোঁদা' কমিক্সগুলি দেব সাহিত্য কুটীর ১৩৬৭ সালে 'হাসির এ্যাটম বোম্' নামে গল্পসহ বই আকারে প্রকাশ করে। যদিও সেই বইটিতে কোনো অজ্ঞাত কারণে 'ছবি ও কথা'— 'বোলতা' মুছে ফেলা হয় এবং এককালে শুকতারায় প্রকাশিত প্রতুলবাবুর আঁকা 'লরেল হার্ডি' গল্প সংযোজিত হয়। তবে এই বইটির জ্যাকেট কভার-এ প্রতুলবাবুর আঁকা চুলোচুলিরত পঞ্চাশের দশকের হাঁদা-ভোঁদার চতুর্দিকে ঘুরতে দেখা যায় সেই 'বোলতা' টিকে!

শিল্পী শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত 'বোলতা' ছদ্ম-ছবির ব্যবহার করে আরও একটি কমিক্স করেন শুকতারা পত্রিকায়। ১৩৬৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সেই কমিক্সের নাম 'বোম্বেটে আর ডানপিটে' যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল হাঁদা-ভোঁদার মতো দেখতে দুই দামাল কিশোর। তবে এই কমিক্সের আঁকার ভঙ্গিটি ছিল সিরিয়াস।

১৯৬৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে শুকতারা পত্রিকায় নারায়ণবাবুর আঁকা 'হাঁদা-ভোঁদা' কমিক্সের পথ চলা শুরু। প্রথম কমিক্সের নাম— 'হাঁদা-ভোঁদার জয়'। যার পুনরায় আবির্ভাব হয় লালমাটি প্রকাশিত 'কমিক্স-সমগ্র'-র প্রথম পর্বে।

আশ্বিন ১৩৬৯ ১৯৬২ প্রথম বছরের দুর্লভ এক পাতার গল্প।

হাঁদা-ভোঁদার
লেঙ্গিমারা
না

হাঁদারে! আমি স্কুল টীমে চান্স পেলুম। তোর নাম রিজার্ভ দলে।

একটা উপায়ে ওর জায়গা নিতে হবে।

ভোঁদা! শিগগির একটা কথা শুনে যা!
আসছি!

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ
ওঃ!

উক! সাবানটা গিলে ফেললুম।

পৌষ ১৩৬৯ ১৯৬৩

উফ্!
এবার তুই রিজার্ভ থাক।—হিক্!

ভোঁদাটাকে খুব জব্দ করা গেছে। বলে কিনা আমি রিজার্ভ দলে—হিক্!
সাবানটা পেটে চলে গিয়ে বড় হেঁচকি উঠছে তো!

জল খা, হেঁচকি কমে যাবে।
হিক্!

সাবানে-বেলুন-করা হাঁদাটাকে নিয়ে যাও। ওর জায়গায় ভোঁদা খেলবে।

পৌষ ১৩৬৯ ১৯৬৩

হাঁদা-ভোঁদার কেরামতি

দরিদ্র ছা
সাহা
না

শিক্ষক
স্কুলের গরীব ছাত্রদের জন্যে টাকা চাই। কে চাঁদা তুলবে?
আমি!
অহং!

হাঁদা, বাবার কাছে
বাবা চাঁদা দাও।
এই নাও আট আনা

ভোঁদাও গেল তার বাবার কাছে।
বাবা চাঁদা।
পড়াশোনার নাম নেই, খালি চাঁদা!

কি হবে বলতো হাঁদা?
দাঁড়া,— ঠিক হয়েছে!

দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!
গরীব ছেলেদের জন্যে দান করে মানুষ হোন।

মাঘ ১৩৬৯ ১৯৬৩

আর বাঙালি ক্যামেস্তারা?
আর বাঙালি ভেঁপু?
না।
কাভি নেহী।

তবে রে! হতভাগারা!
ঢুম
দুম
দাম
গরীব ছেলেদের সাহায্য করে স্বর্গে যান।

উঃ

মানুষ ছাড়া মানুষের গতি কি বল।
আর্ত ছেলেদের সাহায্য করুন

কি আর করবেন! তার চেয়ে বাঁদরদের কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা করুন।

ছেলের সেরা হাঁদা-ভোঁদা!

মাঘ ১৩৬৯ ১৯৬৩

চৈত্র ১৩৭০ ১৯৬৪

আমার তীরটা দাওতো খোকা!
এই যে দিচ্ছি।
তীর ছোঁড়া আবার একটা খেলা নাকি। হুঁ:— আসুক তো আমার সঙ্গে টেনিস—
১
হাঁদা! তুই টেনিসের কথা বলছিলি না?
টেনিস বলটা এনে দাওতো ভাই!
সত্যি হাঁদা তোর কি একখানা বুদ্ধি! বেড়ানোতে কোন ঝামেলা নেই কি বলিস?

আষাঢ় ১৩৭১ ১৯৬৪

হাঁদা-ভোঁদার
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

হ্যাঁ, স্যার! ইস্কুল থেকে বেরোবার পর আমি পুলিশ হবো, বড় বড় অপরাধী পাকড়াবো!
বাঃ, বাঃ! চমৎকার!
যখন স্কুল ছাড়বো

আমার মেসোমশাই পুলিশ। বড় বড় অপরাধী ধরতে আমি তাঁকে প্রায়ই সাহায্য করি।
তার মানে ব্যাঙ্ক লুঠেরাদের কথা বলছিস তো?

ধেৎ ওসব আজেবাজে অপরাধী নয়, আমি ধরি যারা এইরকম গাড়ি না রাখার জায়গায় গাড়ি রেখে আইন অমান্য
NO PARKING
সত্যি হাঁদা! তুমি কি ভয়ানক সাহসী!

লোকের চলার পথের ওপর সাইকেল রেখে আইন ভঙ্গের একটা মামলা তোমায় ধরিয়ে দিলুম মেসোমশাই।
বেশ করেছ! এ নিয়ে আমি এক্ষুণি রিপোর্ট করছি!
NO PARKING

এত বড় একটা অপরাধী ধরার জন্য নিশ্চয়ই আমি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাবো মেসোমশাই!
এখন আমাদের দেখতে হবে এই সাইকেলটা কার!

হাঁদারে! সাইকেলটা আমাদের বাংলা স্যারের
ওরে বাবারে!

নিজের চরকায় তেল দেবো – কাল পাঁচশো বার একথা লিখবে!
হাঁদা! তোর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে গেলি।

ভাদ্র ১৩৭২ ১৯৬৫

শ্রাবণ ১৩৭২ ১৯৬৫

হাঁদা-ভোঁদার ক্রিকেট খেলা
খটাস
বুঝলি ভোঁদা! এই ক্রিকেট খেলাই হচ্ছে সব থেকে ঝামেলাহীন খেলা!

ইক্

ভোঁদারে! চল অন্য জায়গায় সরে পড়ি!

হাঃ, হাঃ! এবারের বল ফস্কেছিস ভোঁদা!
হাঁদা! আমার ব্যাট বেরিয়ে গেল!
এইরে!
ঘ্যাঁক্
দ্যাখ, কেমন লাগে!
তুই কিন্রে ভোঁদা! দু'দু' জায়গায় ঝামেলা বাঁধালি!

খটাস
আমি ব্যাট করলে তোর মত যেখানে সেখানে হাঁকড়াব না।

ইস! আমার বাগান!
ওঃ! আমার পাঁচিল!
এইও — সামালকে!

তোমরা যেন বলে দিওনা ভাই— যে আমরা কোথায়!

পৌষ ১৩৭২ ১৯৬৫

চৈত্র ১৩৭৩ ১৩৬৭

চৈত্র ১৩৭৩ ১৯৬৭

হাঁদা ভোঁদার
বস্তু বিনিময়

শিগগির এই ল্যাটা মাছের জারগুলো সব বিদেয় করে দে।
আমি এগুলো কাউকে দিয়ে বদলে অন্য জিনিস নেবো!

পটলা! আমার এই ল্যাটা মাছের জারের বদলে তোর ঐ বোতল-জাহাজটা দিবি?
না ভাই হাঁদা! হ্যাঁ, তবে দিতে পারি, যদি তুই ছ ফলা ওয়ালা একটা ছুরি দিতে পারিস!

গুঁইয়ের কাছে ছ ফলা ছুরি আছে। আমি ওকে মাছ দিয়ে ওর ছুরিটা নেবো!

গুঁই! আমার এই মাছের জার নিয়ে তোর ঐ ছুরিটা আমায় দে!
না হাঁদা! মামা বকুনি দেবে! তবে যদি একটা গুলতি দিতে পারিস তো এটা দিতে পারি!

পটকার একটা গুলতি আছে। ওর সঙ্গে মাছ বিনিময়ে ওর গুলতি নেবো!

না রে হাঁদা! আমি ল্যাটা মাছ চাই না! তবে তুই যদি আমাকে গত বছরের পুরো সংখ্যা 'শুকতারা' জোগাড় করে দিতে পারিস তবে এটা ছাড়তে পারি!

এই যে লেড়ো! তোর ঐ 'শুকতারা'র সঙ্গে আমার এই মাছের জার বদলা বদলি কর!
হল্লি! কেরে আমার! কেটে পড়ো!

তুই নিজে থেকে না দিলে ফাইট করে তোর সব শুকতারা কেড়ে নেবো
বেশ! যদি আমাকে হারাতে পারিস তো সব তোকে দিয়ে দেবো!

তুই-ই জিতেছিস হাঁদা! কিন্তু তোর ল্যাটা মাছ খতম!
চুলোয় যাক মাছ! আমি এই শুকতারা পটকাকে দিয়ে ওর গুলতি নেবো। গুলতি গুঁইকে দিয়ে ওর ছুরি নেবো। আর ছুরি পটলাকে দিলে পাবো ওর বোতলে-জাহাজ!

আবার পটলার কাছে
পটলা! এই নে ছুরি, এবার তোর বোতলে-জাহাজ দে!
বড্ড দেরী করে ফেলেছিস হাঁদা! খানিক আগে ভোঁদা ছ'ফলা ছুরি দিয়ে ওটা নিয়ে গেছে!

এই ভোঁদা! এই ছুরি নিয়ে ওটা আমায় দে!
না! আমিই ছুরি দিয়ে এটা পটলার কাছ থেকে এনেছি! কিন্তু---

--কিন্তু দিতে পারি যদি তুই দিতে পারিস এক জার ল্যাটা মাছ!
উঃ!

পৌষ ১৩৭৫ ১৯৬৮

হাঁদা ভোঁদার
ঘোড়দৌড়

এই হাঁদা! চ ঘোড়ায় চাপি! বেশ ছোট ঘোড়া আছে!
আরে ছোঃ! ঐ লিলিপুটে চড়ে সময় নষ্ট করে কি হবে! তার চেয়ে বরং আমি শুকতারা পড়ি!

ইস্! তুই কি নিজেকে ঘোড়া চড়তে ওস্তাদ কাউবয় মনে করিস নাকি?
তা নয়তো কি! তোরা বুনো ঘোড়া এনে দেনা—দেখবি কি রকম বাগ মানাই! তাগড়া বড় ঘোড়া এখানে থাকলে দেখিয়ে দিতুম ঘোড়াকে বাগে এনে কি করে দৌড় করাতে হয়!

নদীর ওপারে আমার কাকার বড় ঘোড়া আছে। আমি বিকেলে চেয়ে আনবো, তারপর দেখবো তোর কত কেরামতি!
তুই এক্ষুনি নিয়ে আয় না!

বিকেলে
এবার দেখো তোর ঘোড়ার কায়দা!
বেশ! দ্যাখ, একে ছুটিয়ে নিয়ে সামনের ঐ গাঁয়ে যাবো, তারপর আবার এখানে ফিরিয়ে আনবো!

হোয়া-হোয়া! এই উজবুক, ঘুরে দাঁড়া না!

এ্যাই বুদ্ধু ঘোড়া কোথাকার! খবরদার ঐ বেড়া ডিঙোবিনা বলছি!

ভোঁদা! তোরা শিগগির এসে আমাকে ধর!

আরে-আরে! খবদ্দার জলে নামবি না বলছি!

ব্যাপার কি বলতো? হাঁদাটা করছে কি?
এ্যাই হতচ্ছাড়া ঘোড়া! শিগগির ডাঙায় ফিরে চল হতভাগা!

মরেছে! ঘোড়া হাঁদাকে নিয়ে ঘোড় দৌড়ের বদলে ঘোড় সাঁতার দিয়ে চলল কোথায়! ঘোড়া ফিরে না গেলে কাকাকে কি বলব?

কিছু পরে
কাকা! তোমার ঘোড়াটা হারিয়ে গেছে!
না-না! হারাবে কেন! ও সোজা নদী পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে। খুব ভালো ট্রেনিং দেওয়া ঘোড়া!
তাহলে হাঁদা কোথায়?

হাঁদা? — মানে সেই ছেলেটি, যে বুনো ঘোড়া বাগে আনতে পারে? ঐ যে সে!
ফ্যাচ! ফ্যাচ!

চৈত্র ১৩৭৫

হাঁদা-ভোঁদার
পিকনিক
তোদের বাগান বাড়িতে পিকনিক করতে এলুম ভোঁদা — কিন্তু এদিকে যে রান্নার কাঠ নেই মাইরি! শিগগীর আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা কর!
মরেছে! বাড়িতে যে কয়লা টয়লাও কিছু নেই রে!

ঠিক আছে, আমাদের বাগানের পুরোন ভাঙা কাঠের বেড়া দিয়েই আগুন জ্বালাব!

অ্যাই হাঁদা! বেড়া নিচ্ছিস কেন? এ বেড়া আমাদের
না! বেড়া ভেঙে আমাদের জায়গায় পড়েছিল, অতএব এ বেড়া আমাদের

আমিও হতচ্ছাড়ার গাছ কেটে নিয়ে আসবো!

আশ্চর্য! গাছের চারদিকে এরকম তার জড়ান কেন?

ভাদ্র ১৩৭৬ ১৯৬৯

হাঁদা ভোঁদার
মডেল বোট
ঘরে তৈরি আমার তিন পাল ওয়ালা বোট দেখলে ভোঁদার চোখ কপালে উঠে যাবে !
দ্যাখ, ভোঁদা, আমার তিন পাল ওয়ালা ইয়াচ বোট ! তোদের যে কোন বোটের থেকে তিন গুণ জোরে এই বোট ছুটবে, বুঝলি ?
মডেল বোট চালানো প্রতিযোগীতা
সরে যা ভোঁদা ! এবার আমার বোট ভাসাবো। দেখবি আমার বোটের কি স্পীড ! তার মানে কাল যে মডেল বোট চালনা প্রতিযোগীতা হবে তাতে আমিই ফার্স্ট !
মরেছে! এযে ডুবে গেল !
হাঃ হাঃ ! তুই যে ফার্স্ট তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এত তাড়াতাড়ি কোন কিছু ডুবে যেতে আমি দেখিনি হাঁদা !
ঠিক আছে ! কাল যখন দেখবি সত্যিই আমি ফার্স্ট হয়েছি তখন ঐ হাসি বেরিয়ে যাবে !
হিঃ হিঃ !
ভোঁদাকে তো বলে এলুম যে আমিই ফার্স্ট হবো, কিন্তু কি করে — ঠিক হয়েছে ঐ হাঁস দেখে একটা আইডিয়া এসেছে !
পরে
প্রথমে বোটের তলাটা করাত দিয়ে কেটে ফেলবো-----
··· তারপর ভেসে থাকবার জন্যে ঐখানে পুরোনো কর্ক এঁটে দেবো-----

···আর তারপরে আমার পোষা হাঁসটাকে ঠিক জায়গায় ফিট্ করে দিলুম,ব্যাস— আমার রেসে জেতার বোট তৈরি হয়ে গেল!
রেসের দিন
মাথাটা নিচু করে রাখিস প্যাঁক্ প্যাঁক্!
তোমরা ঐখান থেকে বোট ছাড়বে। সময়ও হয়ে এল!
তৈরি থাক প্যাঁক প্যাঁক! যাবার ইশারা করলেই ছুটবি!
রেডি···· স্টেডি··· গো!
ইয়া! দ্যাখ আমার বোট কেমন এগোচ্ছে!
দ্যাখ ভোঁদা! হাঁদার নৌকো ঠিক যেন স্পীড বোটের মত ছুটছে!
এ্যাই হতচ্ছাড়া থাম বলছি!
হাঁদার সেরা নৌকো যে উল্টো রাস্তায় ছুটছে রে!
হিঃ হিঃ!
বাপরে! নৌকোর ছদ্মবেশে ব্যাটা আমাকে খেতে এয়েচে!
রেসের শেষে
এদিক দিয়ে আমার কাছে আয় প্যাঁক প্যাঁক!
তুই ফার্স্টের বদলে একেবারে লাস্ট হয়ে গেলি হাঁদা! তোর এ হাঁস প্যাঁক প্যাঁকই তোকে ডোবালে!
প্যাঁক! প্যাঁক!

মাঘ ১৩৭৬ ১৯৭০

হাঁদা ভোঁদার
নির্বুদ্ধিতা
এই যে হাঁদা! কাল তোমার পিসেমশাই ভোঁদাকে দিয়ে এটা পাঠিয়েছিলেন পাল্টাবার জন্যে। সেটা পাল্টে দিয়েছি, নিয়ে যাও।
আচ্ছা দিন। পিসেমশাইয়ের হাতে দেবো।
মরেছে! এযে মুষলধারে বৃষ্টি এসে গেলো! ঐ বারান্দার নীচে দাঁড়াই।
উঃ কি বৃষ্টিরে বাবা! ভাগ্যিস ভাল মত এখানে দাঁড়াতে পেরেছিলাম, নাহলে এতক্ষণে ঢোল হয়ে যেতাম!
ছপাং!
ঢোলের বদলে এবার যে ঢাক হয়ে গেলুম!
আর দাঁড়িয়ে কি হবে। ঐ লরিটা মনে হচ্ছে আমাদের এদিকেই যাচ্ছে, এটাতে চুপচাপ উঠে পড়ি।
তেরপলের তলায় বেশ আরাম করে বসা যাবে!

ফাল্গুন ১৩৭৬ ১৯৭০

হাঁদা ভোঁদার

পরোপকার

টুঁই!
ঐ যাঃ! গুঁটলেদাদের বাড়ি থেকে ঐ পাখিটা বেরুলো ভোঁদা! নিশ্চয় খাঁচা থেকে পালিয়েছে!

শিগগির বাবার মাছ ছাঁকা জালটা নিয়ে আয় ভোঁদা! গুঁটলেদাদের পাখিটাকে ধরে দি!
ঐ পাখি কি তুই আর ধরতে পারবি? আর বেচারাকে আবার ধরেই বা কি হবে!

ধরে দিলে পরোপকার করা হবে, আর কিছু পয়সা আদায় করে নিয়ে দারুণ ছবি 'মার কাটারি' দেখতে হবে!

ওপস্! পাথরে হোঁচট খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলুম রে ভোঁদা!
টুঁই!

এবার ব্যাটাকে ঠিক পাকড়াবো
টুঁই!

ও-ও-ও!

আগ্রুলস্!

আশ্বিন ১৩৭৭ ১৯৭০

হাঁদা ভোঁদার
ইস্কুল ফাঁকি

হাঁদা! এই চিঠিটা স্কুলে হেডমাস্টার মশায়কে দিবি। কাল বৃষ্টিতে ভিজে তোর শরীর খারাপ করেছিলো বলে তোকে স্কুলে যেতে দিইনি, তাই এই চিঠিটা লিখে দিলুম!

আচ্ছা পিসেমশাই!

হিঃ-হিঃ! আমি আজও ইস্কুলে যাবোনা। কাল গিয়ে হেডসারকে চিঠি দেবো, তিনি কিছু ধরতেই পারবেন না!
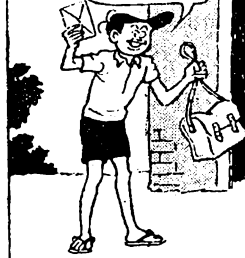
ভোঁদাটা গুড বয় হয়ে ইস্কুলে চলে গেছে! ও থাকলে দুজনে বেশ ঘোরা যেতো! এখন একাই ঘুরে বেড়াই

এই মরেচে! অঙ্কের সার আসছে! দেয়ালের ওপাশে লুকিয়ে পড়ি!

এঃ! লাফিয়ে পড়বার আগে লক্ষ্য করিনি, পড়বি তো পড় একেবারে পচা কাদায় পড়লুম!

কিছুক্ষণ পরে
ওরে বাবা! এযে খোদ হেড সার! দেখে ফেলবার আগে লুকিয়ে পড়ি!

হেড সার আমাকে দেখতে পায়নি! ভাগ্যিস ডাস্টবিনটা এখানে ছিল!

বৈশাখ ১৩৭৭ ১৯৭০

হাঁদা·ভোঁদার
অর্থ উপার্জন

এই রে বাবা! এযে ভাঁড়ে মা ভবানী! ইমিডিয়েট কিছু মালকড়ি দরকার।
আড্ডা না মেরে দুজনে বাগানে তারের বেড়াটা লাগিয়ে ফ্যাল!

দাঁড়া, আগে তারের জালটা খুলে ফেলি। তাড়াতাড়ি খোলবার কায়দা তুই জানিস না, আমি জানি।

মরেছে! এযে আমাকে শুদ্ধু জড়িয়ে ফেলছে!

আরে এ্যাই হতচ্ছাড়া ভোঁদা! আমাকে উদ্ধার করবি তো?

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ১৯৭১

হাঁদা-ভোঁদার
কুকুর প্রদর্শনী

আজ কুকুর প্রদর্শনী হচ্ছে। চ' ভোঁদা দেখে আসি।
কুকুর প্রদর্শনী
আজ বিকেল ৫ টায় যোগদান করুন
চল।

হাঁদা-ভোঁদা, বিশেষ কাজের জন্যে আমি কুকুরকে প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে পারছি না। তোরা দুজনে নিয়ে যাবি?
নিশ্চয় নিয়ে যাবো গুপিদা!

এই যে হাঁদা এণ্ড ভোঁদা! তোমরা কি তোমাদের এই পোমারেনিয়ান কুকুরটাকে আমাদের প্রদর্শনীর জন্যে এনেছো।
হ্যাঁ সার!

বেশ! তাহলে এই ফর্মটায় কুকুরের জাতি ও বংশতালিকার বিবরণ লেখ।
মরেচে! পোমারেনিয়ান, এ যে মস্ত লম্বা কথা। কি বানান হবে রে ভোঁদা?
ENTRY FORM

আষাড় ১৩৭৮ ১৯৭১

হাঁদা-ভোঁদার
বন্ধুপ্রীতি

যে তাড়াতাড়ি শোয় আর ভোরে ওঠে সে স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান হয়! বুঝলি? অতএব কাল ভোরে যে প্রথম বাজারে চকোলেটের দোকানের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, তাকে চকোলেটের বাক্স উপহার দেবো!
আচ্ছা স্যার!

নিঃসন্দেহে জিতে যাবো! ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে একেবারে জামাটামা পরে তৈরি হয়েই শুয়ে পড়ি!

পরদিন সকালে…
ক্রী…ক্রী…ক্রী…
ওওওওঃ! এটাকে কেউ বন্ধ করে দে না!

কানের কাছে ঘড়ির কান ফাটানো এলার্ম এর শব্দেও যখন ও উঠলো না, তখন আমার ডাক তো শুনতেই পাবে না! বরং এই ঢিলটা ওর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দি!

পিং!
আঁই!

তাহলে তুই আমার নাকের মাথায় ইঁট মেরেছিস! আমিও এক্ষুনি তোর থ্যাবড়া নাকের সঙ্গে আমার এই মুস্টির যোগাযোগ ঘটাবো!
এইরে! তেড়ে আসে যে!

দুজনেই ঠিক সময়ে এসে চকোলেট জিতেছিস!
চকোলেট লজেন্স

খুব সকালে ওঠা আমার অভ্যাস স্যার! এর জন্যে আমার এলার্ম ঘড়িরও দরকার হয় না!
চকোলেট লজেন্স

মাঘ ১৩৭৯ ১৯৭৩

হাঁদা ভোঁদার
জ্ঞান দান

অ্যাই ভোঁদা, দাঁড়া! রাস্তায় যেতে যেতে ওটা কি পড়ছিস?

এ ভাবে বইয়ের ওপর চোখ রেখে পথ চলা খুব বিপজ্জনক, তা জানিস?

কোথা দিয়ে যাচ্ছিস সব সময় সে দিকে নজর রাখবি!

আঁই!
!

শুকতারাটা এবারে পড়বো রে হাঁদা?

পরে
এ কি! তুই এ ভাবে রাস্তার একেবারে ধারে বসে পড়ছিস?

বৈশাখ ১৩৮০ ১৯৭৩

হাঁদা-ভোঁদার
ফাঁদ পাতা

এর ভেতর দিয়ে যাবো না হাঁদা! ভোঁদা একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে রেখেছে!
কুকুর হইতে সাবধান
আরে দূর! আমি পরশুদিন দেখেছি। মোটা হদ্দ কুঁড়ে একটা। মাছি পর্যন্ত তাড়ায় না!

ঠিক আছে, তুই এতো ভয় পাচ্ছিস! কিন্তু আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভয়ের কিছু নেই!

কিরে ব্যাটা কুমড়োপটাশ!

একি! কে আমাকে পা আটকে দিয়ে ফেলে দিলো?

ঐ যে হতচ্ছাড়া! ঝোপের আড়ালে পা দেখতে পাচ্ছি!

এমন শিক্ষা দেবো, পায়ে আটকে আর কাউকে— আরে! এটা যে নকল মানুষ!

কার্তিক ১৩৮০ ১৯৭৩

হাঁদা-
ভোঁদার
সিলভার কাপ

তুই তো অসুস্থ ভোঁদা! আজ স্কুল স্পোর্টস। এবার যা প্ল্যান করেছি – দেখবি, দৌড়ের প্রথম পুরস্কার 'সিলভার কাপ' অক্ষত দেহে বুক ফুলিয়ে নিয়ে আসবো।

অবশ্য তুই এতে যোগ দিতে না পারায় একদিকে ভালোই হয়েছে। কারণ তুই থাকলেই নানা গণ্ডগোল হয়।

রাস্তায়
এই তো একজন দৌড় প্রতিযোগী যাচ্ছে। এবার আমার প্ল্যান মতো কাজ শুরু করি।

আরে বদমাস! হাঁথ মে পাই তো ডাণ্ডা পিটাং পিটাং তোহার হাড্ডি তোড় দি।
আমার প্ল্যান অনুযায়ী বক্কাই কাদা ছুঁড়েছে মনে করেছে।

পরে
উফ্!
এই আরেকজন।

হাঁদা তোকে আমি—
ওরে বাবা! খ্যাপা ষাড়!
ঘোঁয়াৎ!

হোঃ হোঃ! আশা করি টেকো মস্ত দৌড়বীর!
বাবাগো! বাঁচাও!

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ ১৯৭৪

হাঁদা-ভোঁদার

ব্যাবসা বুদ্ধি

অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ১৯৭৪

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ ১৯৭৫

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ ১৯৭৫

হাঁদা-ভোঁদার
গির্জারোহন

ছাত্রবৃন্দ! পর্বতারোহণ সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা।
ছেলেরা, আশা করি পাহাড়ীবাবুর পাহাড়ের কথা তোমাদের ভালো লেগেছে?
স্যার বেশ সুন্দর বলেছেন, নারে ভোঁদা?

সরঞ্জাম পেলে পাহাড়ে ওঠা খুবই সহজ ব্যাপার।
বলিস কি রে হাঁদা? তুই তো একটা পাঁচিলেও উঠতে পারবি না।

ওরে কি ভেবেছিস তুই? রাতে ওই গির্জার একেবারে টঙে চড়ে তোকে দেখিয়ে দেবো পারি কি না।
ঠিক আছে। দেখা যাবে তোর কেরামতি।

রাত্রে
পাহাড়ে চড়ার এই সরঞ্জাম আমি স্কুল থেকে ধার নিলুম। কাল সকালে স্কুল খোলার আগেই আবার রেখে যাবো।

এবার প্রথম কাজ হলো ওপরের কার্নিসের খাঁজে হুকটাকে আটকানো--

এবার তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাবো। এ যে সহজ তা আমার জানাই ছিলো!
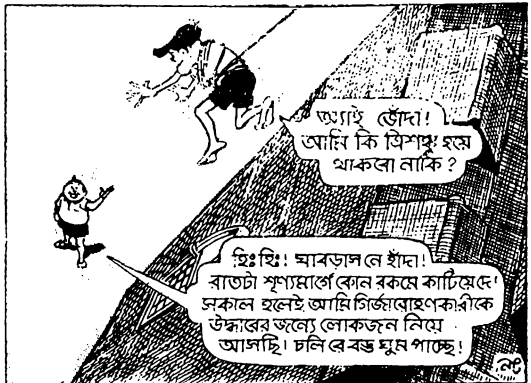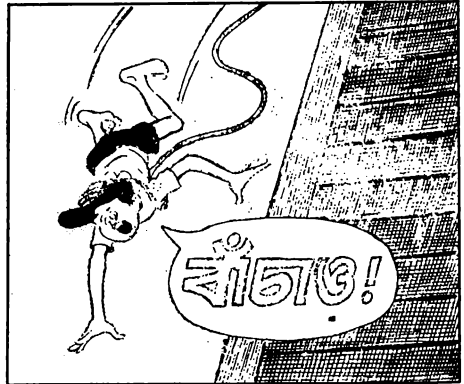
যা ভেবেছিলাম এ তার চেয়েও সোজা!

দ্যাখ্ ভোঁদা, আমি এভারেস্টের চূড়ো মানে গির্জার চূড়ো ছুঁয়েছি!

ওরে বাবা! হড়কে গেলুম যে!

বাঁচাও!

যাক, দড়ির প্যাঁচে আটকে গেছি!

অ্যাই ভোঁদা! আমি কি ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকবো নাকি?
হিঃ হিঃ! ঘাবড়াস নে হাঁদা! রাতটা শূণ্যমার্গে কোন রকমে কাটিয়ে দে! সকাল হলেই আমি গির্জারোহণকারীকে উদ্ধারের জন্যে লোকজন নিয়ে আসছি। চলি রে বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

ক:
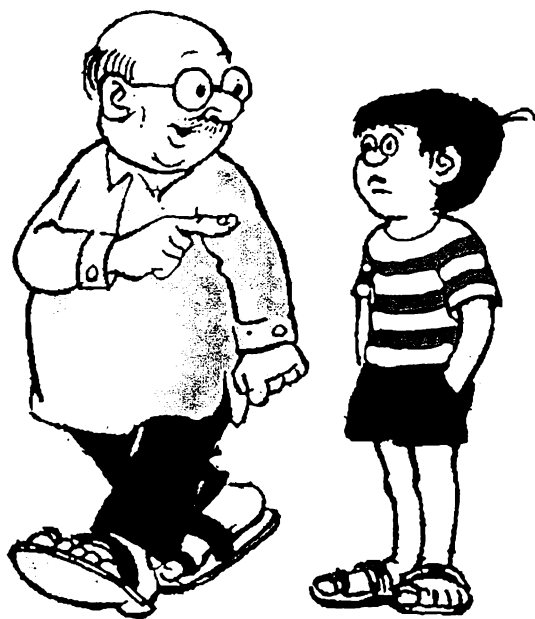
অধুনা লুপ্ত ছোটদের আসর পত্রিকার জন্য করা,
এটিও একটি কাল্পনিক চরিত্র দিয়ে
করা ছোটদের চিত্রকাহিনী।
নারায়ণ দেবনাথ

খাঁদুর দাদু কিন্তু একেবারেই পুরোনো আমলের লোক নন। একজন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক। খাঁদুকে তিনি যে একটু বেশিই স্নেহ করেন। মজাদার যন্ত্র, হরেকরকম রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি তিনি আবিষ্কার করে চলেছেন প্রতিদিন। তাঁর আবিষ্কারের প্রয়োগ নিয়েই যত গণ্ডগোল। খাঁদু সেইসব আবিষ্কারগুলোকে অতি উৎসাহে অপব্যবহার করে বসছে আর শেষমেশ নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে কিম্বা দাদু ও নাতি দুজনেই বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে।
নারায়ণ দেবনাথ এই কমিক্সের সিরিজেও অপরাজেয়। তাঁর ছবি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ছাড়াও উদ্ভাবনী প্রতিভা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পাঠকদের অভিভূত করে। অন্যান্য কমিকসের মতো এটিও 'কিশোর পাঠ্য' বলে প্রকাশিত হলেও তা সব বয়েসিদের কাছে সমাদৃত। সংখ্যায় কম হলেও এই কমিক্সের চিরস্থায়ী আসন বাংলা সাহিত্যে থেকে যাবে।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
আমার আবিষ্কারের অপব্যবহার করা? সাবধান আর যেন এমন না হয় বুঝেছিস?
উরিস! খুব বুঝেছি দাদু! এবার কানটাকে ছাড়ো!
নে, এবার কাজে লেগে যা। বাগানে গিয়ে আমার এই নতুন আবিষ্কারটা পরখ কর। এটা যে গাছের জল প্রয়োজন তাকে ঠিক বের করে তাদের দিকে জল ছিটিয়ে দেবে!
ওহ্! ঠিক আছে, দাদু!
—এবং এর যেন অপব্যবহার না হয়! এটা মনে রাখবে!
আরিব্বাস! এটা ঠিকঠাক কাজ করছে! আমি যে গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছি নলের মুখের ঝাঁঝরি ঠিক ঘুরে ফিরে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে!
শুসস্‌স্‌!
কি দুর্দান্ত আবিষ্কার!
এই গাছ আমি খুবই ভালোবাসি... আহ্‌ক!
ওহ্ না! খুবই দুঃখিত! এটা একটা দুর্ঘটনা!
বাঁচা গেলো! আমার কথা ওর বিশ্বাস হয়েছে!
হেয়ারড্রেসার খাসা চুল বেঁধে দিয়েছে, আর ফুল লাগিয়ে আরো খোলতাই করেছে!
সেই সঙ্গে আমার পকেটের বেশ কিছু টাকা ফাঁকা করে দিয়েছে!

ওরে বাবা, মা! আবার নয়!
অ্যাই! এটা কি হচ্ছে?
ইঃ! আমার চুলবাঁধা বরবাদ হয়ে গেলো! জলদি বন্ধ করো!
চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না!
হুঁহুঁহুঁ!
অ্যাই পাজি ছোকরা!
এর জন্যে আমি দায়ী নই!
ওখানে অতো গোলমাল কিসের?
এটা দাদুর সেই বাহারী জলের ঝাঁঝরি! কিন্তু ভয়ানক!
মরেচে! জানালার সামনে বাক্সটবে যে গাছ রয়েছে আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম!
উপস্!
তোকে এটা নিয়ে তামাসা করতে নিষেধ করে সাবধান করেছিলাম!
উফ্‌!
এটা অন্যায় হচ্ছে, দাদু! তোমার বাজে আবিষ্কারই এ কাজের জন্যে দায়ী!
সেদিন রাত্রে..
ইরক! ঘরের ভেতরে বৃষ্টির সৃষ্টি হলো কি করে?
হোঃ হোঃ!
তোমার তৈরি কল
এবার তোমার দিকেই
জল ছুটাক!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
তোমার পিঠে ওটা কি বাঁধা রয়েছে দাদু?
এটা আমার নতুন আরেকটা আবিষ্কার খাঁদু! যারা দেয়াল বানাতে চায়, এটা তাদের দারুণ সাহায্য করবে।
এদিকে দ্যাখ! এই বোতাম কপে স্প্রে করলেই সেটা দেয়ালের আকার নেবে!
আরিব্বাস! এ তো দারুণ বিস্ময়কর!
বাপরে! এটা যে ইঁটের মতো শক্ত হয়ে গেছে!
নিশ্চয়ই! ফেনাটা চটপট পাথরে পরিণত হয়ে যায়।" চমৎকার, তাই না?
এটা নিয়ে আমি মজা করে আসি!
বেঙাকে একটা চমক লাগিয়ে দি!
উফ! ফুটপাথের ওপর এই কংক্রীটের চাঁইটাকে ফেলে রাখলো?
হিঃ হিঃ! আমি রেখেছি!
অ্যাই, ছুটো! ধরতে পারলে টুঁটো করে দেবো! জ্বালোয় জ্বালোয় ফের বলছি! কেউ ওকে থামাও!
থামিয়েছি!
তাজ্জব!
দারুণ কাজ করেছো! বড় বজ্জাত ছাগল এটা! এই নাও পুরস্কার!
পাঁচ টাকা! ইকুরর!
এইরে! বাড়ির অংক করা হয়নি! অংকের স্যারের স্কুল যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

যদি আমি ওঁর দরজাটা দেয়াল তুলে ভরাট করে ফেলতে পারি তবে আর উনি বেরোতে পারবেন না।
এই যে, হাঁদু! তুমি কি আমার সঙ্গে স্কুলে যেতে চাও?
বাহ্! উনি পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।
যদি কিছু মনে না করেন স্যর! তো আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। কেউ আসার আগেই আমি স্কুলে পৌঁছাতে চাই!
হোঃ হোঃ! স্কুলের গেট আটকালেই জোরদার মজা হবে!
কেউ গেটে দেয়াল তুলে দিয়েছে, স্যার! আমরা ভেতরে যেতে পারবো না!
ঐ তো সেই পাজি হতচ্ছাড়াটা! যে এর আগেরবার আমার পালানো আটকেছিলো!
গদাম!
হাঁদু তার নিজের তৈরি দেওয়ালের ওপাশে গিয়ে পড়লো!
ওয়াহ্!
ঘাবড়াবার কিছু নেই, হাঁদু! কাল ছুটির পরে ব্ল্যাকবোর্ডে আমি কিছু অঙ্ক লিখে রেখে এসেছিলাম। আমরা এই দেয়াল ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত তুই ঐ করছিস কিনা সেটা দরোয়ান নজর রাখবে!
হঁরক!
বাহ্! দাদুর একটা আবিষ্কার নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তো আমার এই হাল হলো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

বাহ্! এই নচ্ছার মাছিটা বড্ড জ্বালাচ্ছে। আমি ওটাকে এই স্প্রেটা লাগাতে পারছি না, আর তোমরা দাদু নাতিতে আড্ডা দিচ্ছো!
অ্যাই! তুমি এই পদার্থটা চারদিকে বড্ড বেশী ছিটোচ্ছ!

আমি তোমার জন্যে বিশেষ এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছি, গিন্নী! এটা লক্ষ্য করো!

এটা একটা স্বয়ংক্রীয় বেতার-চালিত মাছি মারিয়ে। এটা কি ভাবে কাজ করে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি।
দুর্দান্ত দাদু!

ঐ যে!
দারুণ!
চটাস্

আমি তোমার হয়ে মাছিটাকে মেকানিক্যাল চাপড় লাগাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি তুমি খুবই ব্যস্ত দিদা।

আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এটা দিয়ে দারুণ মজাও হবে!

...তাই আমি খাঁদার নাকে চমৎকার একখানা ঘুঁসি ঝাড়বো, তারপর...
এতো মারকুট্টে মস্তান চ্যাপলা!

...আর তারপর আমি আমার প্রতিশোধ নেবো!
হাঃ হাঃ!
গেছি রে!

এটাকে যদি পাল্টা মারতে যাই তবে আমাকে ছুটতে হবে!
মনে হচ্ছে বলটা আমারই!
ওরফ!
ঐ যে খাঁদা আসছে ও কয়েকদিন আগে আমাকে হেনস্থা করেছিলো। তাই এই আমার বদলা নেবার সুযোগ।
এই জেলি দিয়ে তোর থোবড়ার মেক-আপ করে দি, খাঁদা!
ইরক! তুই, এখন?
আমার বদলে তোর মুখ মেক-আপ হয়ে গেলো।
হাঃহাঃ!
গ্লাব!
থ্যাপড়!
গরর! আমি তোকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবো!
মরেচে! কিছুক্ষণের জন্যে এখান থেকে আমার কেটে পড়াই ভালো।
ধ্যাৎ! এই পোকাগুলি আমাদের পিকনিকটাই ভণ্ডুল করে দিচ্ছে! সব গুটিয়ে ফেলে আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।
আঃহা! এইখানে যেখানে দাদুর যন্ত্র মন্তর মতো সত্যি কাজ করবে!
ঐ যে! আমি ওটাকে সেট করেছি ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে সব কিছুকে চাপড় লাগাতে!
দাদুর আবিষ্কার এটাই খুব কাজে দিলো।
দুর্দান্ত, দাদু! তুমি আমাদের সঙ্গে পিকনিকের ভাগ নাও!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
এটা নির্ঘাত সঠিক মিশ্রণ হবে।
এবার জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে!
আরে, দাদু তো এখানেই ছিলো! দাদু, তুমি কোথায়?
ওপরে এখানে!
ওকৎ!
আমি জুতোর জন্যে এইমাত্র একটা তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছি। এটা জুতোকে সেঁটে
এটা লাগিয়ে তুই যেখানে ইচ্ছে হাঁটতে পারবি!
বাস রে! সত্যি দাদু তুমি জাদু জানো' তোমার জবাব নেই।
হক! জুতো ঠিকই এঁটে আছে, কিন্তু দেওয়ালের বালির চাপড়া খুলে গেলো!
চড়াৎ!
বাঁচাও!
দারুণ জিনিস, দাদু। আমি কিছু নিচ্ছি।
ঠিক আছে, তবে খুব সাবধান, খাঁদু। দেখো আমার কি ব্যাপারটা ঘটলো! উপস!

হুঁঃ! এই চটচটে জিনিস নিয়ে হাঁটা খুবই মুস্কিল!
এ দুর্দান্ত! কিন্তু এটা খুলে আসবে না তো?
কখনই না! আমার আবিষ্কারে কোন ভুল নেই!
এবার আমি এই নিয়ে বেশ মজা করতে পারি। এই যে হতচ্ছাড়া পাজীগুলো, তোদের মুজো মচকে দেবো।
গরর! খাঁদা তুই আমাদের গায়ে নোংরা কাদা ছুঁড়ে মারলি? দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি!
হিঃ হিঃ! কেমন বোকা বানিয়েছি, বুদ্ধুরা!
একি রে!
ইয়াঃ!
গেলুম রে! গোল থেকে আমার চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলো!
কি যে রদ্দিমার্কা আবিষ্কার করো, দাদু! এ বার তুমি স্পেশাল জুতো আবিষ্কার করো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
মৎস শিকারীদের জন্যে এ এক সবচেয়ে বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার। চল, খাঁদু! নদীতে গিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখি।
দেখ খাঁদু! যে বঁড়শীটা আমি আবিষ্কার করেছি তাতে মাছের এর কাছে আসার প্রয়োজন নেই এটা মাছের খোঁজ করে তার পেছনে তাড়া করবে।
তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছো দাদু।
না, দাদু রসিকতা করছে না!
দেখেছিস? দেখ, একটা ঠিক ধরেছে!
দারুণ!
আমি মনে করি আমার আবিষ্কার বেশ ঠিকঠাক কাজ করছে। আমি আরো মনে করি এই দারুণ কাজের পুরস্কার হিসেবে একটু বিশ্রাম করে নি।
হিঃ হিঃ! এবার আমার পালা!
এই বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরার জন্যে নদীর দরকার নেই!
মাছের বাজারে
থ্যাঙ্ক মাছের জন্যে ধন্যবাদ, কেঁদুদা।
ওঁ কৎ! এটা কি করে হলো?
এবারে মাছের বাজার থেকে টাটকা মাছ ধরার চেষ্টা করি।

জ্যান্ত মাছ নিয়ে যান, দাদা! দেখুন এখনো খাবি খাচ্ছে—
ইরক!
ছপাৎ!
ছপাৎ!
হিঃ হিঃ! দাদুর এই আবিষ্কারটা যেন জাদুর মতো কাজ করছে!
দ্যাখ, ফটকা! তোর লালমাছ আমার বঁড়শীতে ধরে নিচ্ছে!
অ্যাই, থাঁদা! কি হচ্ছে?
হিঃ হিঃ! ওকে ধোঁকা দিয়েছি। কিন্তু বোকাটা ভয়েই পালালো!
দারুণ মজা করা যাচ্ছে... আরে! এখন বড়শীটা কোথায় যাচ্ছে? আমি বরং রীলটা গুটিয়ে নি!
একি রে! আমি রীলটা গুটোতে পারছি না!
আসলে এটা আমাকে ঝাঁকি মেরে শূন্যে তুলে ফেলেছে!
চিড়িয়াখানা
ওরে বাবারে! আমি চিড়িয়াখানার মধ্যে একটা হাঙরকে বঁড়শীতে আটকেছি!
অ্যাই! আমার আবিষ্কার সেই বঁড়শীটা কই?
ঠিক আছে, তোমাকে বলবো ওটা কোথায়— কিন্তু ওটা তোমাকে নিজে গিয়ে আনতে হবে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
একি! আমার বিছানা উধাও! ওটা দিয়ে তুমি কি করেছো, দাদু?
ওটা অনেক জায়গা নিতো খাঁদু। ওটা আমি ফেলে দিয়ে তোর জন্য নতুন একটা আবিষ্কার করেছি।
এযে! একটা ভাঁজ করা বিছানা। এটা তোকে তোর শোবার ঘরে খেলার অনেক জায়গা দেবে।
সেটা ঠিকই হবে! কিন্তু কেমিক্যাল দাদু যেভাবে ভেবেছে সেভাবে নয়!
আমার ঘরে খেলবি আয় ফুচে। আমি এখন অনেক জায়গা পেয়েছি!
ঠিক আছে, খাঁদু!
জায়গা অনেক, কিন্তু কি খেলা হবে বুঝতে পারছি না।
বুঝতে পারবি। মুহূর্তের মধ্যে একটা কিছু তোকে গুঁতো লাগাবে!
গেছি রে!
হাঃ হাঃ!
এর জন্যে আমি দুঃখিত আমি নির্ঘাত ভুল করে বোতামটায় চাপ দিয়েছিলেন। সুস্থ হবার জন্যে বিছানায় বোস!
এই বোতামটা গদি ঝাঁকিয়ে তোলবার জন্যে। কিন্তু আমি ফুচেকে ঝাঁকিয়ে তুলবো!

ওঃ! ইয়ো! গেছিরে! বাঁচাও!
খাবার তৈরি! আর ফুচের জন্যেও খাবার তৈরি করেছি!
ওহো! আমার জন্যে আর একটা সুযোগ!
আসছি মা! তুই এখন ওধারের দিকে যা, বুচে।
অ্যাই! তুই আমাকে কি করছিস, খাঁদু?
ফুচে - হয়ে - কোথাও চলে গিয়েছে! তাই ওর হয়ে আমি এগুলিও খেয়ে নিচ্ছি!
এদিকে
এখানে ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং রয়েছে। দেখি যদি কিছু তারের সঙ্গে তার লাগিয়ে দি তাহলে কি হয়!
এবারে বুচেকে বাইরে আসতে দিই।
গেছিরে! দরজা দিয়ে বিছানাটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে! বাঁচাও!
ঝড়াং!
উফ্! অবশেষে মুক্ত!
ইরক! এটা আমার দিকেই আসছে!
বোকামি করে নতুন বিছানার কে এই দশা করেছে?
এটা আমি করি নি! আমি এখানে ছিলাম না, মনে আছে?

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
উঃ! এই নয়া জুতোটা আমাকে মেরে ফেলছে!
এর কারণ হচ্ছে চামড়াটা খুবই শক্ত।
এই কেমিক্যাল আমি যা মিশ্রিত করছি এটা চামড়াকে নরম করবে।
ওফ! খুব ভালো হবে, দাদু!
মরেচে! তুমি নিশ্চয়ই রসিকতা করছো না, দাদু! এটা ওদের এতো নরম করেছে যে গলে যাচ্ছে!
অ্যাই মরেচে!
ইস্! এ ব্যাপারে তোর মাকে আমি কি কৈফিয়ত দেবো?
তা জানিনা। কিন্তু এই পদার্থটা দূর করে দিয়ে আসি।
আঃহা! ঐতো গুটকে আর ওর ভাই পুটকে। ওরা সব সময় আমার পেছনে লাগে!
অ্যাই!
এটা কিছুক্ষণের জন্যে তোদের বক্সিং থামিয়ে দেবে!
আরগহ! এটা তুই কি করালি, খ্যাঁদা?
হেঃ হেঃ! তোরা দুটোতে জুড়ে গেছিস!
বলটা আমাকে পাস দিয়ে দে। আমি হচ্ছি তারকা স্ট্রাইকার
আঃহা! তারকা স্ট্রাইকারকে এবার আমার খেল দেখাচ্ছি!
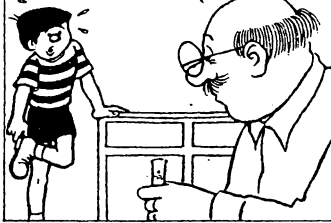
এই শটটা লক্ষ্য করো!
তার চেয়ে তুমি এটা লক্ষ্য করো।
ইয়ো! বলটার আবার কি হলো?
হাঃ হাঃ!
ইয়াগ্গহ্‌! এ যেন চটচটে একতাল টফির পিণ্ডের মতো আমার বুটে লেগে রয়েছে!
মজা তো খুবই দারুণ! কিন্তু যখন আমার মা জুতোর ব্যাপারে জানবেন তখনই দাদু ঝামেলায় পড়বেন।
হঠাৎ
এটা আমি নেবো!
আ্যাই! চোরটাকে আটকাও! ব্যাগে দশহাজার টাকা রয়েছে!
মরেছে! ব্যাগ ছিনতাইবাজ!
আমি ওকে থামাবো! প্রথমেই, ব্যাগটা...
ইরক! ব্যাগটার আবার কি হলো?
এবার ওর জুতো, ওকে রাস্তার সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে!
এবার তোমায় ধরেছি, চাঁদু!
দারুণ জাদু দেখিয়েছো, খোঁদু! আমি নিশ্চয় তোমাকে পুরস্কৃত করবো!
সেইমতো
তুমি আমার জুতোর কি অবস্থা করেছিলে সেটা আর মাকে বোলোনা, দাদু! আমি নতুন আর এক জোড়া কিনেছি আর এখনো আমার কাছে অনেক টাকা আছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু

নারায়ণ দেবনাথ

এই আমার একেবারে হালফিলের আবিষ্কার, খাঁদা। এটা একটা বৈদ্যুতিক পাপোশ।
উরিব্বাস! এরপর এটার কি করবে দাদু?

এটা লোকের জুতোর সমস্ত ধূলো ময়লা ঝেড়ে ফেলে দেবে। লক্ষ্য কর!

হোঃ হোঃ! একটু সুড়সুড়ি লাগছে। আর এছাড়া মনে হয় সবই ঠিকঠাক কাজ করছে!

এটা দরজার বাইরে রাখ, খাঁদু। তারপর আমরা লক্ষ্য করবো যে, যখনই যারা ওটার ওপর দাঁড়াবে তখন ওটা কি রকম কাজ করে।

হেঃ হেঃ! বেচারা দাদু ধারনা করতে পারবে না এটা দিয়ে আমি কি ঝামেলা পাকাতে পারি!

এটার ঝাঁকুনি দেবার ক্ষমতা যতটা আছে বাড়িয়ে দি!
অ্যাই!

ওরে বাবা! আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি!

এর জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এর জন্যে দায়ী দাদুর এই নয়া আবিষ্কার।
আজ দু বোতল দুধ খাঁদু? ...অ্যাই!
ঝাঁকুনি থামাতে পারছি না। ওপস! দুধের বোতল সব গেলো!
বাপস! ওটা আমাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছে!
দুঃখিত মশাইরা! আমার দাদুর এই পাপোশের মধ্যে নির্ঘাত কোন গলদ আছে!
হাঃ হাঃ! এবার জঞ্জাল ফেলনেওয়ালা বাকী!
এই যে এসে গেছে, এখন আমি শুধু বোতাম টিপে চালু করবো!
ইরক! ভেবেছিলাম পাপোশটা জঞ্জাল ফেলা লোকটার ওপর জঞ্জালের জায়গাটা ছুঁড়ে দেবে!
বেশ, বেশ! পাপোশের ব্যাপারটা ভালোভাবেই দেখছি শেষ হয়েছে। এরপর এটা নিয়ে আর কাউকে ও ক্লেশ দেবে না।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
এইমাত্র আমরা খেঁদোর বাইকটা শেষ করলাম— ইয়ে—ঠিকঠাক করে রাখলাম। ঐ যে ও আসছে!
আড়ালে থাক!
প্যাডেলে দ্রুত পা চালিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাই!
গেছি রে! আমার গাড়ি যে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো!
হাঃ হাঃ! আমরা তোকে কেমন ভেল্কি দেখিয়েছি, খাঁদা। কয়েকটা নাট বল্টু খুলে কেমন দুর্দান্ত মজা পাওয়া গেলো!
ওওঃ! এটা তাহলে তোদের কাজ!
গরর! আমি এর পাল্টা নেবো, দেখে নিস!
তুই আমাদের এ জিনিস করতেই পারবি না। আমাদের বাইক বছরের ওপর খারাপ হয়ে পড়ে আছে!
দেখি যদি দাদু এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারে যেটা আমি ওদের ওপর প্রয়োগ করতে পারি।
এক জোড়া পাজি ছেলের সঙ্গে মোকাবিলা করবি, খাঁদু? ঠিক আছে, এবার...
একটা অটোমেটিক বক্সিং গ্লাভ, কেমন মনে হচ্ছে?
আরিব্বাস!
— অথবা একটা ইলেকট্রনিক তীর?
বাপ রে!
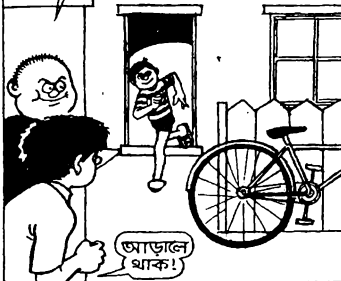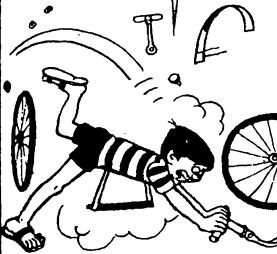
এই যে কি ভাবে এটা কাজ করে. লক্ষ্য কর!
গেছি রে!
যদি পাবি তবে আমি দুটোই ওদের ওপর ব্যবহার করবো! হিঃ হিঃ!
এই! তুই এটা কখনো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু একটা তীর সোজা তোর পাছার একেবারে কাছাকাছি এসে গ্যাছে!
এঃ! বোকার মতো কথা বলিস না!
ওয়াহ! আরঘ! আঁউফ!
এটা আমাদের খোঁচা মারছে। ইয়াও!
হিঃ হিঃ! কোনাটা পেরিয়ে আসার শুধু অপেক্ষা!
আঃহা! এই যে তোরা! এবার কিছু আসলি মজা — আর পাল্টা গুঁতো!
ইয়্যাগহ!
ওফস!
ওঃ, চমৎকার! কি দারুণ গুঁতোই না দিয়েছে দুটোকে! আর ওরা পেছনে লাগবে না। দাদুর আবিষ্কারের তুলনা নেই।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

উদ্যান বিভাগের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী আমার ভ্যাকুয়াম ক্লীনার পরীক্ষা করে দেখার জন্যে তৈরী।
উদ্যানের জন্যে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার! অদ্ভুত! এটা একেবারে নতুন, দাদু!

দ্যাখ, খাঁদু। এটা সব জঞ্জাল টেনে নিচ্ছে, তারপর বাক্সটায় ফেলে দিচ্ছে ও থেকে দরকারী কাগজ হারিয়ে যাওয়া চিঠিপত্র বাছাই করে নেবার জন্যে। তুই যদি ইচ্ছে করিস তবে উদ্যানরক্ষককে দেখাবার জন্যে এটা নিয়ে যেতে পারিস।

হাঃ হাঃ! দ্যাখ, খেঁকোটা বাগানে ঝাড়ুদারের কাজ করছে!
এই রে! সেই মারকুট্টে পাজীদুটো।

ঝাড়ুদার, এঃ! আমি ওদের দেখাচ্ছি। এর বাঁকানো পাইপটা খুলে নিয়ে ওদেরও ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি...

হিঃ হিঃ! আমি ঝাড়ুদার নই, হতচ্ছাড়ারা – কিন্তু এই যন্ত্রটা যেমন জঞ্জাল টেনে নেয় তেমনি জোরে ছুঁড়তেও পারে!
আগহ!

ওদের সাড় ফিরে আসার আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ি।

ঐ যে, খাঁদা! চল এবার ওকে পাকড়াও করে চাঁদা করে ধুসে দি।
অ্যাই মরেছে!

ওদের দিকে ছোঁড়ার জন্যে এখানে প্রচুর কাঁকর আর ইঁটের টুকরো আছে।
ওফ্!

হ্যাঃ হ্যাঃ! ওরা নিজেদের সাফাই করুক ততক্ষণ আমি এখানে নিরাপদ।

কিন্তু, উদ্যানরক্ষক কোথায় গেলো আশ্চর্য!

ভেবেছিলি ফাঁকি দিবি? কিন্তু এবার ধরেছি!
আরগহ্!

এবার আমরা পাল্টা শোধ নেবো। আমি সুইচ টেপার আগে ওর পেছন থেকে সরে যা, গুল্লু!
ওহ্, না! ওরা গলফ বলের গুলি মেরে আমার খুলি ওড়াতে চাইছে!

ওরে গেছি রে! মলুম রে!
ওরে বাবা! এতো উদ্যানরক্ষক! একেবারে সোজা ফায়ারিং লাইনের মধ্যে এসে পড়েছে!

যন্ত্রটার আবার কি হলো?
তুমি ওটাকে জ্যাম করে দিয়েছো!
গর্‌র্‌! এবারে যে কাজের জন্যে যন্ত্রটা চেয়েছিলাম সেই কাজ তোমাদের করতে হবে!

তোমরা ঐ ডোবাটার পাঁক পরিষ্কার করো! নাও শুরু করে দাও!
হিঃ হিঃ!
ইস! কি চটচটে কাদা রে।
হুঁঃ! আর কি বিচ্ছিরি গন্ধ!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
মনেহয় আমি এটা করেছি! মনে হচ্ছে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার যে ধরণের তরল জিনিস চায় তা আমি আবিষ্কার করেছি, যে জিনিস চোরকে থামাবে!
চোর থামাবে? এটা কি ভাবে কাজ করবে?
আমি এটার নাম দিচ্ছি পাঁকাল স্প্রে। ভেবে নে তুই একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত এবং চেষ্টা করবি এই টাকা তুলে নিতে!
ঠিক আছে, দাদু!
ওহ্! কাজ হচ্ছে! পদার্থটা এতো পিচ্ছিল যে টাকা ধরতেই পারছিনা ওপ্‌স্!
যদি সব ব্যাঙ্কে এই জিনিস কিছু থাকে, তবে টাকা ছিনতাই খুবই শক্ত হবে!
হাঃ হাঃ! দাদু এটা আমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে বলেছে। আমি নিয়ে যাবো, কিন্তু যাবার পথে এটা দিয়ে অনেক মজা করবো!
উদাহরণ স্বরূপ এই মজাটা দেখা যাবে!
কি হাল্কা সট! আমি এটা সহজেই বাঁচিয়ে দেবো!
ইয়ো! আমি এটাকে ধরতে পারছি না! এটা বড্ড হড়হড়ে!
গরর! তুই আমাকে গোলটা বাঁচাতে দিলি না, খ্যাঁদা! ধরলে তোর নাকে র‍্যাদা ঘসে দেবো।
হেঃ হেঃ! চেষ্টা কর না!
তোর হাত এতো পিচ্ছিল যে, তুই আমার গায়ে হাত রাখতেই পারবি না!
ইয়োফ্‌!
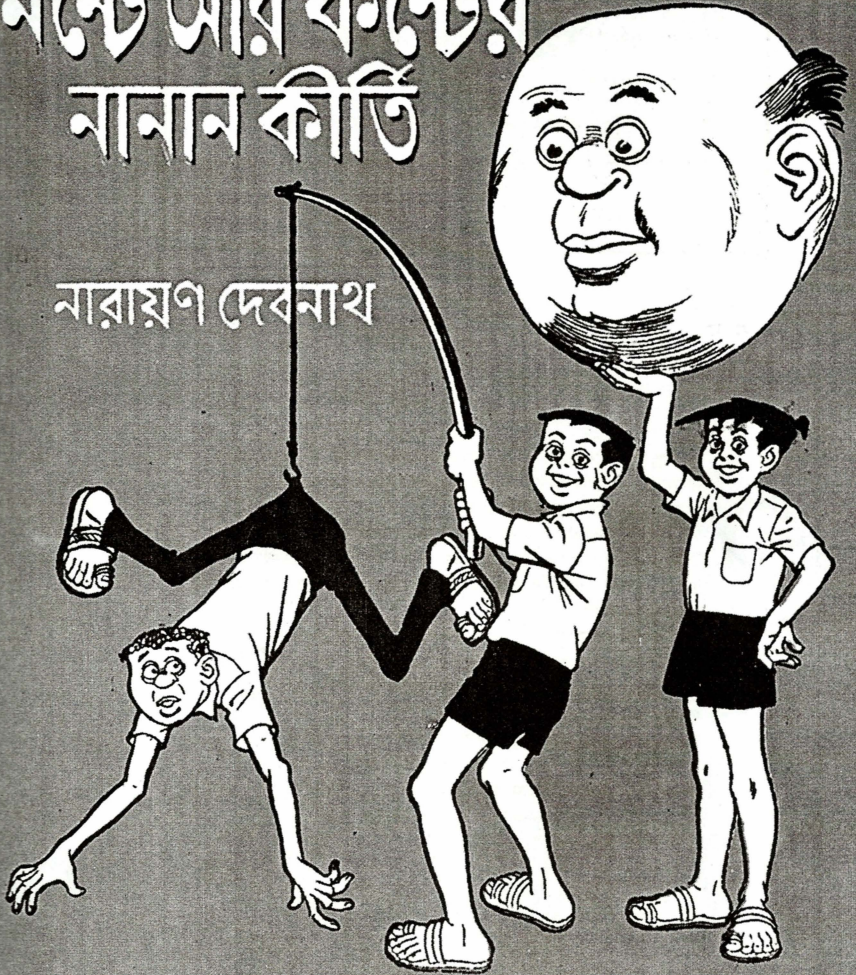
পার্কে
ছেলেরা আর মেয়েরা—এবার স্বাগত জানাচ্ছি ভেল্কিবাজ উঁকুরামকে!
হেঃ হেঃ! আমি ভেল্কির ওপর ভেল্কি দেখাবো!
এবার এটা দ্যাখো!
ওপস! আমি আর ওদের ধরে রাখতে পারছি না!
গরর! প্রদর্শনীটা নষ্ট করে দিলো! ধরো ওকে!
পিছনে ধাওয়া করো!
ওফ্!
ঝট করে এটা জমিতে ছিটকে দিলে ওরা ডিগবাজী খাবে আর আমি হাওয়া!
বিজ্ঞানী দাদুর কাছ থেকে আমার এই সেই উপাদান। আমি আপনাকে দেখাবো কি ভাবে এটা কাজ করে...
আরেঃ! আমি টাকাগুলি ধরতেই পারছি না!
মরেছে! এই রকম হাত নিয়ে তুমি এমন এখানে আটকেছো। পুরো দিনটা বিশ্রাম নাও।
তুমি আমাকে একটা দিনের ছুটি পাইয়ে দিয়েছো, বাঁটুল! এসো তোমাকে আমি আইসক্রীম কিনে দেবো!
ওহ্ দারুণ!
আঃ হা। এই লম্বা চামচটা দিয়ে আমি এটা খাবো!
আফসুস! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, এ পিচ্ছিল উপাদানটা আমার হাতে এখনো লেগে আছে!
হাঃ হাঃ! আইসক্রীম এবার হাত ছাড়াই মুখে ঢুকতে চাইছে।

ক.স.II - ২১

নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট মূল প্রচ্ছদ।

কিশোর ভারতীর সম্পাদকের জন্য এও হাঁদা-ভোঁদার
আদলে ছেলেদের মধ্যে অন্য এক চিত্রকাহিনী। তাও
আগে শুরু হয়েছিলো অন্য নামে ম্যাগাজিনে ওদের
পাটল চাঁদ দত্ত মহাশয়ের পরে ওটা বন্ধ দিয়ে
শুরু হয়েছিলো যা এখনো চলছে নন্টে আর ফন্টে।
নারায়ণ দেবনাথ

দুই বন্ধু স্কুল বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনা করে। দুজনে দুজনকে অসম্ভব ভালোবাসে। ছোটো-বড়ো, সুখ-দুঃখ, পুরস্কার-শাস্তি, আনন্দ-যন্ত্রণা সবসময়ে তারা ভাগ করে নেয়। নন্টে আর ফন্টে।

চার দশকের বেশি কাল ধরে নন্টে আর ফন্টে বাংলা কমিক্স জগতে স্বমহিমায় উপস্থিত। কিশোর মনের কতরকম চাওয়া-পাওয়া, ভালো-মন্দ, খুঁটিনাটি নিয়ে নারায়ণ দেবনাথ ভরিয়ে দিয়েছেন বাংলা কিশোর সাহিত্যেকে। নন্টে আর ফন্টে তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

নন্টে ফন্টের বোর্ডিংয়ে একটু বড়ো কেল্টুদা, বোর্ডিংয়ের সুপারকে তোয়াজ করতেই ব্যস্ত সে। শুধুই নন্টে আর ফন্টেকে বিপদে ফেলতে চায় কিন্তু প্রতিবারেই নন্টে-ফন্টের বিচক্ষণতায়, কর্মক্ষমতায় আর সততার উত্তাপে পরাস্ত হয় সে।

নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টির মাধুর্যে নন্টে আর ফন্টে অমরত্ব পেয়েছে। পড়ার বই ফেলে যদি কেউ এই কমিক্স পড়ে তবে সেও 'সত্যনিষ্ঠা'-র অমৃত অজান্তেই পান করে বসবে, এতে আর আশ্চর্য কী! আশা রাখতে দোষ নেই যে সেই অমৃত ধারা সারাবাংলার অমৃতের সন্তানেরা পান করার সুযোগ পাবে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে, চল্ গোবরবাবুর পুকুরে গিয়ে মাছ ধরি।
কিন্তু পুকুরে পাহারা থাকে যে রে!
চারদিকে নজর রেখে বসতে হবে ফন্টে!
হ্যাঁ, ধরতে পারলেই কেলেঙ্কারি!
অ্যাই, তোরা কে র‍্যা? ওখানে কি হচ্ছে?
দৌড়ো নন্টে! পাহারাদার আসছে। মাত্র একটা ধরেছিলাম রে!
ওঃ, প্রায় ধরে ফেলেছিলো রে মাইরি!
আমরা কে সেটা ঠিক বুঝতে পারে নি!
বোম্বেটেরা মাছ ফেলেই পাইলেছে! মনে লিচ্ছে, এরা বোর্ডিংএর ছোঁড়া! এটা লিয়ে গিয়ে বাবুকে সব জানাই।
আমি গোবরবাবুকে বলেছি, এই বোর্ডিংএর কেউ ওঁর পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এবার নন্টে আর ফন্টেকে ভালো রকম জব্দ করছি...

এই যে, ঠাকুর ওর পোষা বেড়ালের জন্যে মাছ লুকিয়ে রেখেছে। এইটা দিয়েই কাজ হাসিল করবো।
?
রান্নাঘর
স্যার আপনি যদি এখনি নন্টে আর ফন্টের ঘরে যান, তাহলে ওরাই যে মাছ ধরেছিলো তার প্রমাণ পাবেন।
ঠাকুরের বেড়ালটা আমাদের ঘরে যে রে!
খাটের নীচে ও ওটা কিসের থলে নিয়ে টানাটানি করছে বল্ তো?
থলের ভেতরে মাছ যে রে!
হতভাগাটা বোধহয় কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে বসে খ্যাটাবার তালে ছিলো।
যেখান থেকেই আনুক বড় গন্ধ ছাড়ছে। জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দি!
ওঁফ্!

উফ! অ্যাই হতচ্ছাড়া, কাঁধ থেকে নখ সরা শিগগির!
হিঃ হিঃ! স্যার বেড়ালের পেছনে কি রকম ছুটেছে দ্যাখ্‌।
ফন্টে, এখন মনে হচ্ছে কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে ইচ্ছে করেই আমাদের ঘরে মাছ রেখে এসেছে এবং আমি অনুমান করেছি কে করেছে!
আমরাও কামারের এক ঘা লাগাচ্ছি।
কাজ সারা ফন্টে। স্যারের মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেছি। এবার চল্।
কেউ দেখেনি তো?
না।
গোবরবাবুর পুকুরে আর যখন মাছ ধরা যাবেই না; তখন ছিপটা যত্ন করে রেখে দি। কি বলিস ফন্টে?
সেই ভালো নন্টে!
হুঁ, রাখাচ্ছি।
এবার নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, স্যার ওকে দেখেছে।
শব্দ কিসের? আরে একি! কেল্টু! এই তাহলে আসল ঘুঘু! শয়তানটা বোধহয় আবার ঐ পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে।

গিয়ে দেখি কি করছে। তারপর একেবারে হাতে নাতে ধরবো।
স্যার নির্ঘাত পুকুরের দিকে গেলো। জাল যা পেতেছি নন্টে আর ফন্টে ধরা পড়লো বলে। হিঃ হিঃ হিঃ!
ওহ্, কি সাংঘাতিক! এটা তো আমার মাছ ধরার ছিপ!
ছিপটা তুলে নি—আরে আরে, একটা মাছ দেখছি বঁড়শী গিলেছে তাই এতো ভারী লেগেছে।
বোর্ডিংএর এক জনকে একেবারে হাতে নাতে ধরেছি বাবু!
হেঁ হেঁ স্যার! নন্টে আর ফন্টের ছিপ পুকুরধারে পেয়েছেন তো? শুনলুম, কে নাকি ধরাও পড়েছে!
হিঃ হিঃ, স্যার এখন একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার! কি বলিস নন্টে?
ওঃ! মরে গেলে আর বাঁচবো না স্যার! ওরে বাবারে!
সেই অঙ্গারের ছ্যাঁকা এখন কেল্টো সর্বাঙ্গে টের পাচ্ছে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল বোর্ডিংএ দুপুরে খাওয়ার সময়।
এইটুকু তরকারি! এ দিয়ে খাওয়া যায়? আর একটু দিয়ে যাও ঠাকুর!
তরকারি-উরকারি আওর কুছু নাই, সব খতম! যা সওদা হোবে ওহি তো রান্না হোবে।

রোজ এরকম ভালো লাগে না! চল্ স্যরকে গিয়ে বলি।
ওরে বাবা! তোরা যা, আমি এর মধ্যে নেই।
ঠিক আছে! আমরাই যাবো, ভীতু কোথাকার!

স্যরের ঘরে।
তোরা এখানে কেন? কি চাই?
স্যর, ঠাকুর ভীষণ খাবার কম দেয়। ভাতে তরকারি দেয় এইটুকু!
উরি ব্বাস!

অল্প আহার শরীর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো বুঝেছো? এবারে যাও, গুরুজনের খাওয়ার সময় সামনে থাকতে নেই!

কম খাওয়ার উপদেশ! দ্যাখ্‌না, কি রকম জব্দ করি! তুই আমাকে শুধু হেল্প করবি।
সে আর বলতে হবে না দোস্ত!

পরদিন দুপুরে
ঠাকুর, তোমার রান্না সত্যি খুব চমৎকার! আর তুমি তো বেশ বেশীই দাও! তবু ফন্টেটা খালি মিছিমিছি তোমার পেছনে লাগে।
নন্টুয়া তু খুব ভালো আছিস! ফন্টুয়া বহুত বদমাস!
রান্নাঘর

দু মিনিটের মধ্যেই ফন্টে রান্নাঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলো।

ঘন্টাখানেক পরে খাওয়ার সময়।
অ্যাঁ্যাঃ!

ঠাকুর! ঠাকুর!

সব নুনে পুড়িয়েছিস?
নিমক! কৈসে হইলন বাবু?
তা আমি কি করে জানবো! যা রাবড়ির বাটিটা নিয়ে আয়!

ওয়াক!
ফিন নিমক!

হতভাগা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

কেমন দাওয়াই হয়েছে বল্ তো নন্টে?
দারুণ! দারুণ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

ব্যস, এখানে লাগালেই সবার নজরে পড়বে।
একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান
বাঁশী ও সেতার
শিল্পী
কেল্টুকুমার
স্থান
স্কুল মঞ্চ

কি ব্যাপার রে ফন্টে! কেল্টো বাজাবে বাঁশী আর সেতার?
একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান
বাঁশী ও সেতার
শিল্পী
কেল্টুকুমার
স্থান
স্কুল মঞ্চ
তাইতো! ও এসব চর্চা করলো কবে!

কি কাণ্ড কেল্টুদা? যদ্দূর জানি তুমি ওসব বাজানো দূরের কথা ছুঁয়েও দেখোনি। সেই তুমি ওসব বাজাবে!
শ্রোতারা তোমাকে ইয়ে করে কেস্টো-ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র দেখিয়ে দেবে যে!

তুই থাম দিকি ফন্টে! বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বাঁশী আর সেতার বাজিয়ে শ্রোতাদের আমরা মোহিত করে দেবো!

সে কি কেল্টুদা! আমরা মানে? বাজাবে তো তুমি!
ঠিক কথা, কিন্তু বাইরে বাজাবো আমি, ভেতরে তোরা!
তার মানে?

মানে- সিনেমায় দেখেছিস তো কেমন একের গান অন্যের গলায় চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই রকম আমি স্টেজে বসে বাঁশী বা সেতার বাজাবো, আর ফন্টে পর্দার আড়ালে ঠিক আমার পেছনে থাকবে রেকর্ড-প্লেয়ার আর বাঁশী, সেতারের রেকর্ড নিয়ে,-

– তারপর আমি কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওকে সঙ্কেত করবো, সেতার হলে একবার, বাঁশী হলে দুবার। আর ও সেই মতো সেতার বা বাঁশীর রেকর্ড চালিয়ে দেবে আর আমি বাইরে বাঁশী বা সেতার বাজাবার অ্যাক্‌টিং করবো। কেউ বুঝতেই পারবে না। আর নন্টে বাইরে থাকবি কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে।
দারুণ আইডিয়া খাঁটিয়েছো তো!
সেইমতো অনুষ্ঠানের দিন
সঙ্গীতের ওপর স্যারের ষাট মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শুরু হচ্ছে বাঁশী ও সেতারের একক অনুষ্ঠান। শিল্পী কেল্টুকুমার! প্রথমে বাঁশী।
আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রথমে বাঁশী শুরু করছি।
ওদিকে ফন্টে
ফোঁরর ফোঁৎ! ফোঁরর ফোঁৎ!
এই রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা গুঁতো, তার মানে সেতার।
পিড়িং! পিড়িং! প্যাং! পিড়িং!
হিঃ হিঃ! কেল্টুকুমার বাঁশী দিয়ে সেতার বাজাচ্ছে রে!
হাঃ হাঃ! সেতার দিয়ে তারপর বাঁশী বাজবে!
হোঃ হোঃ!
হাঃ হাঃ!
সঙ্গীতে ম্যাজিক দেখানোর জন্যে আমার অভিনন্দন!
আমরাও একে একে জানাচ্ছি।
হাঃ হাঃ!
হোঃ হোঃ!
বেচারা কেল্টোকে এভাবে ডোবানো উচিত হয়নি ফন্টে!
স্যারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েই তো এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো মাইরি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

আমাকে একটা কলা দাও না গো নেংলু কা!

আবদার! কলা খাবে! আমি এটা হাটে বেচে টু পাইস আনতে যাচ্ছি!

একটু পরে

উঁ উঁ!

!

?

কাঁদছিস কেন রে হুলো?

দেখো না নন্টেদা! নেংলু কা এক কাঁদি কলা নিয়ে হাটে বেচতে যাচ্ছিলো, একটা কলা চাইলাম দিলো না— কত কি সব বললো। উঁ উঁ উঁ!

কি চামার রে নেংলুকাটা! হুলোকে একটা কলা দিতে পারলো না? চল্‌তো দেখি নন্টে!

কাঁদিস নে হুলো, ঐ কলাই তোকে এনে আমি খাওয়াবো!

কিছু পরে

ঐ যে নেংলু কা বসে আছে কলা নিয়ে। তুই চট্ করে লম্বা দেখে দড়ি নিয়ে আয় ফন্টে, তারপর দ্যাখ কি মজা করি!

রেডি থাকিস ফন্টে! এবারে অ্যাকশান শুরু হবে!
ঠিক আছে ব্রাদার!

নৌকো মাঝ নদীতে যেতেই
হেইয়োঁ!

ঝপাস!

হায় হায়, আমার কলা — আমার কলা জলে ডাইভ মেরে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে!

এই নেরে হুলো! কতো কলা খাবি খা!
উরি ব্বাস নন্টেদা ফন্টেদা একেবারে কাঁদি শুদ্ধু নিয়ে এসেছো!

এর জন্যে হয়তো ঠেঙানি খেতে হবে, তা হোক তবু তো মা বাপ হারানো ছেলেটার মুখে হাসি ফুটেছে, কি বলিস ফন্টে?
সে কথা আর বলতে!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

পরশু স্যারের জন্মদিন। তোরা এবারে স্যারকে কি প্রেজেন্ট করছিস?
আমরা দুজনে ওঁকে এবার একটা ফ্লাওয়ার ভাস দেবো। তোমাকে দেখাচ্ছি।

এই দ্যাখো কেল্টুদা। কাল আমি আর ফন্টে কিনে এনেছি। তুমি কি জিনিস দিচ্ছো?

আমি? আমি নিজের হাতে স্যারের একটা প্রতিকৃতি এঁকে উপহার দিচ্ছি।
তুমি নিজে এঁকেছো? বলো কি!

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, সামান্য একটু বাকী আছে, করে কাল তোদের দেখাবো। কিন্তু তোদের ঐ ঠুনকো জিনিস সাবধানে রাখিস। বলা যায় না— টুক করে ভেঙে গেলেই মুস্কিল।

একটু পরে
কেল্টো ঘরে নেই। চল; চুপি চুপি গিয়ে সত্যি এঁকেছে, না তাপ্পি ঝেড়েছে দেখি আসি।
যা ভেবেছি। আমিও এই তালে হাতের টিপটা পরীক্ষা করি।

কৈ রে ফন্টে, কেল্টু অঙ্কিত স্যারের প্রতিকৃতি কৈ?
ঝনন্!
নন্টে, আমাদের ঘরের দিকে যেন কিছু ভাঙার শব্দ হলো!

এ নির্ঘাত কেল্টুর কাজ। ইস! না খেয়ে টিফিনের পয়সা জমিয়ে কেনা।
স্যারের কাছে আমাদের অপদস্থ করার মতলব। আচ্ছা ঠিক আছে!
পরদিন বিকেলে
মন্টে আর ফন্টে! স্যারের প্রতিকৃতি কেমন এঁকেছি দেখবি চল।
দ্যাখ্‌!
স্যারের কাছে বাহবা পাবার জন্যে বাইরে করিয়ে রাতা রাতি এনে সাজিয়ে রেখে নিজের বলে চালাচ্ছে।
কাল স্যারকে দেখিয়ে ফিনিশিং টাচ দিয়ে পরে স্যারের হাতে দেবো।
পরদিন
তোর যে প্রতিকৃতি আঁকার গুণ আছে তা তো জানা ছিলো না রে কেল্টু! দেখি কেমন আমাকে এঁকেছিস।
!
কি হয়েছে স্যার? পছন্দ হয়নি — ইক্‌!
বলছিস কি হয়েছে! আমার সঙ্গে রসিকতা!
বিশ্বাস করুন স্যার, এ জিনিস ছিলো না। আমি বুঝতে পারছি না ওটা কি করে হোলো!
হতভাগা মর্কট! এই বললি আমার ছবি থেকে কি এঁকেছিস, আর এখন নিজেই বুঝতে পারছিস না। একবার ধরতে পারলে বুঝিয়ে দিচ্ছি!
স্যার কেন হঠাৎ কেল্টুর ওপর খাপ্পা হয়ে গেলেন খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পাঠকদের সে কৌতূহল মেটাচ্ছি, কিন্তু কি করে ওটা গজালো সেটা জানতে না চাইলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিরে, তোরা খুব ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে যেন?
হ্যাঁ কেল্টুদা! এবারে কালীপূজোয় তুবড়ি না করে রংমশাল আর হাত পটকা বানাবো।
রং মশাল বানাবি তোরা? হিঃ হিঃ! রং বাদ দিয়ে শুধু মশাল বল!
সে যখন হবে দেখতে পাবে। বাজির কারখানায় কাজ করে একজন এই ফর্মূলা দিয়েছে। কত রকম রঙের ফুলকি হবে রংমশালের।
দূর দূর! ওতো মামুলি জিনিস। আমার কাছে যা ফর্মূলা আছে সে ফর্মূলায় বানালে রংমশাল থেকে রামধনুর রং ফুটে বেরুবে!
বলো কি কেল্টুদা! তুমি ঐ জিনিস বানাচ্ছো নাকি?
বানাচ্ছি বৈকি। দেখবি রংমশাল কাকে বলে। যেমন নাম কাজেও তেমনি।
ওঃ, আমাদেরটা তাহলে একদম বাজে হয়ে যাবে।
তা অবশ্য যাবে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? সবাই কি আর ভালো পারে!
শোন ফন্টে! আমরা শুধু হাত পটকার মশলা তৈরি করবো আর রংমশাল কেল্টোর তৈরি মশলা হাত সাফাই করে হবে।
খাসা মতলব করেছিস নন্টে! তক্কে তক্কে থাকতে হবে।
ওদিকে
হিঃ হিঃ! নিজে আমি কিছুই করছি না। ভাল মতো ওদের রংমশালের মশলা হাতিয়ে রংমশাল বানাবো।

ওখানেই কাগজে মুড়ে রেখে দে ফন্টে! কাল তৈরি করা যাবে। এবার চল ওদিকটার খোঁজ নি।
এই মওকা। ওরা বেরোলেই ওর থেকে কিছু মশলা সরিয়ে ফেলবো!
কাজ হাসিল। এবারে এ ঘর থেকে সরে পড়ি।
ওদিকে
কইরে, কোথাও তো পেলুম না। কেল্টোটা কোথায় রেখেছে বলতো?
বুঝতে পারছি না। এই পালিয়ে চল, কেল্টো আসছে বোধ হয়।
পরদিন সন্ধ্যায়
একটা তৈরি হয়েছে। প্রথমটা স্যারকে দিয়ে জ্বালাই। স্যার খুব খুশি হবে!
ঠিক আছে। বলছিস যখন তখন একটা জ্বালাই। কেমন জিনিস করেছিস?
দারুণ জিনিস স্যার! এখনি বুঝতে পারবেন!
স্‌স্‌স্‌
দুড়ুম!
হতচ্ছাড়া মর্কটটা গেলো কোথায়?
ঐ দিকে ছুটে বেরিয়ে গেলো স্যার!
হতভাগা কেল্টো আমাদের হাতপটকার মশলা দিয়ে রংমশাল বানিয়ে স্যারকে দিয়ে জ্বালিয়েছে। আর তাতেই এই বিপত্তি!
যা বলেছিস। বাজী দিয়ে বাজিমাৎ এর বদলে একেবারে বাজিকাত!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিরে, তোদের পুঁটে মামা নাকি বাজী ধরে একটা প— বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে শেষে ভূতের ভয়ে পালিয়ে এসেছে?

কেন তোমার ভূতের ভয় নেই?
হাঃ হাঃ হাঃ! ভূতের ভয়? এই শর্মার? অনেকদিন পর প্রাণ খুলিয়ে হাসালি।

ভূতের ভয়ে তোদের পুঁটেমামা পালাবে। আমার সামনে ভূত এলে তার ঘাড়ে এমন রদ্দা ঝাড়বো যে, বাছাধন টের পাবে কার পাল্লায় পড়েছি।

তুমি পারো রাতের বেলায় একলা একটা পোড়োবাড়িতে রাত কাটাতে?
আলবৎ! এখানে একটা পোড়োবাড়ি-টারি থাকলে তোদের দেখিয়ে দিতুম।

সত্যি কেল্টুদা, তোমার হার্টে, মানে হৃদয়ে কি দুর্জয় সাহস!
এই জানবি। এ তোদের ঐ পুঁটেমামার পুঁটিমাছের হার্ট নয়।

দাঁড়া, দেখবো কেল্টোর সাহসের কেরামতি। কানে কানে বলি শোন।
ওঃ, দারুণ হবে মাইরি!

সেদিন রাত্রে
কেল্টো বোধহয় এখনো খাবার ঘরে সাঁটাচ্ছে।
ঠিক আছে। চল এবারে সরে পড়ি।

একটু পরে
ঠাকুরকে ম্যানেজ করে খাওয়াটা আজ ভালোই জমেছিলো। এবারে জল খেয়ে জোর ঘুম লাগাই।

একঘন্টা পরে
ফরর ফোঁৎ!
ফরর ফোঁৎ!
আ-আঃ! কি হচ্ছে রে নন্টে ফন্টে? ঘুমোতে দে
খড়রর!
খড়রর!

খড়রর! খড়রর!
দিলি তোরা ঘুমটা নষ্ট করে। ভেবেছিস ঘরে লুকিয়ে থেকে শব্দ করে আমাকে ভয় পাওয়াবি। কিন্তু অতো সহজে আমাকে ভয়— কি-কিন্তু ওটা কি ঘুরছে ঘরময়!

ও-রে-বা-বা! ভূউউত! দরজাটা কোনদিকে?
খড়রর! খড়রর!

বাবাগো, ভূতে আমার ঘাড় মটকালো গো!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
-চিক্!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো যাচ্ছে রে নন্টে ! ও কেল্টুদা, দেখো আমরা কেমন মজা করে যাচ্ছি ।
অ্যাই থাম্ !
তোমার জন্যে আমরা জখম হতে বসেছিলাম ।
কিন্তু তোরা যা করছিলি তা বড়ই সাংঘাতিক।
প্রমাণ করো ।
হ্যাঁ, যা বলছো তা আমাদের দেখাও ।
বেশ দেখাচ্ছি
জল
তোরা দ্যাখ যে, এটা কি রকম বিপজ্জনক ।
বেশ মজাদার ! কিন্তু কিছু বোঝাতে পারলে না ।
জল

আচ্ছা বেশ, আবার দেখাচ্ছি।
ওফ্স্!
আলু চোরি, আঁ? আবে বদমাস ছোঁড়া!
এখনো কিন্তু ঠিক বুঝিনি কেল্টুদা!
সুতরাং কেল্টুকে আবার চেষ্টা করতে হলো।
অ্যাই মরেচে!
সত্যি কেল্টুদা, লরির পেছনে চড়া দেখেছি খুবই বিপজ্জনক!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

সেদিন কেল্টো মিথ্যে নালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি ঠ্যাঙানিই না খাওয়ালে! আজ ওকে হাতে পেয়েছি সেদিনের শোধ তুলবো।
স্যারের প্রশ্রয়ে ওর বড্ড বাড় বেড়েছে!

ফন্টেটা আমাকে মারবার তালে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।

কারা যেন মারামারি করছে বলে মনে হচ্ছে!

ফন্টে, কেল্টু! এখুনি এসব থামা। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আয়!

বাইরে দাঁড়া, ফন্টে, আমি আগে কেল্টুকে শাস্তি দেবো।

আমি বালিশে মারছি, তুই খুব ট্যাঁচা!
ওউফ! আউফ!
সপাং! সপাং!

?

এসে গেছিস নন্টে? শাস্তির ব্যাপারে চালাকি হচ্ছে রে মাইরি! এবার সব চালাকি ভাঙছি। তোকে যা বলবো সেই মতো কাজ করবি।
যেমনটি বলবি ঠিক তেমনটি কাজ হবে।

এবার ঘরে যা কেল্টু! এই শিক্ষা মনে থাকে যেন। এবার তোর পালা ফন্টে!
ওওওও! উঃ! আঃ!

নিচু হ ফন্টে!... ওঃ, বিরক্তিকর। টেলিফোন করার আর সময় পেলো না।
ক্র্যারর-ক্র্যারর!

হ্যালো! অ্যাঁ? কি? কোথায়? আমার গাড়িটা পুকুরে পড়ে গেছে? কি করে পড়লো?...জানিস না... আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি!

গাড়িটার বোধ হয় ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে স্যার। তাই গড়িয়ে পুকুরে চলে গেছে।
গর্দভ কোথাকার! এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য ছেলেদের নিয়ে গাড়িটা পুকুর থেকে টেনে তোল্ না নন্টে!

টান, আরো বেশ জোরে টান লাগা।
কিছুই হচ্ছে না স্যার! পুকুরের পাড়টা বড্ড পেছল, পা রাখা যাচ্ছে না।
এই যে স্যার! আমি শাস্তির জন্যে এখানে অপেক্ষা না করলে আপনার গাড়িটা তুলতে আমার মোটেই বেশী সময় লাগতো না।
তোকে বিশ্বাস করি না, ফন্টে। কিন্তু পারলে তোকে ক্ষমা করে দেবো।
পিপ! 7
ঠিক আছে, আমি আসছি!
অবাক কাণ্ড! এতো দেখছি ট্যাকটর নিয়ে গাঁয়ের চাষী বোঁচাই সিঙ্গি! এ কোথা থেকে হাজির হলো?
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সমান জায়গায় তুলে দিচ্ছি, তোমরা একটা বড় পাথর গাড়ির সামনের দিকের চাকার কাছে রেখে দাও যাতে গাড়ি আবার গড়িয়ে না যায়।
হুম! শয়তানটা বোধহয় চালাকি করে শাস্তি এড়িয়ে গেলো। মনে হচ্ছে ওরই মতলবে গাড়িটা ঠেলে ফেলা হয়েছে আর বোঁচাই ট্যাকটর নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করেছে। কেল্টুকে বলে রাখি সবাই চলে গেলে গাড়ির ভেতরটা পরীক্ষা করতে।

একটু পরে…
অনেক ধন্যবাদ বোঁচাই দা! চলো তোমাকে একটু চা খাইয়ে দি!
স্যারের নির্দেশ. ওরা চলে গেলেই গাড়ির ভেতরে ঢুকে কি করে এটা ঘটলো তার হদিশ যদি কিছু পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।

হিঃ হিঃ! যা ভেবেছি যে কেলটো হতচ্ছাড়া গাড়ির ভেতরটা দেখতে ঢুকবে। এইবার ইঁদুরটাকে ফাঁদে পেয়েছি। পাথরটা ঠেলে সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা তো অকেজো করাই আছে…

ওরে বাবা! আবার কি হলো? গাড়ি যে আবার ঢালুপথে পুকুরের দিকে ছুটছে!

ঝপাস!

আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জানি না!
তাতে বয়ে গেলো। তোর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করবো তখন তোর অবস্থা আরো খারাপ হবে!

আফ! উফ্‌! বড্ড লাগছে যে স্যার!
লাগবেই তো চাঁদ! এবার বালিসের বদলে গায়ে পড়ছে যে।

নন্টে আর ফন্টে
ারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টে, (উলস্), স্যারের পার্টির জন্যে ইয়া বড় বড় সন্দেশ রসগোল্লা, দৈও আছে! আয় আমরা ওথেকে কিছু মাল সরিয়ে ফেলি।
এসব কি বলছো কেল্টুদা! জিনিসের ঘাটতি হলে স্যারের সম্মান হানি ঘটবে। এসব আমরা করতে পারবো না।
এসব করতে পারবো না, যেন কতো সাধু। তোরা তাহলে আমার সহযোগিতা করবি না?
না কেল্টুদা করবো না। বরঞ্চ তোমার মতলবের কথা স্যারের কাছে ফাঁস করে দেবো।
কি বললি? ভালো কথা বলতে গেলুম আর আমাকেই কিনা শাসানি? আচ্ছা এর ফল দেখেতে পাবি।
কেল্টোটা স্যারকে কি বলছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।
সার্শিটা বন্ধ বলে শব্দ বাইরে আসছে না।
তুই ঠিক বলছিস কেল্টু। যে, ওরা এই মতলব করেছে?
হ্যাঁ স্যার, আমি স্বকর্ণে শুনেছি। আপনি আচমকা ওদের ঘরে একসময় হানা দেবেন তখন দেখবেন।
নন্টে আর ফন্টের ঘরে
সাধু সাজার ফল এবার বেরিয়ে যাবে। এই পেয়েছি। এটা দিয়েই ওদের নোঙ্কম প্যাঁচে ফেলবো।
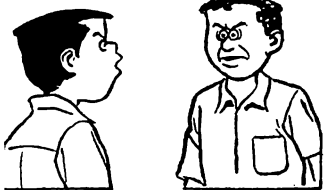
ওরা নেই। এই তালে এগুলো ওদের লকারে রেখে আসি। স্যার এসে যাতে দেখতে পায়।
সন্দেশ
ভাঁড়ারঘর
কিন্তু আগেই
মজার কাণ্ড! আমার জুতোর ওপর দৈ এলো কোত্থেকে? লকারটা খুলে দেখি তো!
আশ্চর্য! এসব এখানে এলো কি করে!
স্যার আসছেন নন্টে! রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে।
সন্দেশ
কার শয়তানি বুঝেছিস তো নন্টে?
একেবারে হাড়ে হাড়ে! এখন এগুলোকে চটপট লন্ড্রির ঝুড়িতে ময়লা কাপড়চোপড় দিয়ে ঢেকে বাইরে নিয়ে যাই।
উফ! দাঁড়া, নন্টে আর ফন্টে। তোদের লকার আমি পরীক্ষা করবো!
মজার ব্যাপার! এখানে কিছু তো লুকানো নেই। ঠিক আছে, এবার তোদের বিছানা পরীক্ষা করবো।

এবং
আঃহা! এই তো একটা সন্দেশ রয়েছে মনে হচ্ছে যেন?
না স্যার, ওটা সন্দেশ নয় শোনপাপড়ি। কয়েক দিন আগের কেনা।
চুরি যাওয়া সমস্ত মালটা ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত থাকলো। নন্টে আর ফন্টে, আমি আশা করবো বিকেলের আগে তোরা ওগুলো আমাকে ফেরৎ দিবি।
প্ল্যানটাকে হতভাগারা কাঁচিয়ে দিলে। এগুলো রেখে দিয়েছিলুম আয়েস করে সাঁটাবো বলে, কিন্তু এগুলো কাজে লাগাবার আরো একটা ভালো মতলব এসেছে।
সুপারিনটেণ্ডেন্ট
হিঃ হিঃ! এইবার বাছাধনদের সুন্দর আর সঠিক ভাবে ফাঁদে ফেলবার ব্যবস্থা করেছি!
ওফ্!
তুমি কালা নাকি কেল্টুদা? কোথায় যাচ্ছো দেখে যাচ্ছো না?
আমি ইচ্ছে করেই ধাক্কা লাগিয়েছি ফন্টে। ওর রুমালটা নেওয়ার জন্যে আর সেটা পেয়েছি!

একটু পরে
ইস্! কি সাংঘাতিক ব্যাপার!
এঃ! চেয়ারের নীচে রসগোল্লা রেখে গেছে!
নন্টে আর ফন্টে, এবার তোদের সাহস মাত্রা ছাড়িয়েছে দেখছি, পিঠ পেতে দাঁড়া, একটু নাড়া দিয়ে দি।
থামেন বাবু! নান্টু আউর ফান্টু বাবুকো ঠেঙাইবেন না। ওনারা মিঠাই চোরি কোরেন নাই!
যো মিঠাই লোপাট করিয়েছে, ওহি এই রুমালটো ফেলাইয়ে গিয়েছে!
আরে, এটা তো কেল্টুদার রুমাল!
বটে!
শুনেছিস ফন্টে, এবার শার্সি ভেদ করেই শব্দ আসছে!
এতো জোরে যে, এখন আবার তোর কথাই ভালো শুনতে পাচ্ছি না!
ওঃ! গেলুম! উঃ! আঃ! এবারে মরেই যাবো স্যার!

ধড়াম!

হরেকরকম মজার গল্প

শুঁটকি আর মুটকি (সাদা-কালো)— ১৯৬৪ সালে (১৩৭১) দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশ পায় শুঁটকি আর মুটকি নামে দুই মানিকজোড় ছোটো মেয়ের মজার কীর্তিকলাপ। দুই-তিন বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশের পর পত্রিকা দপ্তরে করা মেয়েমহলের আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

তিনকড়ির জাদুখড়ি (রঙিন)— শারদীয়া টগবগ-এ প্রকাশিত জাদু গল্পের কমিক্স।

মহাকাশের আজব দেশে (রঙিন)— ১৯৯৪ সালে (বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৪০১) শুকতারার প্রচ্ছদ কমিক্স হিসাবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান (সাদা-কালো এবং লাল-কালো)— ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে (১৩৭৬ কার্তিক) 'পত্রভারতী'র প্রকাশনায় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান। মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশের পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। পরবর্তীকালে যা পত্রভারতী-প্রকাশিত 'হরেকরকম' নামক কমিক্স সংগ্রহের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্থান পায় (১৯৮৪ সালে)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর প্রায় ১০ বছর পরে পক্ষিরাজ পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৯৭৮/১৩৮৫) অন্য চেহারায় কিন্তু একই নামে দু-রঙের কমিক্সে আত্মপ্রকাশ করে এই চরিত্রটি। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

বুদ্ধিমান কুকুর (সাদা-কালো)— বাহাদুর বেড়ালের পর আর একটি পশু নিয়ে কমিক্স, বর্তমানে বার্ষিক 'পত্রপাঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

ভাদ্র ১৩৭৩ ১৯৬৬

আষাঢ় ১৩৭৫ ১৯৬৮

তিনকড়ির
জাদুখড়ি

নারায়ণ দেবনাথ

একদিন-
এতো সকালে এখানে বসে তুমি কাঁদছো কেন, বাছা? তোমাকে কি কেউ মেরেছে?

কি হলো, কিছু বলছো না কেন? তোমার মুখটাও শুকনো, কি হয়েছে?
আমার মা আর ভাইয়েরা মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পেট ভরে খেতেও দিতো না, গেলো দুদিন একেবারেই খেতে দেয়নি।

তোমার মা কি তাহলে তোমার নিজের নয়?
না, আর সেইজন্যেই তো আমার এই অবস্থা। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।

ঠিক আছে, আমি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই নাও তোমার খাবার।
ওগুলি কি করে খাবো, ওতো খড়ি দিয়ে দেওয়ালে আঁকা।

আরে তুমি ওতে হাত দিয়েই দেখোনা।
আশ্চর্য! এতো সত্যিকারের আপেল, কলা!

তিনকড়ির জাদুখড়ি

তোমার তো খুব ক্ষিদে পেয়েছে। এবার ঐ ফলগুলি খেয়ে নাও।
আপেলটা তো দারুণ মিস্টি!

তুমি বড়ো ভালো ছেলে, তাই এই খড়িটা তোমাকে দিলুম। তুমি এই খড়ি দিয়ে যা কিছু আঁকবে সেটা তোমার কথা শুনবে কিন্তু এটা কোন দুস্টু লোক বা ছেলের হাতে পড়লে উলটো ফল হবে।

ছেলেটা খুবই দুঃখী কিন্তু বড়ো ভালো. ওর হাতে জাদুখড়ির কোন অপব্যবহার হবে না।

সন্ন্যাসীঠাকুর দেখিয়ে গেলেন। এবার আমি নিজে পরখ করে দেখি।
এবার আকাশে উড়ে যা।

এবার আকাশে উড়ে যা।
কিচির কিচ!
দারুণ! এই জাদুখড়ি দিয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারি।

এবার আমি কি করি, মাঠে ঘাটে ঘুরি ফিরি।

টগবগ

তিনকড়ির জাদুখড়ি

তুমি অনেক দিন ধরে ঘর ভাড়ার টাকা দিচ্ছো না, বুড়ি! আজ টাকা না দিলে ঘরের জিনিস পত্র রাস্তায় ফেলে দেবো।
এখন কোথাথেকে দেবো বাবু! নিজেরাই ভালো করে খেতে পাইনা।

এই তোমরা ঘরের সব জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দাও।
তাড়াবেন না, বাবু! বাপ মা মরা এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় যাবো।

ঝনাৎ ঝন্!

পায়ে ধরছি, বাবু! এই বাচ্চাটার কথা ভেবে উৎখাত করবেন না।
সরো সরে যাও বিরক্ত কোরোনা। এখানে আমি গ্যারেজ তৈরি কোরবো।

বাবু! এই বুড়ি ঠাকমা আর বাচ্চাটাকে ঘর থেকে বের করে দেবেন না।
তুমি আবার কে হে পুঁচকে ছোঁড়া ওদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছো।

পুঁচকে ছোড়া মাতব্বরী করতে এসেছিস, ভালো চাস তো কেটে পড়!
না হলে তোকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

ডিঙ্কড়ির জাদুখড়ি

টগবগ

মহাকাশের আজব দেশে

তিনগ্রহের বন্ধু জিক্কুর সঙ্গে তাদের বিচিত্র দেশ সুদূর মার্সেটিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলো পৃথিবীর বাসিন্দা টুটু। কিন্তু তখন ঐ গ্রহের নিকটবর্তী গ্রহ জর্গেরি দুষ্ট শাসক ক্যাপ্টেন ক্র্যাপ মার্সেটিয়া অধিকারের জন্যে হানা দিচ্ছিলো কিন্তু দুই বন্ধু জিক্কু আর টুটু কি করে তা বানচাল করে দিচ্ছিলো তাই নিয়েই এই কাহিনী।

দড়াম!

মহাকাশের আজব দেশে

দৌড়োও!
ইয়োফ্‌স!
দানবাকৃতি কুকুর বাদুকুর ক্যাপ্টেন ক্র্যাপের ডুপ্লিকেটর মেশিনে তৈরি। যাতে ছোট কিছুর ছবি দিলে জীবন্ত বিশালাকার হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রভুর আদেশে ট্রেনারকে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো।

এই ফাঁকে মহাকাশের জালিয়াত দস্যু পশু ট্রেনিংয়ের সব পুরস্কার হাতিয়ে নিলো।
হাঃ হাঃ! আমি ঐ কেরী লোকটার চেয়ে অনেক বেশী ভালো ট্রেনার।

পোষ্য মালিকেরা আতঙ্কে পালালো।
ওরফ্‌!

বিলি চিপস, রেস্তোরায় মাংস সরবরাহকারী। এর আগেও কুকুর ওর পিছু নিয়েছে— কিন্তু এর মতো একটাও নয়।
অ্যাই! তোর থাবা সরিয়ে নে! বাঁচাও!

বেচারা বিলি সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারলো আর ওর ডেলিভারী দেওয়ার জিনিস রাস্তায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
ইর্‌ক!
দড়াম!

বাদুকুর এবার তার নিজের জন্যে ট্রফি পেলো এক খণ্ড মাংস! তড়িৎ গতিতে সেটা খেয়ে আবার মালিকের কাছে ফিরে এলো।
তোমার ভালোই হয়েছে, বাদুকুর! তোমার কাজের পুরস্কার স্বরূপ খাদ্য পেয়েছো।

মহাকাশের আজব দেশে

বাদুকুরের মাংস চুরি জিক্কুকে একটা মতলব এনে দিলো। ও মাংসের দোকানে গিয়ে বড় দেখে হাড় সমেত এক খণ্ড মাংস নিয়ে এলো। তারপর সেটা একটা মডেল স্পেস জেটে বাঁধলো।
তুমি ওটাতে যে অদ্ভুত গুঁড়ো দিয়ে প্রলেপ লাগাচ্ছো ওটা কি জিক্কু?
কিছু মনে করো না। শুধু এটা আমার হাত থেকে ফেলে দেওয়ার মতো কিছু করো না।

আড়ালে থেকে জিক্কু প্লেনটাকে পাঠালো হাড়টাকে টেনে শোঁ-শোঁ শব্দে ক্ষুধার্ত বাদুকুরের নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।
হুউস্-স্!

গন্ধ শুঁকে পেটুকের মতো উড়ন্ত কুকুরটা ওটাকে ধাওয়া করার জন্যে উঠে পড়লো।
জাহ্! ফিরে আয় বাদুকুর!

নির্বোধের মতো ঐ হাড্ডিটাকে তাড়া করা থামাও! নীচে নেমে এসো!
জিক্কু প্লেনটাকে সব রকম বিমান চালনার কৌশল প্রয়োগ করে হাড়টাকে দানবাকৃতি কুকুরের নাগালের বাইরে রেখে দিলো।

তারপর জিক্কু প্রকৃতপক্ষে তার কৌশলের আসল খেলা দেখালো প্লেনটাকে ঝাঁপ খাইয়ে ক্যাপ্টেন জ্যাপের দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়ে গিয়ে।
জুলপস! এসব কি ঘটে চলেছে?

প্লেন আর হাড়টা ক্যাপ্টেন জ্যাপের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঠিকই বেরিয়ে গেলো, কিন্তু শূন্যলোকের পাজিটা জোর ধাক্কা খেলো যখন বাদুকুর অনুসরণের চেষ্টা করলো।
না! বাদুকুর, না! ওটা কোরো না! তুমি কখনই– জোই-ই-ই!
ধড়াম!

ধড়াম!

মহাকাশের আজব দেশে

কিন্তু শেষপর্যন্ত বাদুকুর হাড়টাকে ধরতে পারলো আর জিঙ্কু ওর কন্ট্রোলবক্সের বোতামে চাপ দিলো।

যে পাউডার ও হাড়ে লাগিয়েছিলো ওটা বিস্ফোরক ছিলো। এখন ওটা চোখ ঝলসানো দীপ্তি বিকীর্ণ করে সশব্দে ফেটে শূন্যে উড়ে গেলো।
দুম!

হতচেতন আর নিমীলিত চক্ষু বাদুকুর আকাশ থেকে আছড়ে পড়লো।

কি মজার কাণ্ড। এখন অন্য সব কুকুরেরা প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ দেখে বাদুকুরকে সংহার করার জন্যে তাড়া করলো।
এখন দ্যাখ, ওকে দৌড়োতে হচ্ছে।
কুকুর শিক্ষা কেন্দ্র
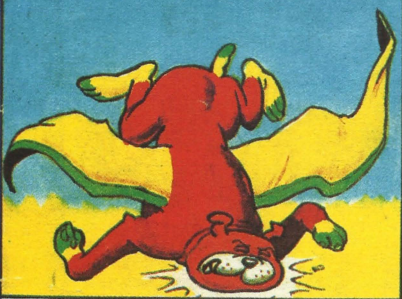
জিঙ্কু আর টুটু আশাতিরিক্তভাবে আজ যুদ্ধে জয়লাভ করলো। ওরা শুধু ক্যাপ্টেন ক্যাপ আর বাদুকুরকেই পরাস্ত করলো না সেই সঙ্গে ওরা দাম্ভিক কুকুর ট্রেনার মিঃ কেরীকেও উচিত শিক্ষা দিলো।
গরর্! আমরা আমাদের পোষ্যদের তোমার কাছে ট্রেনিং দিতে এনেছিলাম!
এখন ওরা একদল বন্য কুকুরের মতো আচরণ করছে!
বাঁচাও! হেল্প!
আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই!

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান
নারায়ণ দেবনাথ
পটলচাঁদ আর তার অনুগত কুঁতের দিন যখন বৈচিত্র্যহীন ভাবে কাটছিলো, তখন একদিন...
দ্যাখো পটলদা, দ্য গ্রেট মার্ভো কাল মিউজিয়াম হলে শো দিচ্ছে! মনে হচ্ছে এ একজন সত্যিকার দারুণ ম্যাজিশিয়ান।
মার্ভোকে নিয়ে এতো উচ্ছ্বাস করছিস? আমি তাহলে তোর কাছে যথেষ্ট ভালো ম্যাজিশিয়ান নই, কুঁতে?
না পটলদা, আমি কখনই এ বলতে চাইনি যে তুমি ভালো নও, কিন্তু এই লোকটি টুপির ভেতর থেকে পায়রা বের আর মানুষ করাত দিয়ে দুটুকরো করতে পারে!
এগুলো করা খুবই সোজা! আমার ম্যাজিক ওর যে কোনওটার থেকে অনেক ভালো।

পরদিন পটলচাঁদ আর কুঁতে মিউজিয়াম হলে গেলো...
ভদ্র মহিলা এবং মহোদয়গণ! এবার আমার গুরু দ্য গ্রেট মার্ভোকে উপস্থিত করার অনুমতি দিন!
ম্যাজিশিয়ান নাটকীয় ভাবে মঞ্চে প্রবেশ করলো...
শুভ সন্ধ্যা!
ওফ্! এটা দুর্দান্ত!
এ নেহাৎ ছেলেমানুষী!
আমি আমার সবচেয়ে চমকপ্রদ খেলা দিয়ে শুরু করি! মঞ্চের ওপর আয়নাটা লক্ষ্য করুন! আমি এখন ওটার মধ্যে দিয়ে যাবো এবং সম্পূর্ণ...

উবে যাবো!
ওঃ! দারুণ করেছে! সাবাশ!
ফুঃ! এ তো সোজা — তুই আমার অদৃশ্য হওয়ার খেল দেখেছিস, কুঁতে।
শ্‌শ্‌শ্‌!
বকবকানি থামাও তো!
আমার পরের খেলা, আমি আপনাদের মনের কথা পড়বো! এই মুহূর্তে আপনারা কি চিন্তা করছেন তা আপনাদের বলবো!
এসব পাঁয়তাড়া না কষেই আমি এসব বলতে পারি! আমি ভাবছি ইনি একটি অকর্মার ধাড়ী!
পটলদা!
তুমি এই প্রদর্শনীর ক্ষতি করছো!

লজ্জায় কুঁতে মুখ লুকোতে চাইলো। পটলচাঁদের হলোটা কি?
এই যে, তুমি অনুগ্রহ করে বাইরে চলে যাও।
ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি!

কুঁতেকে একা রেখে পটলচাঁদ বেরিয়ে এলো…
ওঃ, মনে হচ্ছে মার্জো এবং তার ম্যাজিকের ওপর পটলদা ঈর্ষান্বিত হয়েছে! কিন্তু আমি পুরো প্রদর্শনীটাই দেখতে চাই। একা থাকলে বোধহয় এটা কেটে যেতে পারে!

মার্জো বলেছে মনের কথা পড়া খেলা! আমিও তো এই বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়ে ওর মনের কথা পড়তে পারি! আর— কি সর্বনাশ!
মিউজিয়াম
এই দিকে

এবার অদৃশ্য হওয়ার খেলা দেখাবার সময় হয়েছে! বুদ্ধু দর্শকেরা ভাবতেই পারবে না যে, আমি যখন আমার চ্যালা ভোঁকারামকে অদৃশ্য করবো ও তখন গিয়ে মিউজিয়ামের দামী দামী জিনিস লোপাট করবে যতক্ষণ না আবার ওকে দৃশ্যমান করি!

পটলচাঁদের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো…
আচ্ছা, এই তাহলে ওর খেলা! আমি বুঝেছি ও কোন ম্যাজিশিয়ানই নয়।
এবার আমার অদৃশ্য করার ভেল্কি! আমার বন্ধু এই খালি খুপরির মধ্যে ঢুকছে। আমি মন্ত্রোচ্চারণ করছি — ফ্রিশ, ফ্রুশ, ফ্রিশে, খুপরির ভিতর বন্ধু আমার বাতাসে যাও মিশে! এবার আমি দরজা খুলছি এবং…

…সে অদৃশ্য! খুপরি বিলকুল ফাঁকা! উঠে এসে নিজেরা পরীক্ষা করে দেখে যান! পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি উল্টো মন্ত্র বলবো আর ও দৃশ্যমান হবে।
পটলদা এই দারুণ খেলাটা দেখতে পেলো না!

মিউজিয়াম
এই যে মার্ডোর চ্যালা ভোঁকারাম লোককে বোকা বানিয়ে মিউজিয়ামের জিনিস লুট করে পাচার করতে যাচ্ছে!

যেমন মার্ডো তার ম্যাজিক মন্ত্র উচ্চারণ করলো...
ড্রিং ড্রিং ছুট! ফিরে এসো বন্ধু মোর এসো চটপট!

পটলচাঁদও তার মন্ত্র আওড়ালো·
চলে এসো ভোঁকারাম শুনে মোর ডাক, যা কিছু গোপন আছে হোক চিচিংফাঁক!

পরমুহূর্তে, যখন, ম্যাজিসিয়ান খুপরির পর্দা সরালো...
মরেছে! ভোঁকা, তুই আমাকে ধোঁকা দিয়ে এসব জিনিস নিয়ে এখানে কি করছিস!
এগুলো পাচার করার কোন চান্সই পেলাম না গুরু!

হলের মধ্যে গোলমাল শুরু হলো
সর্বনাশ! মিউজিয়ামের মূল্যবান জিনিস!
এরা দেখছি একজোড়া ডাকাত!
তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছিলো — এরা মেকি মাল!
ওঃ, পটলদা, আমি কি করে তোমাকে ভুল বুঝলুম!

ভোঁকা উজবুকটা এতো চমৎকার প্ল্যানটার একেবারে ভরাডুবি করে ছেড়ে দিলো! এই হট্টগোলের তালে এবার কেটে পড়ি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, ১৯৭৯

বুদ্ধিমান কুকুর
নারায়ণ দেবনাথ

হতচ্ছাড়া, বেরো এখান থেকে! জ্বালাতন করবি না! কিছু একটা করতে ভুলে গেছি, সেটাই মনে করার চেষ্টা করছি।
ছপাস!

আহ্! কুকুরটা নির্ঘাত হারিয়েছে- ওর গলায় কোন বকলস নেই।

?

উরিব্বাস! কি বুদ্ধিমান কুকুর-ও ওর নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছে!

গলায় বকলস নেই, এর জন্যে জরিমানা দিতে হবে!
ওহ্! ওর গলায় বকলস পরাবার কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম!

বর্তিকা, ২০০৮

শারদীয় পত্রপাঠ ১৪১৭ (২০০০)

পাদপূরণ (কার্টুন স্ট্রিপ)

'পাদপূরণ' (কার্টুন স্ট্রিপ)

দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে অসংখ্য 'পাদপূরণ' (কার্টুন স্ট্রিপ) তৈরি করেছেন নারায়ণ দেবনাথ। 'পাদপূরণ' শব্দটি এসেছে– কোনো লেখার শেষে অতিরিক্ত স্থান, মজার ছবি দিয়ে পূর্ণ করার পদ্ধতি থেকে। এই কার্টুন স্ট্রিপগুলি প্রধানত সংলাপবিহীন। দু-তিনটি বা তার বেশি সমান আকারের কার্টুন ছবি দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করা হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশ্ববিখ্যাত কার্টুনিস্ট কাফি খাঁ (পি.সি.এল.) সর্বপ্রথম বাংলায় কার্টুন স্ট্রিপ সৃষ্টি করেন।

উল্লেখযোগ্য পাদপূরণগুলি প্রকাশিত হয়েছে পূজাবার্ষিকী— শারদীয়া ১৩৬৮, অলকানন্দা ১৩৬৯, শ্যামলী ১৩৭০, উত্তরায়ণ ১৩৭১, নীহারিকা ১৩৭২, অরুণাচল ১৩৭৩, শুকশারী ১৩৭৬, উদ্বোধন ১৩৭৮, পূরবী ১৩৭৯ ইত্যাদিতে।

● আদর্শ স্বামী

১৯৬০ সালে করা নারায়ণবাবুর প্রথম কার্টুন, নবকল্লোল ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৬৭)

● বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়
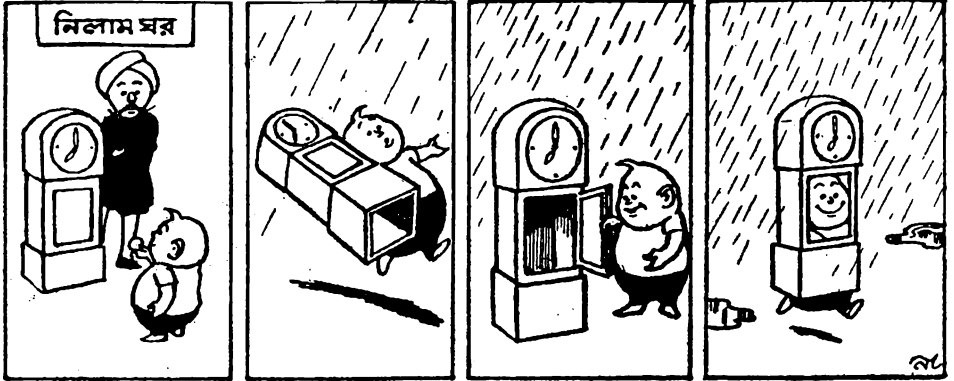
● গোড়ায় গলদ

● নাকাল নেংটি !

● ম্যাজিক

● চলন্ত গাছ !
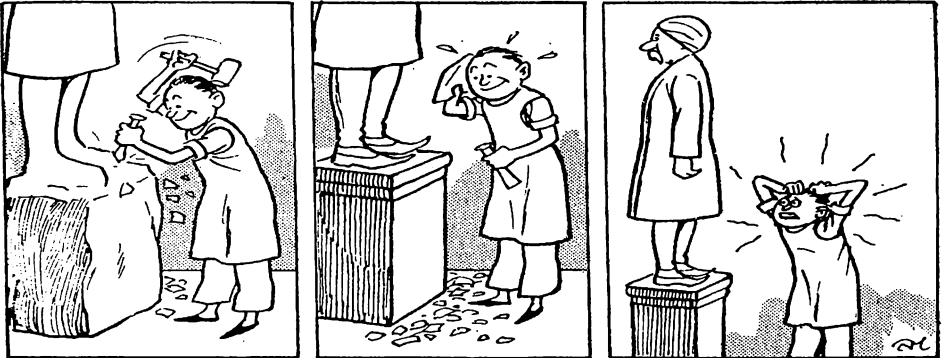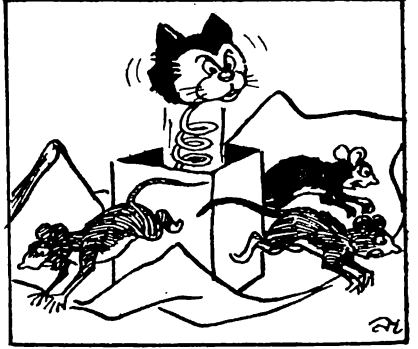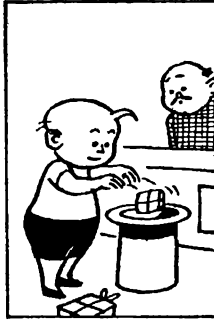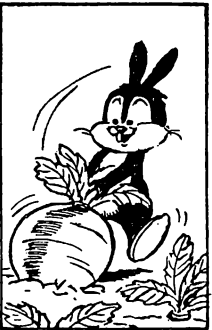
● বেহালার সুর
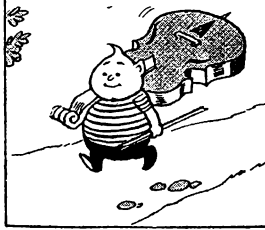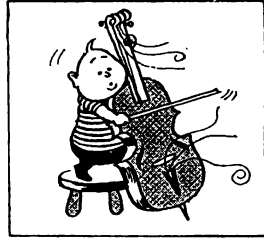
● আইনের প্যাঁচ

● ভৃত্যের সমস্যা
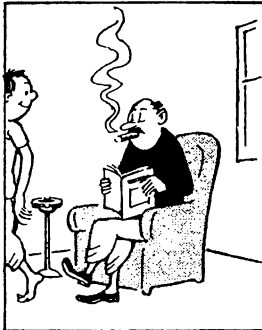
● বাঃ বাঃ! বাব্বাঃ!!
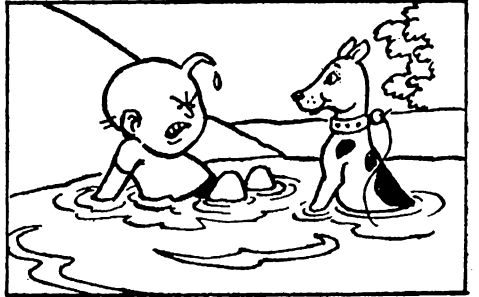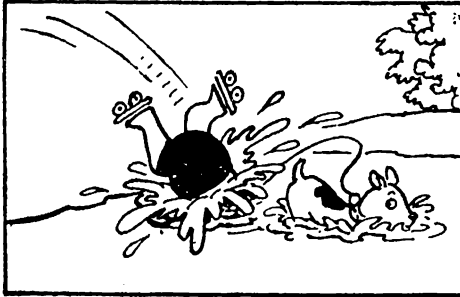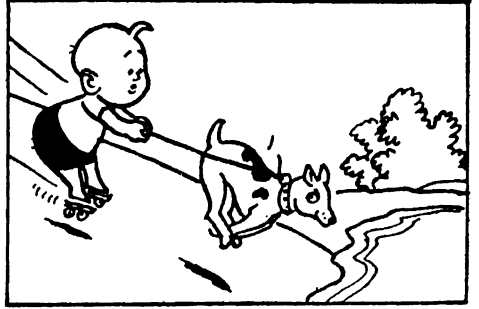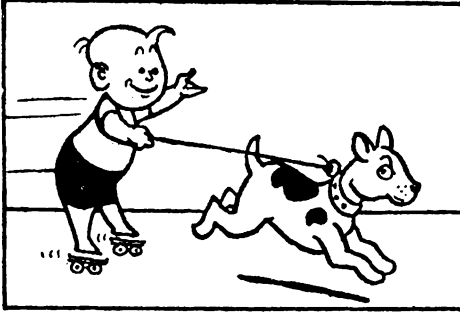
● ভয়
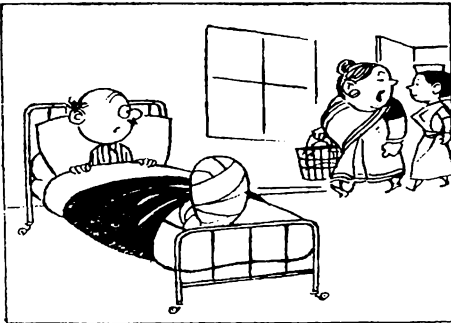
● কেমন নাকাল!
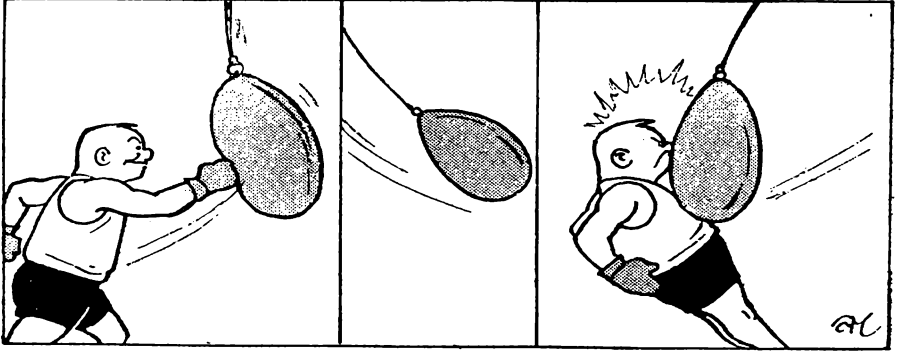
● কেমন মজা!

● চুল কাটার দাম
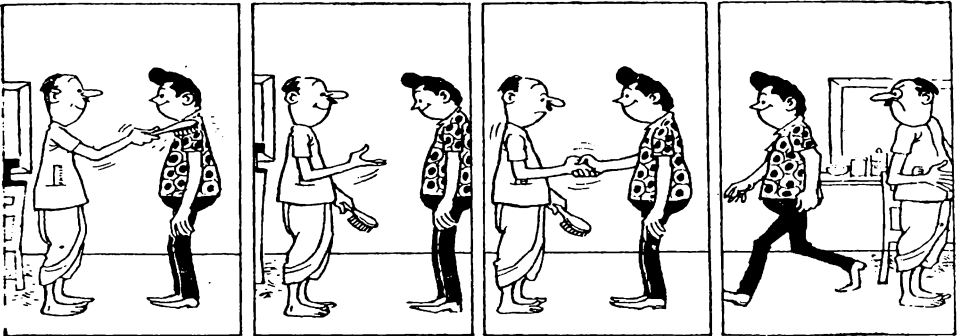
● গাড়ি চড়ার মজা
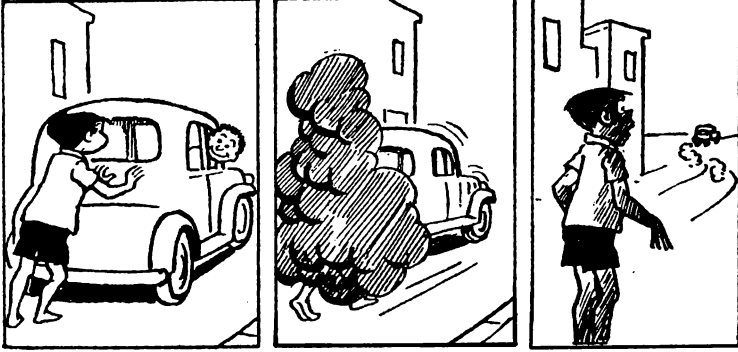
● সাবাস্ বীর !
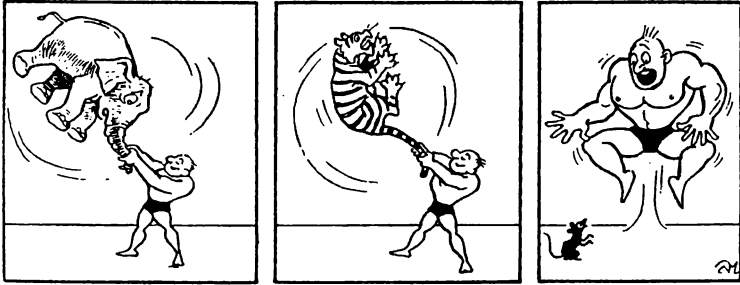
● বীর বাহাদুর
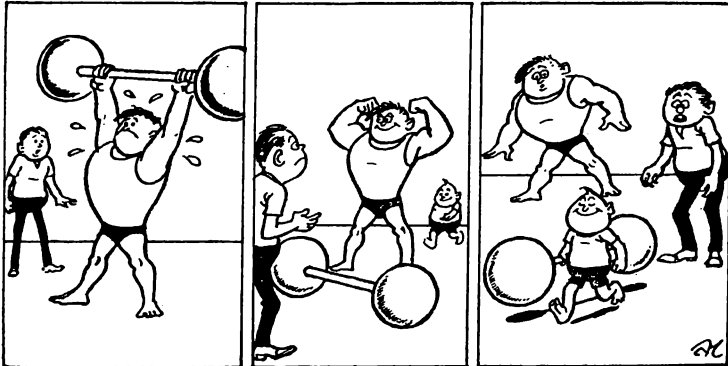
● খোকার শাগরেদ
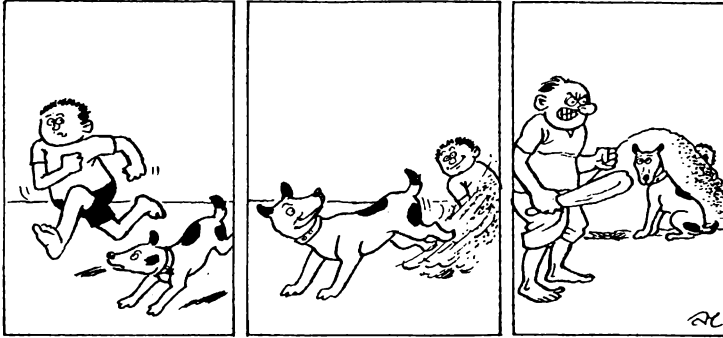
● বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়
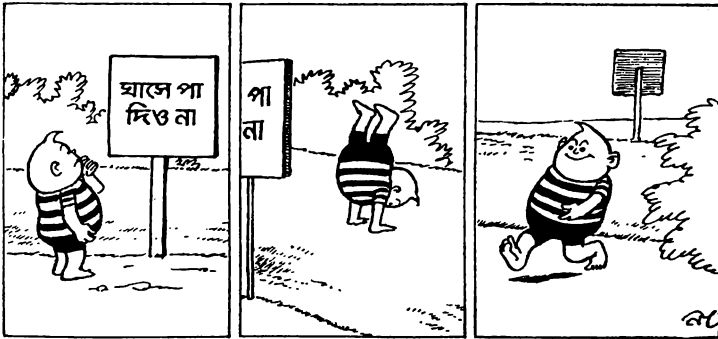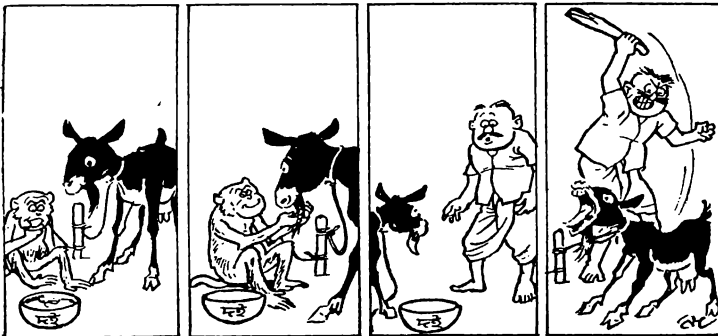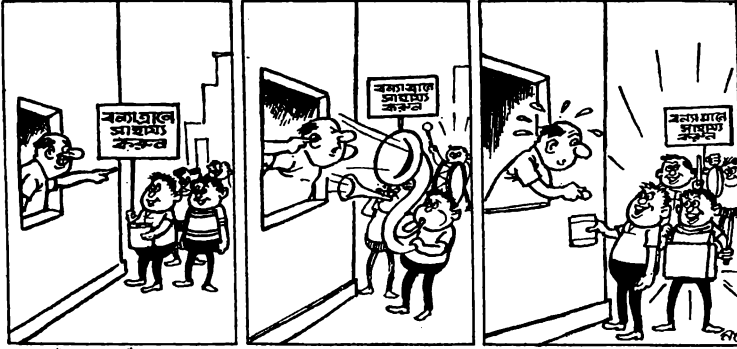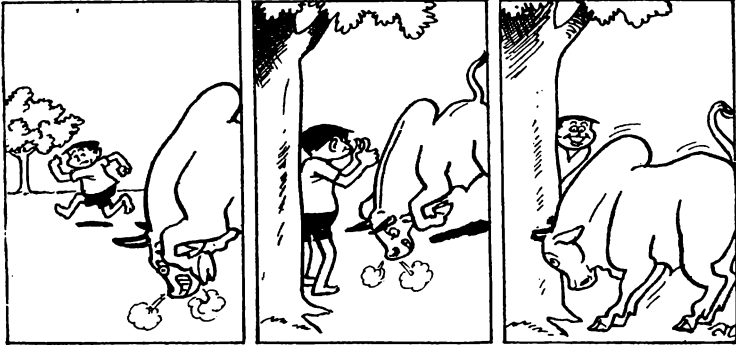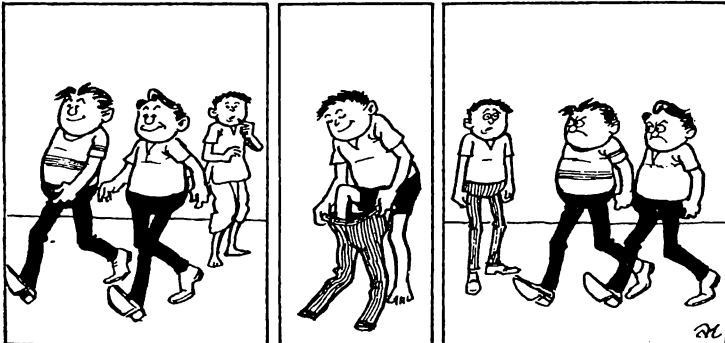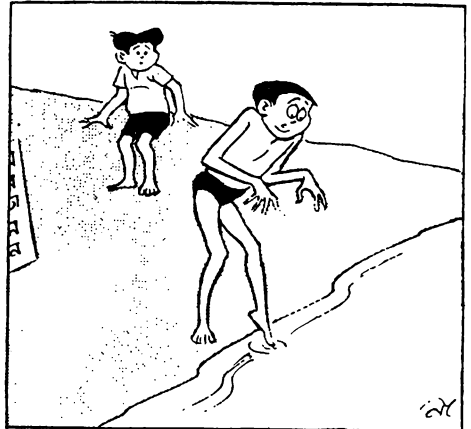
● বাঁদর বন্ধু

● **চাঁদা আদায়ের সোজা উপায়**

● **ষাঁড়ের গোঁ**

● **সমান হতে রাজি নয়**

● বীর পুরুষ

● ছেলের গুঁতো
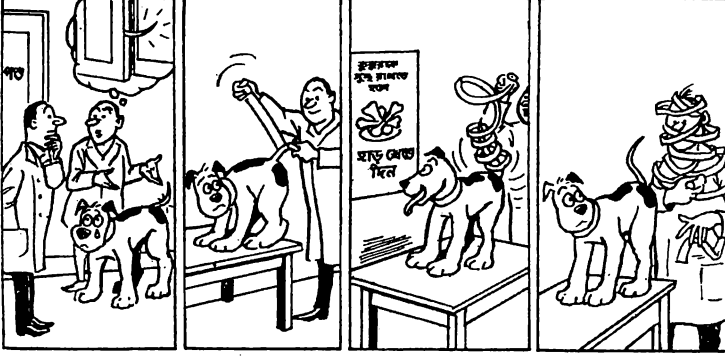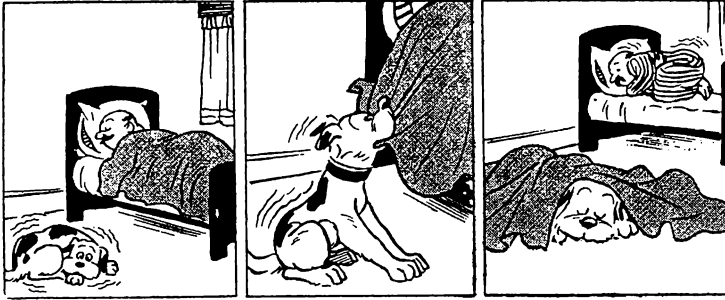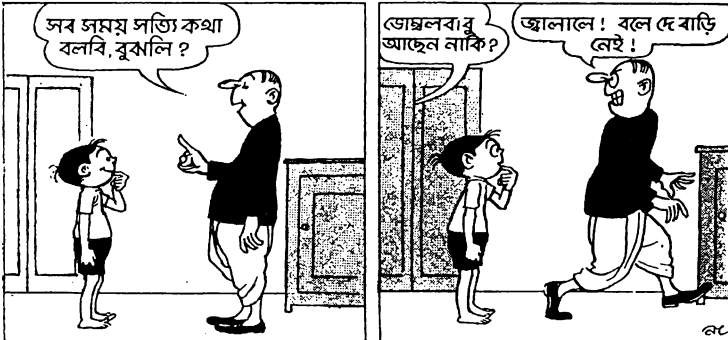
না. ঐ দোলনা আমি তোমায় কিনে দেবো না। ছোটবেলায় আমার দোলনা আমি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি।

কিন্তু বাবা, আমার দড়িটাও যে ছোট।

যে রকম হোক একটা দোলনা দরকার।

এই যে ! আর আমি খুঁজে মরছি যে আমার বাগানের মাটি খোঁচাবার কাঁটা দুটো গেল কোথায় ?

এ্যাই, এ্যাই ! আমার সদ্য কাচা ক্রিকেট খেলার প্যান্ট ধরে দুলছিস্ ? শিগগির নাম !

দ্যাখ হতভাগা আমার প্যান্টের কি অবস্থা তুই করেছিস। এবার দোলবার অন্য ব্যবস্থা কর

আচ্ছা।

এসব বন্ধ করবার মাত্র একটাই উপায়।

আশ্চর্য ! আমাকে দোলনা কিনে না দেবার মতটা বাবা পাল্টাল কেন !

● হাড়ের লোভে—

● সাম্যস্থাপন

● নীতি শিক্ষা

ছবির ধাঁধা

বৈশাখ ১৩৭৪

উত্তর—

শুকতারা ১৩৭৩, জ্যৈষ্ঠ

শুকতারা ১৩৭২, মাঘ

উত্তর—

শুকতারা ১৩৭৫, বৈশাখ
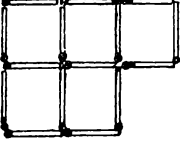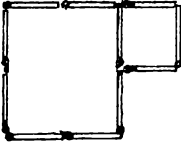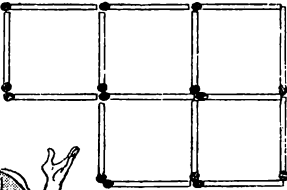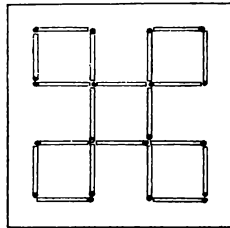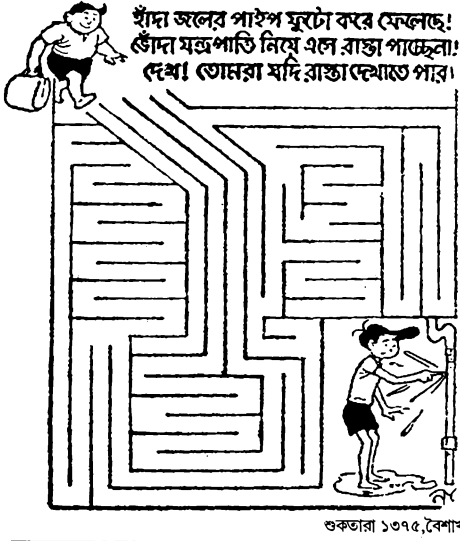
শুকতারা ১৩৭২, পৌষ

উত্তর—

বুদ্ধির খেলা

১৩৭২ অগ্রহায়ণ
১৯৬৫
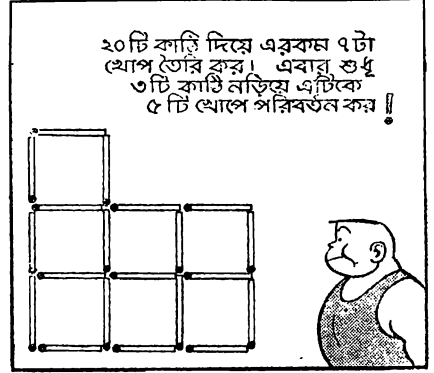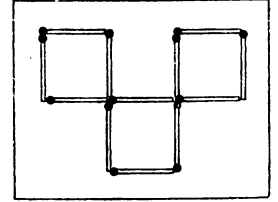
উত্তর— ১। দাঁড়— নৌকা বাইবার জন্য।
২। মাথা শিরস্ত্রাণ— মোটর রেসের জন্য
৩। জাঙিয়া ও মুখোশ— জলে সাঁতার কাটবার জন্য
৪। হকি স্টিক— হকি খেলার জন্য
৫। ফুটবল বুট ও ফুটবল— ফুটবল খেলার জন্য
৬। স্কেট — স্কেটিংয়ের জন্য
৭। প্যাড — ক্রিকেট খেলার জন্য
৮। দস্তানা— বক্সিং-এর জন্য
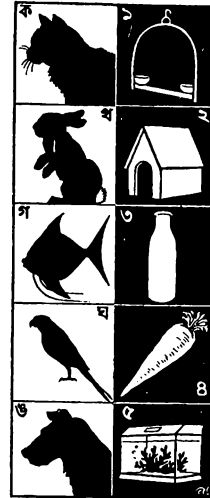
কোন জিনিসটি কার, কে কত
তাড়াতাড়ি বলতে পারো।

শুকতারা ১৩৭২, আশ্বিন
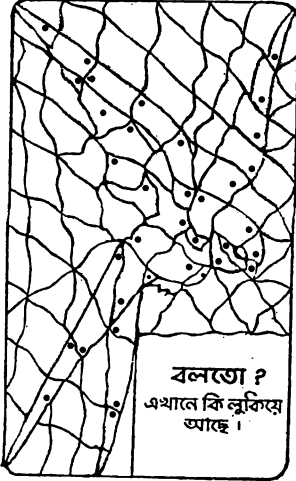
ফুটকি ঘর ভরালেই দেখতে পাবে।
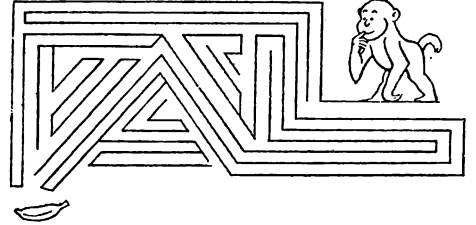
বুদ্ধির খেলা

কোন্ পথ দিয়ে হনুমান বেচারী গিয়ে কলাটি খাবে বল তো ?

শুকতারা ১৩৭৫, ভাদ্র

উত্তর—

বুদ্ধির খেলা

৩ ৫ ৪

বল তো কে কি করছে ?

দেখ কে কি করছে—

শুকতারা ১৩৭৬—৭৭
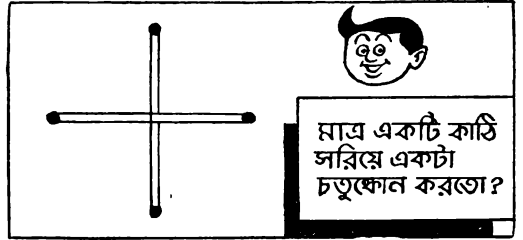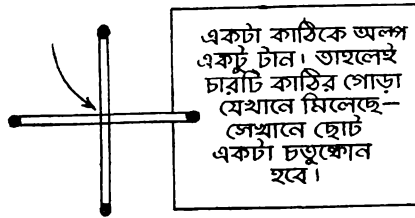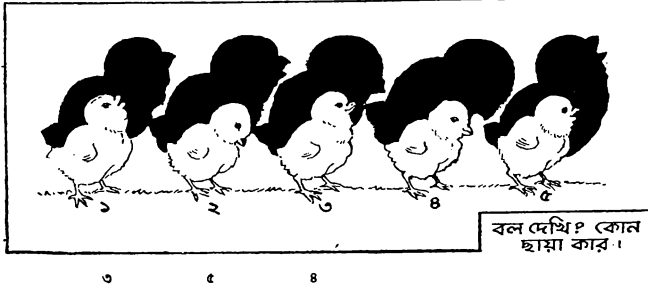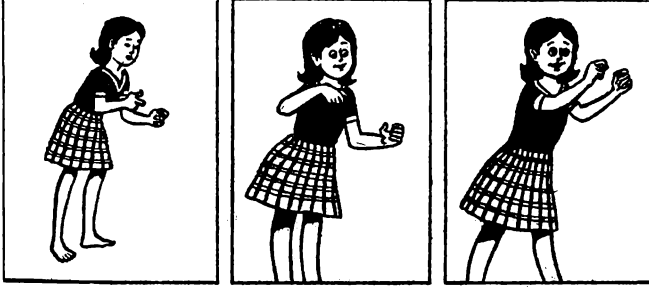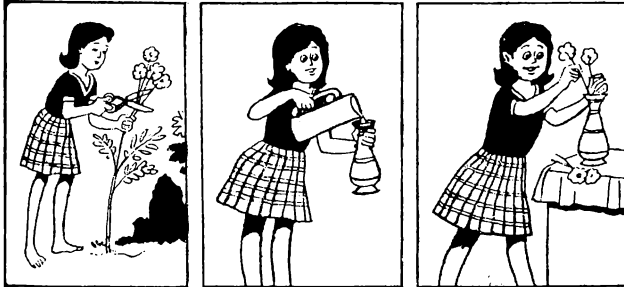
অদ্ভুত ছবি
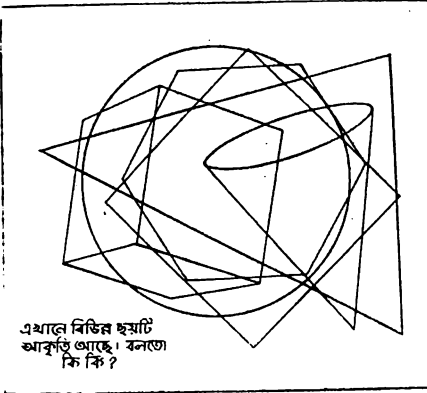
শুকতারা ১৩৮১, মাঘ

উত্তর— চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ, কিউব কোণ, ষড়ভুজ, বৃত্ত

ছবিতে আঁক
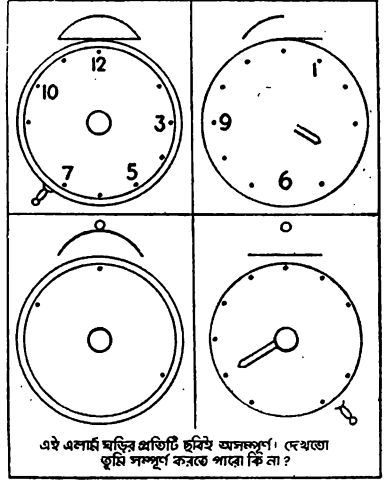
এই এলার্ম ঘড়ির প্রতিটি ছবিই অসম্পূর্ণ। দেখতো তুমি সম্পূর্ণ করতে পারো কি না?

শুকতারা ১৩৮২, আষাঢ়

ক মোদের বন্ধ হলো, ক্ষাও শেষ;
ঠিক করলাম রা যাব দেখতে নতুন দেশ।
চা , মামা, ছোট এবং আমি
দহে ট কেটে ঘাটায় নামি।
থেকে চড়ে এলাম বুনোর দেশে,
র চূড়া সেথায় আ সনে মেশে।
খীর গানে র শ্যামল বনানী,
র মত দেখতে লাগে সাঁও গাঁওখানি।
রকম ফসলভরা নদীর উভয়,
ন. দিয়ে বা বহে ধীর।
বাঁকে শাল মহুয়া বনের ফাঁকে ফাঁকে—
য় ছাওয়া গুলিতে. সাঁও রা থাকে।
নিলাম পাতালের পাশে,
ফলের ঝাঁকা য় সাঁও রা আসে।
সাথে গল্প করে খু আমোদ পাই,
— এমন সরল আর কোথাও নাই।
মা হয়ে মাদল বাজায় ভাঙা,
ভাষায় গান করে আর নাচে গল পারা।
তে শুয়ে মোরা শুনি তাদের গান,
করে হচ্ছে মোদের দিনের অবসান।

শ্রীতি

শুকতারা ১৩৬০ কার্তিক

ভাই

তোমার পেলেম শাখে।
ভাবছো চিঠির এ দেরী ডাকে!
ছাড়া আমি যে ভাই মাসের শেষ
চড়ে ঘুরছি দেখে নানান দেশ।
হাওড়া ছেড়ে প্রথম আসি
মামার আস্তানাতে চমৎকার।
সেথা থেকে বেরিয়ে চড়ে
নাম্রি নদীর র।
নতুন ট্রেনে চড়ে দেখি কতই দেশ—
তে কি লিখে জানাই সবিশেষ।
রা জেলার কত সহর সব দেখা—
এখন আছি সীমার শেষ——।
এখান থেকে রক্সৌলে ধরে
যাচ্ছি নে। লিখবো ঠিক করে
নেই টা বন্ধ ভাই—
এ খ টুকু দিলেম।

ইতি

শুকতারা ১৩৬০ আষাঢ়

মজার চিঠি

ভাই

রা এলাম ডিতে পূজোর দিনে ভাই,
নতুন দেশে এসে মোরা বড়ই মজা ই।
আ হেথায় আলোয় ভরা, বা পরিষ্কার,
চারিধারের দৃশ্য দেখে লাগছে চমৎকার।
উগ্রী নদী ছে কেমন ছাপিয়ে দুটি
স্নিগ্ধ শোভা দেখছি কে শ্যামল বনানীর।
আশে পাশে পা কত, আঁকা-বাঁকা পথ,
সাঁও রা বাজায় দূরে মাদল নিয়ে গৎ।
নদীর ধারে লকী বন, পলাশ গাছের সার,
থা তে বসে মোরা দেখছি অনিবার।
মোদের বাড়ী নদীর পাশে, তাইতো মজা ই,
নাচি হাসি হল্লা করি, উল্লাসে গান।
এখান থেকে মন যে আমার ফিরতে নাহি চায়,
এতটা সুখ কাতায় ওয়া কি আর যায়?
কেমন আছিস সবাই তোরা, চিঠির ব দিস।
আজের মত বিদায় নিলাম ভালো নিস্।

ইতি

শুকতারা ১৩৫৯ ফাল্গুন

মজার খেলা

এর মধ্যে দু'টি মাত্র পাতা একরকমের। বের কর তো কোন্ দু'টি?
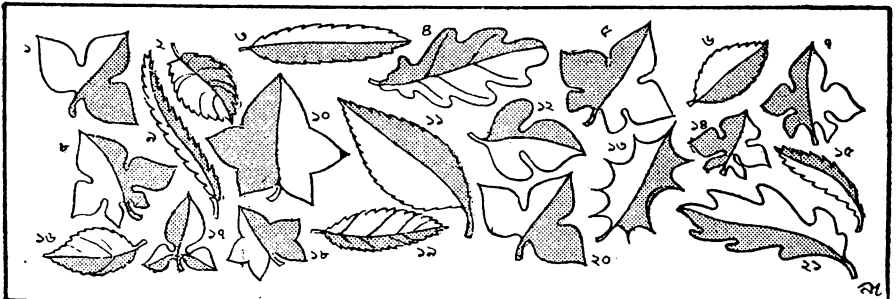
শুকতারা ১৩৭২ ভাদ্র

১৩৭৮/১৯৬৫

১৩৭৩/১৯৬৬

১৩৮২/১৯৬৭

১৩৭৫/১৯৬৮

১৩৭৬/১৯৬৯

১৩৫৮ ফাল্গুন (১৯৫১) সালে দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত 'শুকতারা' পত্রিকাতে নারায়ণ দেবনাথ প্রথম 'টারজান' সিরিজের অলংকরণ শুরু করেন। গল্পের নাম 'টারজানের দ্বিতীয় এ্যাড্‌ভেঞ্চার', লেখক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তার আগের মাসের সংখ্যায় টারজানের প্রথম আবির্ভাব শুকতারা-র পাতায়। প্রথম টারজান গল্পের নাম 'ফার্স্ট এ্যাড্‌ভেঞ্চার অব্ টারজান' (মূল বানান অপরিবর্তিত) অলংকরণ করেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
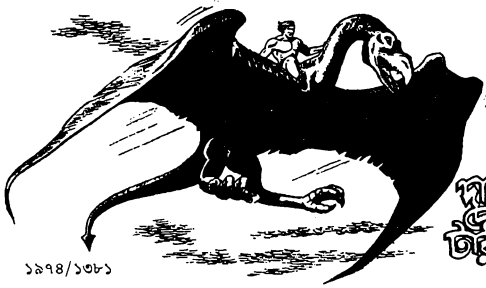
১৩৫৯, ভাদ্র (১৯৫২) সাল থেকে 'সব্যসাচী' (সুধীন্দ্রনাথ রাহা) প্রণীত টারজান শুরু হয় শুকতারার পাতায় (গল্পের নাম 'টারজানের চতুর্থ এ্যাড্‌ভেঞ্চার') যার অলংকরণ করেন নারায়ণ দেবনাথ।

মানুষের অ্যানাটমি ড্রয়িং-এর এক অনন্য নজির টারজান সিরিজের ইলাস্ট্রেশন।

১৯৫১ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর ধরে শুকতারার পাতায় চলা টারজানের গল্পের অলংকরণ করেছিলেন প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই রায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, ময়ূখ চৌধুরী, নারায়ণ দেবনাথ প্রমুখ, যার মধ্যে নারায়ণ দেবনাথ অঙ্কিত টারজান সিরিজ প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। নারায়ণ দেবনাথের নিজের পছন্দের বিষয় ছিল টারজানের সিরিয়াস অলংকরণ। কৈশোরে দেখা জনি ওয়েসমুলার অভিনীত টারজানের বিদেশি সিনেমার প্রভাব পড়েছিল তাঁর টারজান অলংকরণে।
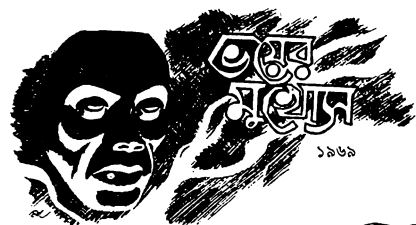
নবকল্লোল ও শুকতারা পত্রিকায় করা বৈচিত্র্যময় অলংকরণ।

রূপকথা থেকে কমিক জন্তুজানোয়ারের ছবি সবক্ষেত্রেই সাবলীল নারায়ণ দেবনাথের তুলি।

ইলাস্ট্রেশনের জগতে অনবদ্য মজার ভূত ও দানব এঁকেছেন নারায়ণ দেবনাথ।
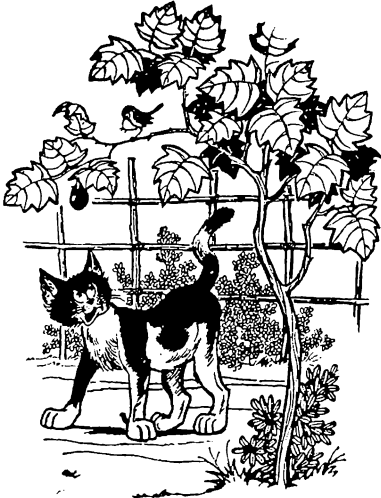
সিরিও কমিক ছবিতে নারায়ণবাবু সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন ঘরানা।

টারজানের
পাতাল অভিযান

সমুদ্রগভীরে
জলদস্যু

হীরের পাহাড়
অনিল ভৌমিক

গুপ্তধনের
সন্ধানে
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

৩
মুখোসধারী
বিচারক
শ্রীস্বপনকুমার

হলুদ
শয়তান
নিশাচর

ড্রাগনের
আবির্ভাব
শ্রীস্বপনকুমার
১

হত্যা-হাহাকারে
হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৯৮৬

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

অ্যাডভেনচার্স অব
রবিনহুড

থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্স

বেন-হুর

১৯৮৭

১৯৭৪

১৯৭৪
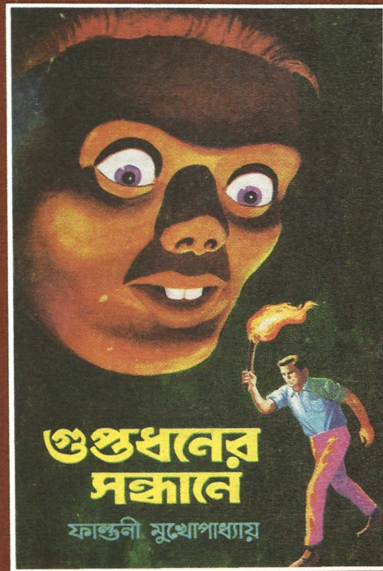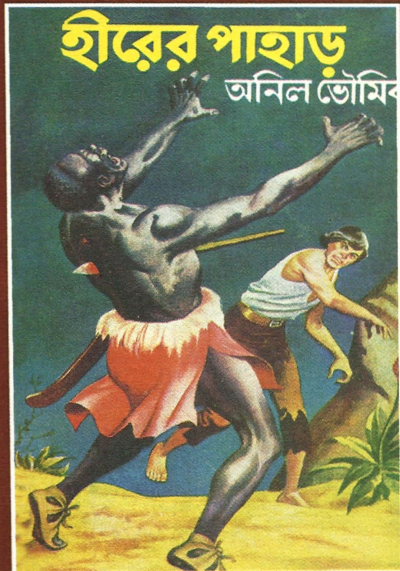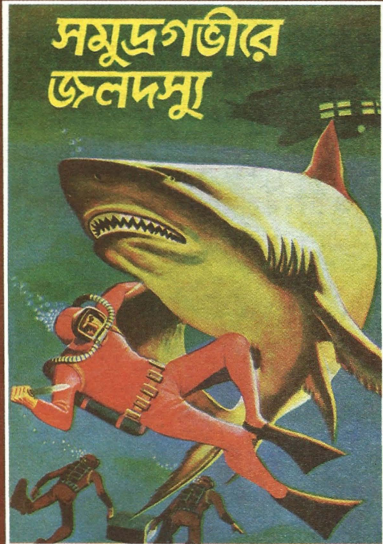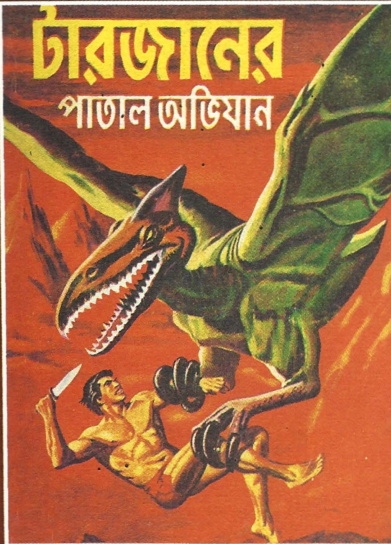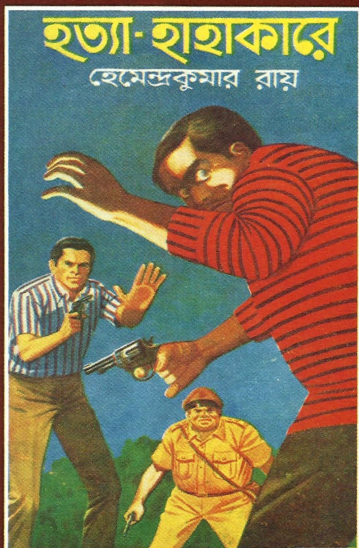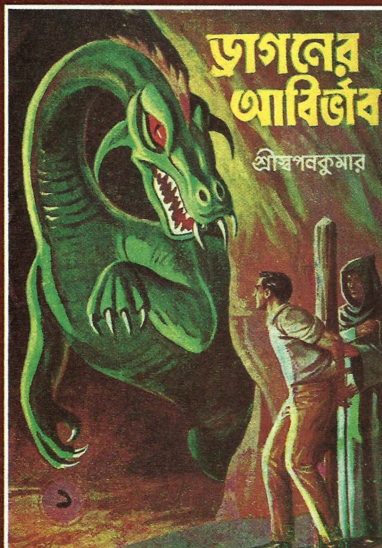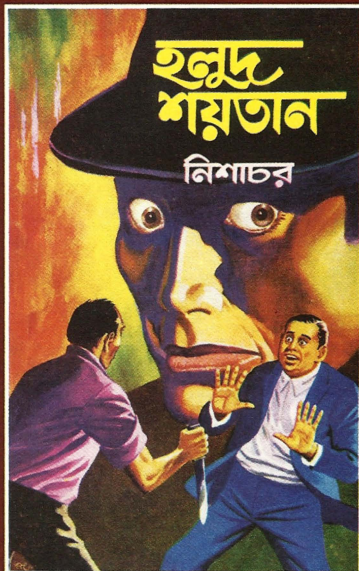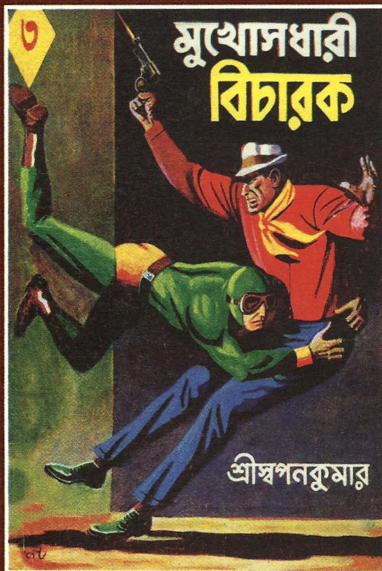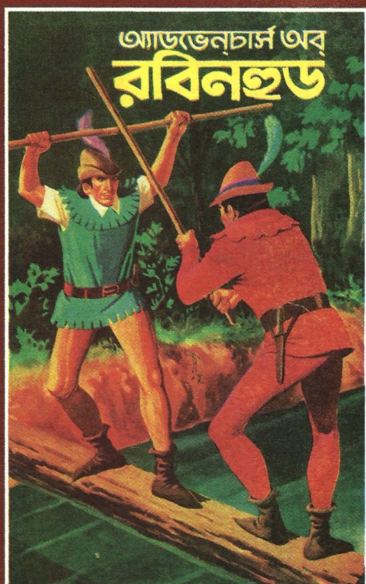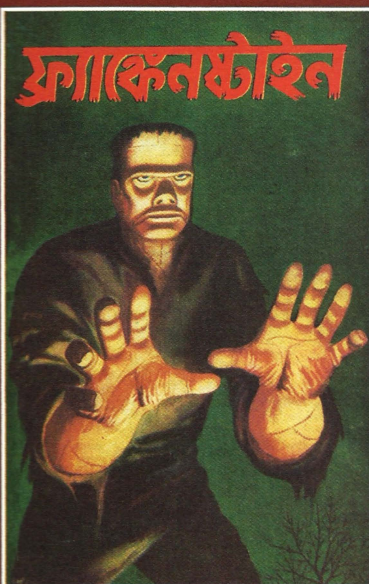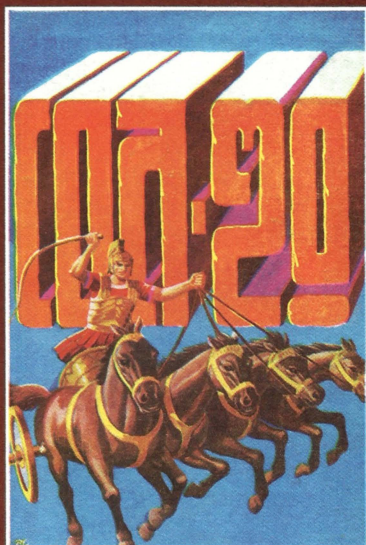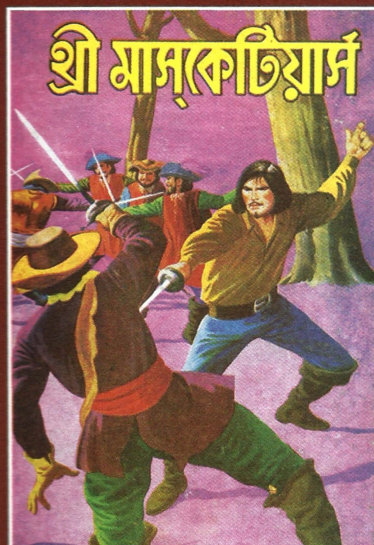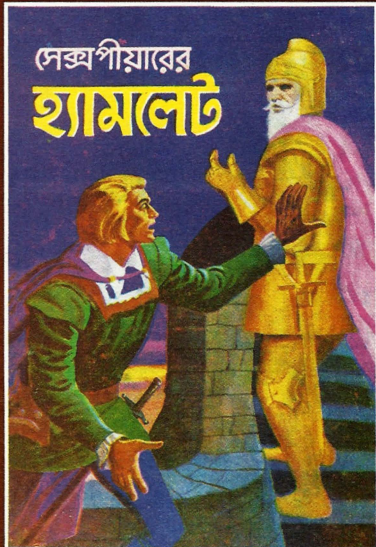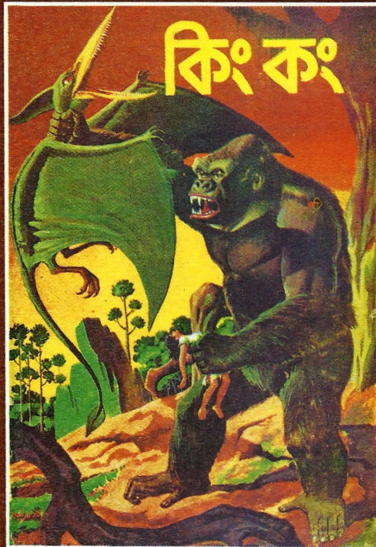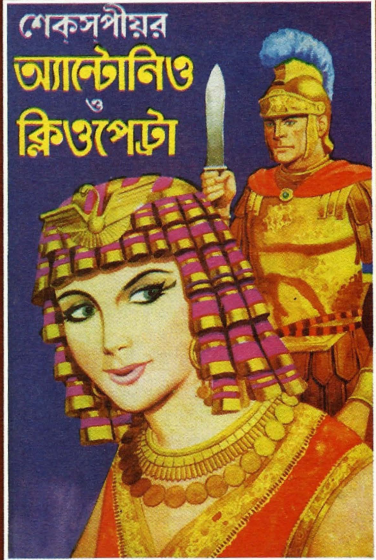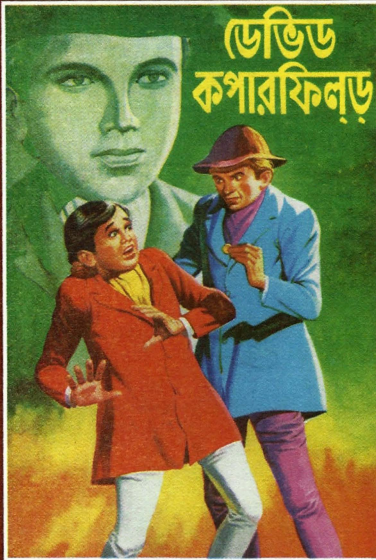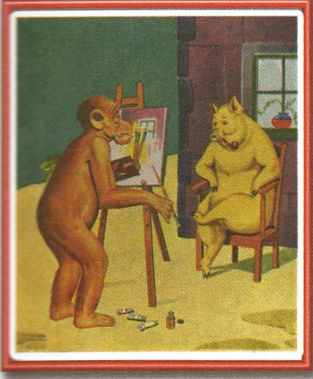
শ্যামলী ১৯৬৩
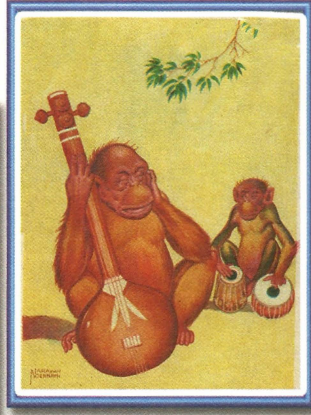
উত্তরায়ণ ১৯৬৪
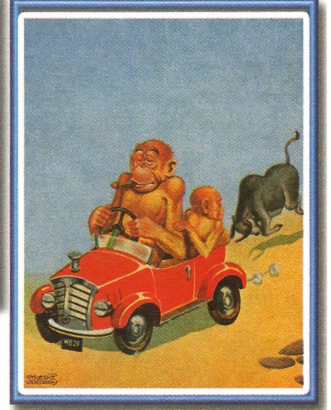
নীহারিকা ১৯৬৫
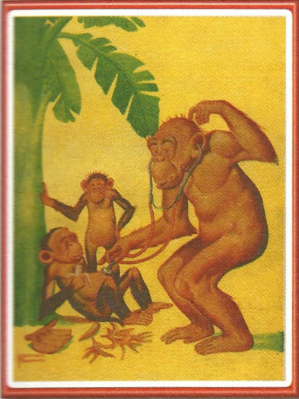
অরুণাচল ১৯৬৬
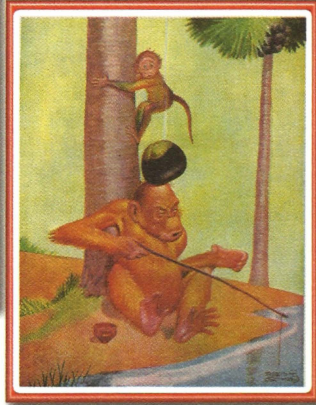
বেণুবীণা ১৯৬৭

ইন্দ্রনীল ১৯৬৮

প্রথমে কবি সুনির্মল বসু ও পরবর্তীকালে বিমলচন্দ্র ঘোষের শিম্পাঞ্জী 'শিম্পু' কবিতার সিরিজের সঙ্গে বিদেশি শিল্পী Jawson Wood-এর ভাবধারায় আঁকা নারায়ণ দেবনাথের অলংকরণ। প্রকাশিত হয় দেবসাহিত্য কুটীরের বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে। প্রথমদিকে এই কবিতার ছবিগুলি এঁকেছিলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কিন্তু পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয় নারায়ণ দেবনাথের অলংকরণগুলি।
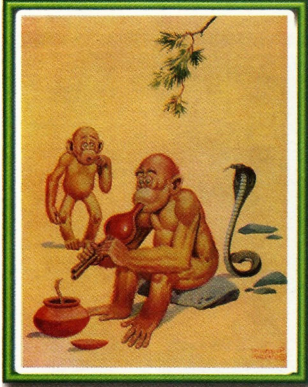
শুকসারী ১৯৬৯

মণিহার ১৯৭০

উদ্বোধন ১৯৭১

পূরবী ১৯৭২

আগমনী ১৯৭৬

প্রভাতী ১৯৮০

১৯৮২

বলাকা
দেব
সাহিত্য
কুটীর

ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গুপী গাইন
বাঘা বাইন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কৌশিক ঘুরে গেলো, একজন আক্রমণকারী কাছে আসতেই...

আইন মানার সময় নেই, বন্ধু...

আগহ্!

ক্যাররর!

কৌশিক রায় বলছি।

হাঙরের দুটো চোখই নষ্ট করে দিলো কৌশিক...

এ ছাড়া কোন উপায় ছিলো না!

এই যে বন্ধু এখনো দাঁড়িয়ে উগ্রমুখ পাহারা দিচ্ছে!

ঠিক আছে, তুমি পাহারা দিতে থাকো। আমাকে এখুনি সম্রাটের খোঁজে যেতে হচ্ছে।

গাঁআঁক!
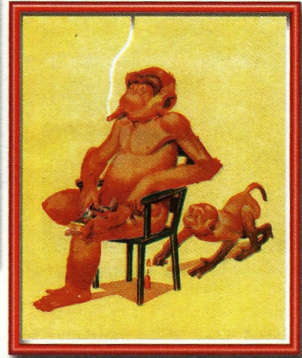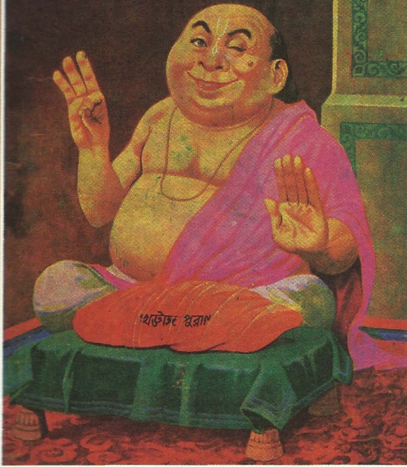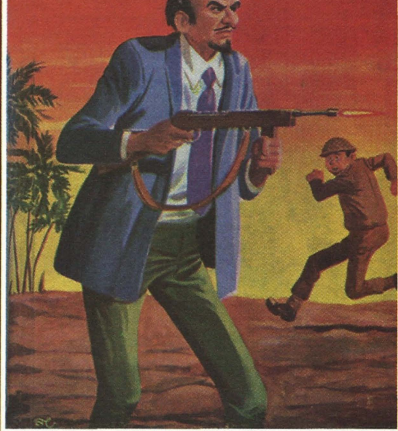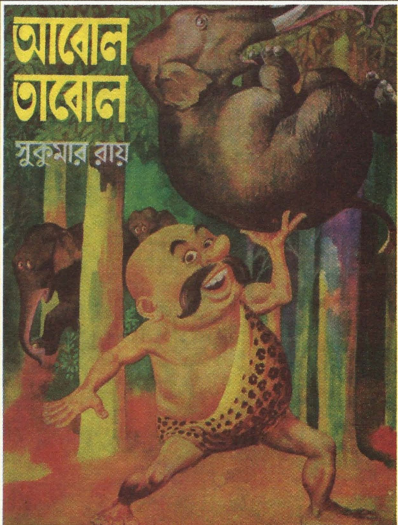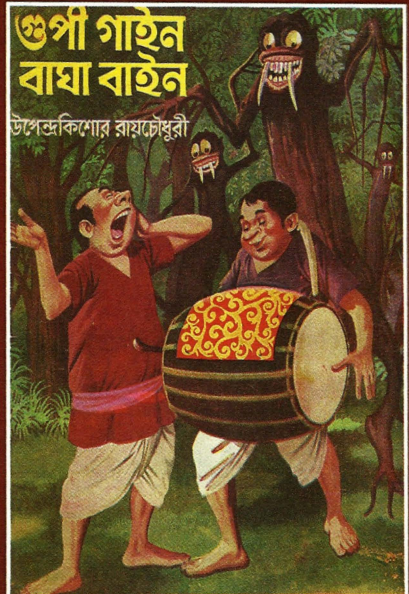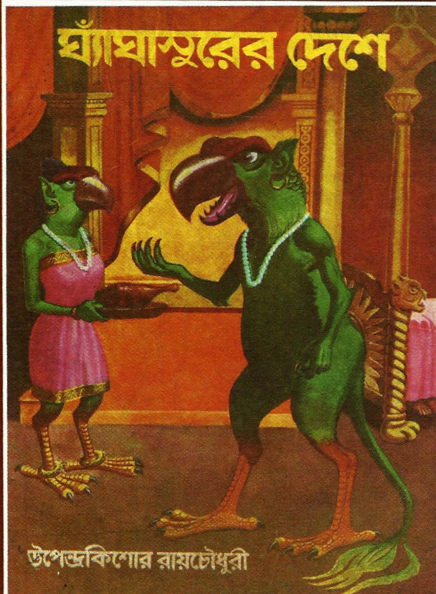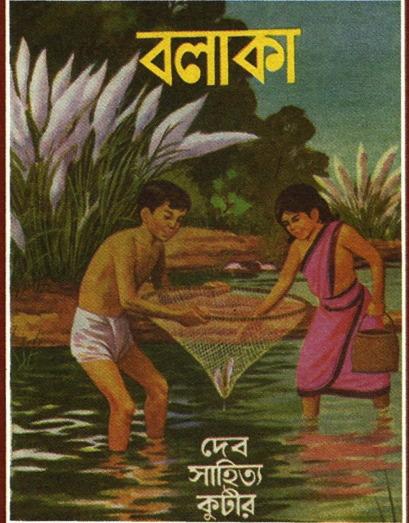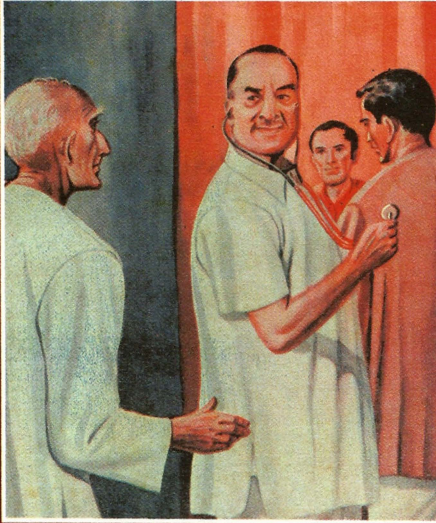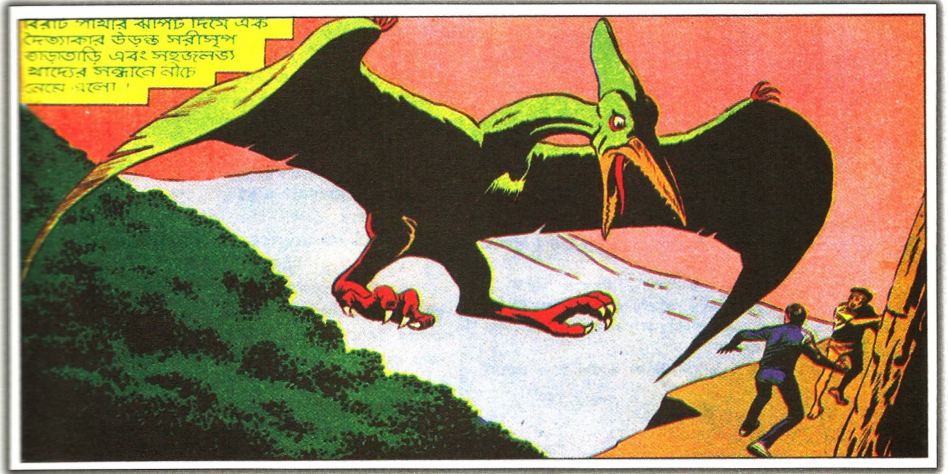
কৌশিকের অভিযান

১৯৭৬ সালে (১৩৮২ ফাল্গুন) শুকতারার প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট কৌশিক রায়ের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার চিত্রোপন্যাস 'সর্পরাজের দ্বীপে'। পরবর্তীকালে শুকতারার প্রচ্ছদেই প্রকাশ পায় কৌশিক রায়ের 'ড্রাগনের থাবা' (১৩৮৫ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্করের মুখোমুখি' (১৩৮৭ ফাল্গুন), 'অজানা দ্বীপের বিভীষিকা' (১৩৯০ ফাল্গুন), 'মৃত্যুদূতের কালোছায়া' (১৩৯২ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্কর অভিযান' (১৩৯৪ ফাল্গুন), 'স্বর্ণখনির অন্তরালে' (১৩৯৯ আষাঢ়) ইত্যাদি।

কৌশিক রায় ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের ক্ষুরধার গুপ্তচর (সিক্রেট এজেন্ট) যে মার্শাল আর্ট ও বক্সিং-এ সিদ্ধহস্ত। কৌশিকের ডান হাতটি ইস্পাতের যা থেকে গুলি, বেহুঁশ করা গ্যাস, লেসার রশ্মি বেরোয়। ইস্পাতের হাতের নখটি ছুরির মতো; প্রয়োজনে যা ছোঁড়াও যায়। আর গোপন ট্রান্সমিটার লাগানো আছে ওই ইস্পাতের হাতে।

এই রহস্য চিত্রকাহিনির ফ্রেমের ক্লোজ আপ, লং ভিশন থেকে আরম্ভ করে সংলাপের বিভাজনে সিনেমাটিক চরিত্র নিয়ে এসেছেন নারায়ণ দেবনাথ। ছবিগুলির অ্যাকশনধর্মিতা বা রিয়ালিস্টিক নেচার বিশ্বমানের। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

ড্রাগনের থাবা

নারায়ণ দেবনাথ

এক গোপন আন্তর্জাতিক অপরাধী সংস্থা এক অজ্ঞাত দুর্গম দ্বীপে ঘাঁটি করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের চরম ক্ষতি করে চলেছে। এই সংস্থাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যে ডাক পড়লো ইস্পাত মুস্টিক কৌশিক রায়ের।

ড্রাগনের থাবা

চৈত্র ১৩৮৫ ১৯৭৯
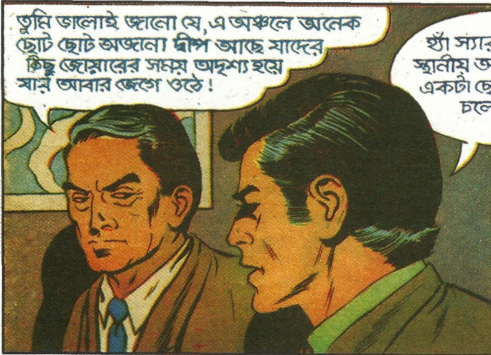
ড্রাগনের থাবা

কিন্তু এরা তো হাজার কয়েক বছর অবলুপ্ত ! ওখানে এরা আছে কি করে?
শুধু আছেই নয়, যারা ওখানে ঘাঁটি তৈরি করেছে সেই দলের পাণ্ডা ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ! ভয় হয় এটা একটা গুরুতর অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় !

তোমার কাজ কি হবে, মনে হয় না তা আমাকে বলে দিতে হবে, কৌশিক !
আমি এখন চলি, পরে আবার দেখা হবে।
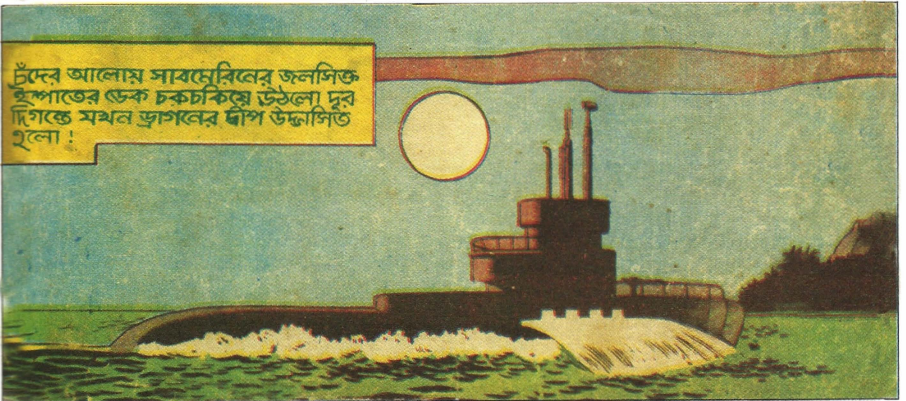
চাঁদের আলোয় সাবমেরিনের জলসিক্ত ইস্পাতের ডেক চকচকিয়ে উঠলো দূর দিগন্তে যখন ড্রাগনের দ্বীপ উদ্ভাসিত হলো !

ড্রাগনের থাবা

কিন্তু অতর্কিতে . . .

আ-আহ্ . . .

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ ১৯৭৯

ড্রাগনের থাবা

নড়াচড়া আর কথা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন !

প্রহরীরা চোখের আড়ালে যাবার পর স্থানীয় অধিবাসীটি প্রথম মুখ খুললো . . .
আপনার অনেক কাহিনী শুনেছি তাই আপনার উপস্থিতিকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি !

ভিনদেশী দুর্বৃত্তেরা আমাদের বাসভূমিকে বেআইনী কাজের একটা সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত করেছে ! আমরা জানি আপনি আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন।

ড্রাগনের থাবা

শ্রাবণ ১৩৮৬ ১৯৭৯
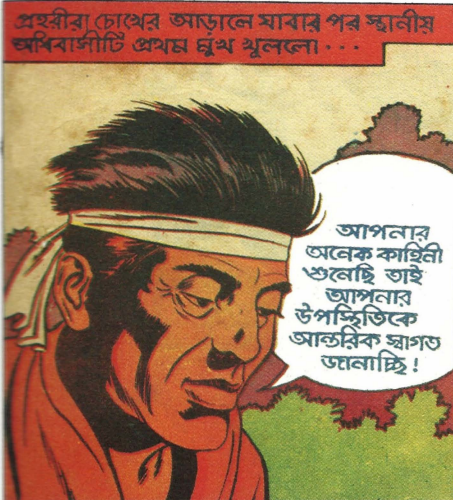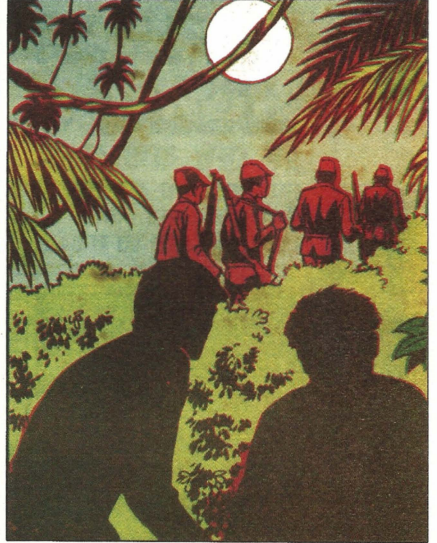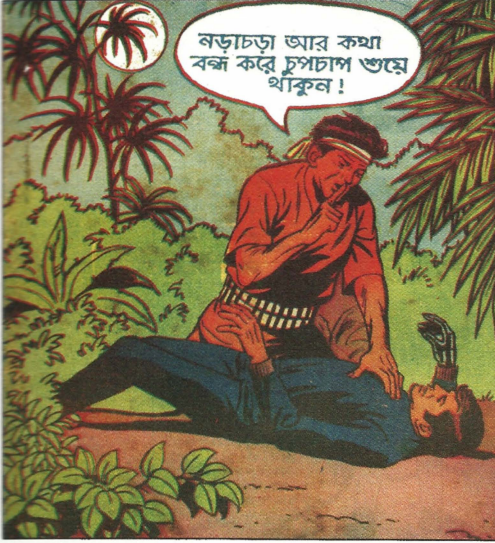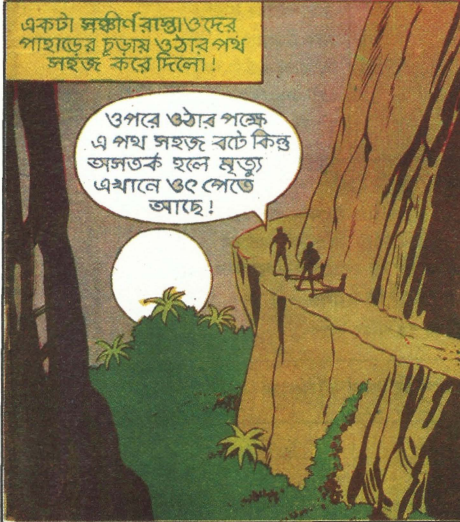
ড্রাগনের থাবা

সহসা তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো···
কালের প্রভাবে জীর্ণ প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্যের
নিদর্শন। নাগরিকেরা হয়তো তাদের দেবতাকে
তুষ্ট করার জন্যেই তৈরি করেছিলো।

ড্রাগনের থাবা

বিরাট পাখার ঝাপট দিয়ে এক দৈত্যাকার উড়ন্ত সরীসৃপ তাড়াতাড়ি এবং সহজলভ্য খাদ্যের সন্ধানে নীচে নেমে এলো।
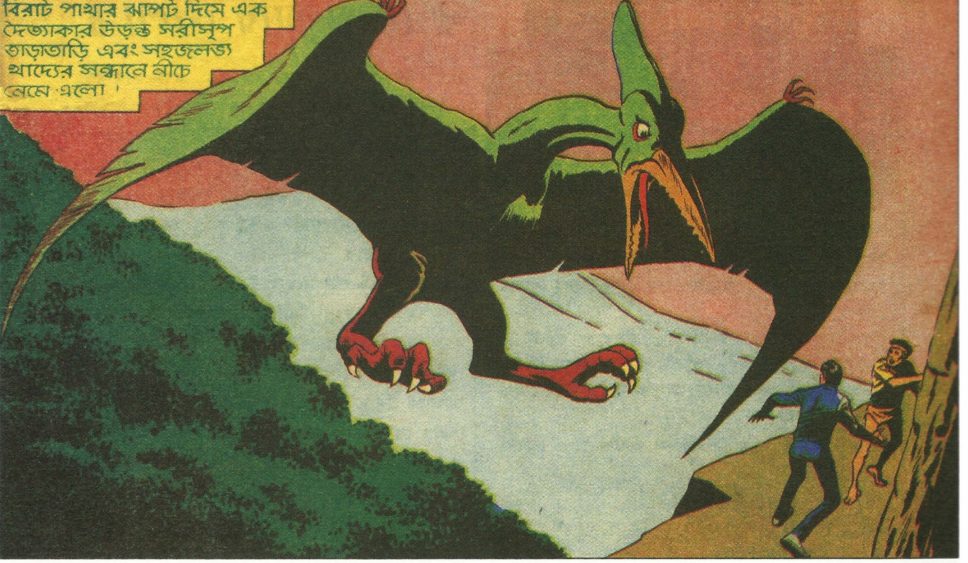
আশ্বিন ১৩৮৬ ১৯৭৯

ড্রাগনের থাবা

গুহার দিকে ছোটো, মনে হচ্ছে এটারও খিদে পেয়েছে! শিগগির।

ড্রাগনের থাবা

অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ ১৯৭৯
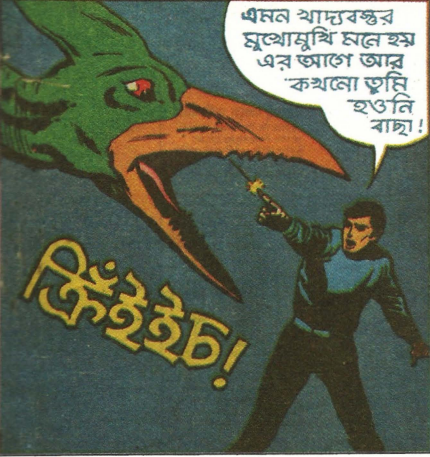
ড্রাগনের থাবা

দেশলাইয়ের আলোয় পাগলের মতো বের হবার রাস্তা খুঁজতে লাগলো কৌশিক।
গুহামুখ দিয়ে এখন বেরুবার উপায় নেই। আমাকে অন্য রাস্তা খুঁজে নিতে হবে।
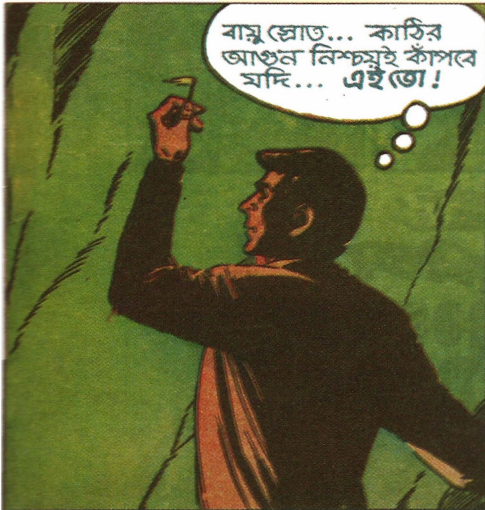
বায়ু স্রোত... কাঠির আগুন নিশ্চয়ই কাঁপবে যদি... এইতো!

খুঁজলে নিশ্চয়ই বের হবার একটা অন্য রাস্তা পাওয়া যেতে পারে...

ড্রাগনের থাবা

মাঘ ১৩৮৬ ১৯৮০

ড্রাগনের থাবা

ওদিকে ভয়ে আতঙ্কে উদ্ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক লোকটি যখন কৌশিকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটছিলো...

আর একটু এগোতেই হঠাৎ!
থামো! নড়াচড়া করলেই কপাল ফুটো হয়ে যাবে!
আহ্!

চুপচাপ এগিয়ে চলো।
কৌশিকবাবু জানতেও পারবে না আমি ধরা পড়ে গেছি!

এদিকে কৌশিক...
প্রতিটি মুহূর্ত এখন সাহায্যকারী বন্ধুর জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপার!

ড্রাগনের থাবা

এ তাহলে আমার পোষা পোষ্যদের চমৎকার খাবার হবে!..ওকে তাড়াতাড়ি খুঁটিতে বেঁধে ফেলো। কোন মুহূর্তে আমার ছোটখাটো পোষ্যদের কেউ কিছু খাবারের সন্ধানে এখানে এসে পড়তে পারে।

চৈত্র ১৩৮৬ ১৯৮০

ড্রাগনের থাবা

যেন কেউ সময়ের হাত ধরে পিছিয়ে নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক শতাব্দীতে পৌঁছে দিলো... আঁশওয়ালা সরীসৃপ দৃশ্যমান হলো!

হিস্‌স্‌স্‌!

ফায়ার!!!

ওর মস্তিষ্কে লক্ষ্য কর বোকারা! এখন থেকে এটা জেনে রাখ!

ড্রাগনের থাবা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ১৯৮০

চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে কৌশিক আক্রমন করলো!

আআইইই

এইতো... এইতো কৌশিক রায়!

ড্রাগনের থাবা

শ্রাবণ ১৩৮৭ ১৯৮০

ড্রাগনের থাবা

ওর মস্তিস্ক লক্ষ্য করে ফায়ার করে যাও, থেমো না!

চেতনা হারিয়ে এই দৈত্য সশব্দে ধরাশায়ী হলো!
কাজ হয়েছে!

রাস্তা পরিষ্কার, এবার যাওয়া যেতে পারে!

দুজনে আবার তাড়াতাড়ি সেই ভগ্ন নগরীর দিকে ফিরে চললো...
ওরা সতর্ক হবার আগেই হানা দিতে হবে!
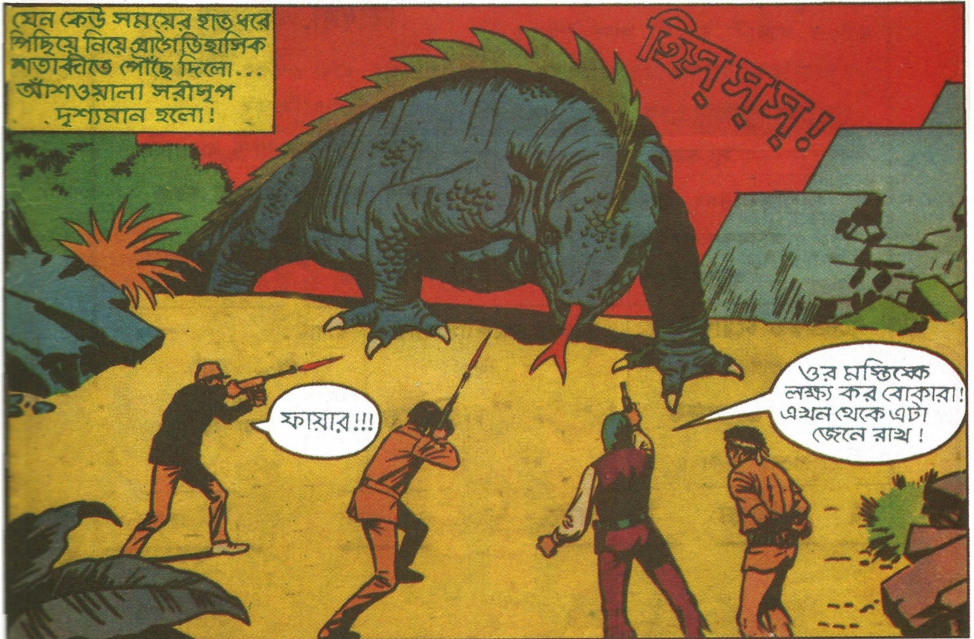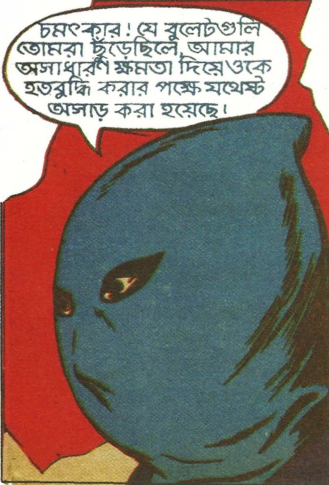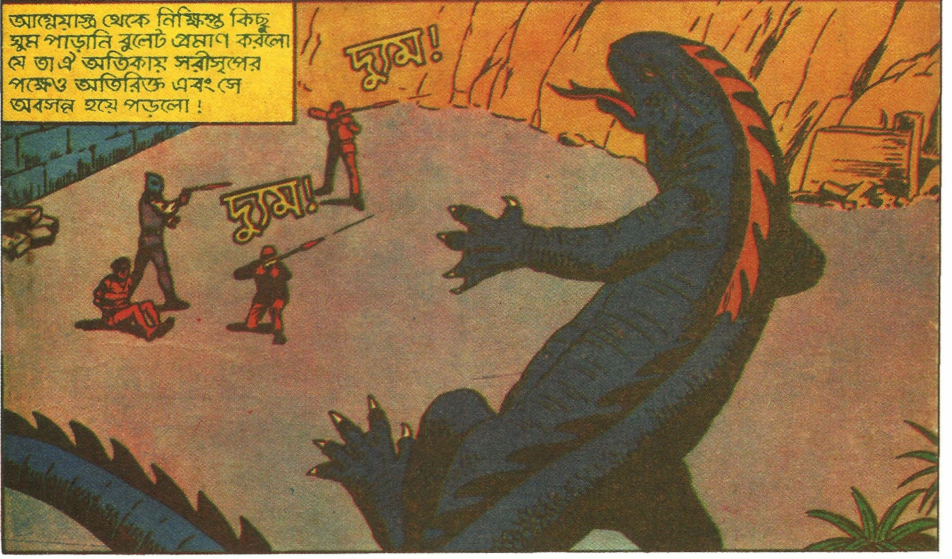
ড্রাগনের থাবা

অতর্কিত আক্রমণে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কিছু পাহারাদার ধরাশায়ী হলো, কিন্তু দলের পাণ্ডা গোলমালের সুযোগে পালালো!

কিন্তু কৌশিকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলো না!
দাঁড়াও!

বেশীদূর যাওয়ার আর সুযোগ পেলো না সে...
আহ্!

আমার মুখোমুখি হয়ে তুমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছো ভিনদেশি গোয়েন্দা!
তোমার খেলা শেষ হয়ে এসেছে মিঃ ড্রাগন!

ড্রাগনের থাবা

চকিতে গুলি চালালো দলপতি, কিন্তু কৌশিকের ইস্পাত মুস্টিতে প্রতিহত হয়ে গেলো!
ড্রাগনের থাবা থেকে এপর্যন্ত কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারে নি ভিনদেশী!
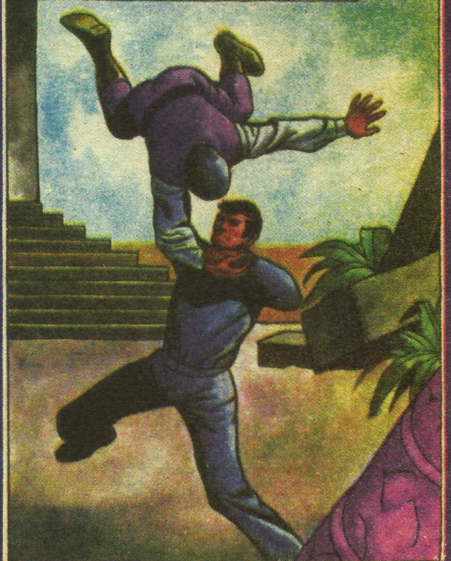
কৌশিকের মুহূর্তের বিহ্বলতার পুরো সুযোগ নিলো দলপতি!
আহ্!

...কিন্তু আর কিছু করার আগেই...

ড্রাগনের থাবা

অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ ১৯৮০

ড্রাগনের থাবা

ছুঁচ বুলেট ওদের থামাতে পারছে না!

কি হলো ?

পালাও !!!

ক্রুদ্ধ দানবকে বুলেটের কামড় আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো...

এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে!

ড্রাগনের থাবা

মাঘ ১৩৮৭ ১৯৮১
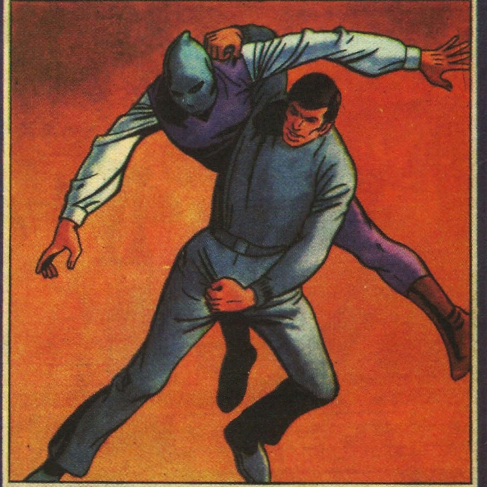
অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

নারায়ণ দেবনাথ

ক্ষমতালিপ্সু একজন মানুষ দুনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের লোভে গোপনে ভয়ঙ্কর ক্ষেপনাস্ত্র তৈরিতে তৎপর। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা তাই এই উদ্দেশ্যকে বানচাল করার কাজে কৌশিক রায়কে আহ্বান জানালো...

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

শ্রাবণ ১৩৯০ ১৯৮৩

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হলো কৌশিক...

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

আপনি ভাগ্যবান! ইনি সেনর ডালমিকো, আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। ইনি যদি এখান দিয়ে এখন না যেতেন....

এসব ব্যাপার ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়ে থাকে। আমি এটা করতে পেরে আনন্দিত!

কৌশিককে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করা হলো এবং ...

ওখানে আরো একজন ছিলো, সেও আহত... ব্যাপারটা খুবই খারাপ...

সে ভালো হাতেই আছে। আপনার ক্ষত পরিচর্যার জন্যে আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে।

একটা বিরাট বাড়িতে তারা প্রবেশ করলো—পরিচারকেরা কাজের সহজাত প্রবৃত্তিতে উপস্থিত হলো...

ধন্যবাদ, বেশ লাগছে। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ...

ক্ষমা করবেন। আমার অন্য অতিথি আর জরুরী কাজ আছে, আমি শিগগিরই ফিরবো।
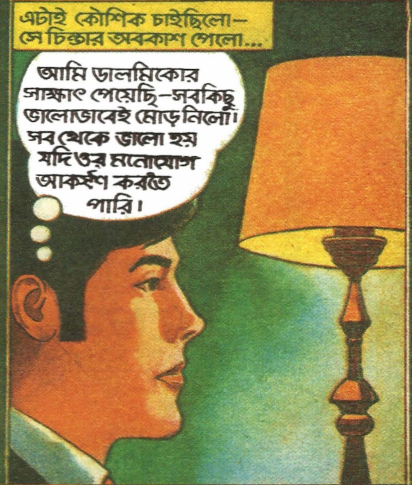
এটাই কৌশিক চাইছিলো— সে চিন্তার অবকাশ পেলো...

আমি ডালমিকোর সাক্ষাৎ পেয়েছি—সবকিছু ভালোভাবেই মোড় নিলো। সব থেকে ভালো হয় যদি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি।

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

চৈত্র ১৩৯১ ১৯৮৫

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

সমুদ্র শান্ত এবং উজ্জ্বল নীল...

সত্যি, পামেলা! সাঁতার কাটার অতি মনোরম জায়গা।

কিছুক্ষণ সাঁতারের পর ...

ওটা কি – মনে হয় এ জায়গার সঙ্গে ওটা আলাদা! কারখানা ?

হ্যাঁ, চিনির কারখানা... বাবা আমাকে বলেছেন যে, ওখানে প্রচুর চিনি পরিশোধন করা হয়!

সাঁতারের পর পামেলাদের বাড়িতে ফিরে...

এই যে, সেনর ডালমিকো! চিনি শোধনাগার দেখলাম– ভারী ইন্টারেস্টিং! চারধার ঘুরে দেখতে পারি কি?

একঘেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার–শুধুই যন্ত্রপাতি। এছাড়া আপনার আগ্রহ জাগাবার অনেক জিনিস আছে...

সেদিন রাত্রে হোটেলে নিজের ঘরে...

ডালমিকোর অসম্মতি বেশ বিনীত অথচ দৃঢ়... প্রধান দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি...

কৌশিক রায় বলছি... আজই অভিযানে বেরোচ্ছি...

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ ১৯৮৫

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

কার্ত্তিক ১৩৯২ ১৯৮৫

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

পালাচ্ছেন কোথায়, সেনর ডালমিকো! আপনার সঙ্গে আমার ফয়সালা এখনো বাকি রয়ে গেছে!

আহ্!

কিন্তু কৌশিকের পায়ের আঘাতে ডালমিকো ছুটে আসা সশস্ত্র জনতার সামনে গিয়ে পড়লো...

জানোয়ারের দল! তোমরা আমাকে অগ্রাহ্য করছো? এসব থামাও!
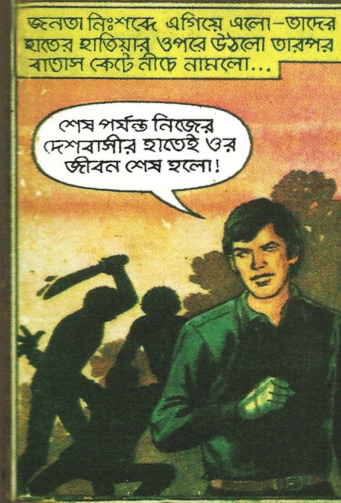
জনতা নিঃশব্দে এগিয়ে এলো—তাদের হাতের হাতিয়ার ওপরে উঠলো তারপর বাতাস কেটে নীচে নামলো...

শেষ পর্যন্ত নিজের দেশবাসীর হাতেই ওর জীবন শেষ হলো!

ওঃ, কি ভয়ানক!

হ্যাঁ, কিন্তু সব মিটে গেছে...আমরা ঠিক আছি...

প্রধান দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলো কৌশিক...

আমি কৌশিক বলছি...

শেষ

ফাল্গুন ১৩৯৪ ১৯৮৮
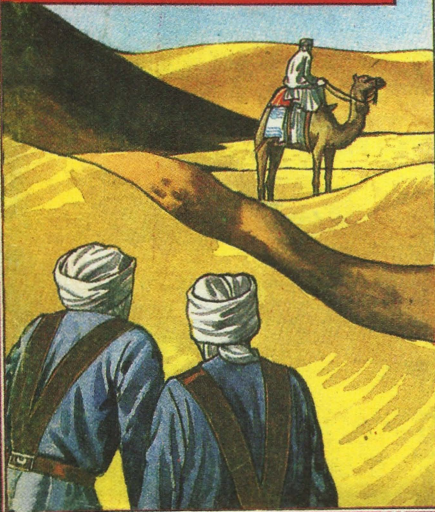
ভয়ঙ্কর অভিযান

নজরদারির ঐ দুজন আক্রমণ করার জন্য এগোলো...
রাইফেল ব্যবহার করো না আমরা ওকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে চাই! তুমি ওর ডান দিক সামলাবে!

আক্রমণকারীদের আসা শুনতে পেয়েছিলো দিবাকর মোকাবিলার জন্যে সে ঘুরলো!
ধরো ওকে!

কিন্তু দিবাকরের তৎপরতা অনেক বেশী...
তুমি নড়াচড়া করতে অনেক সময় লাগাও হে বন্ধু...
আরঘ্‌হ্‌!

বড় বেশী আস্তে নড়াচড়া করো!
আগ্‌হ্‌!

ভয়ঙ্কর অভিযান

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫ ১৯৮৮

ভয়ঙ্কর অভিযান

দীর্ঘ সময়ের জন্য ও এখন চুপচাপ থাকবে!

অন্য জন এবার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো...

তারপর সবেগে নেমে পায়ের প্রচণ্ড আঘাতে দিবাকরকে ধরাশায়ী করে ফেললো।
ওওফ্!

ওযে ট্রান্সমিটারটা ব্যবহার করছিলো সেটা কোথায়?
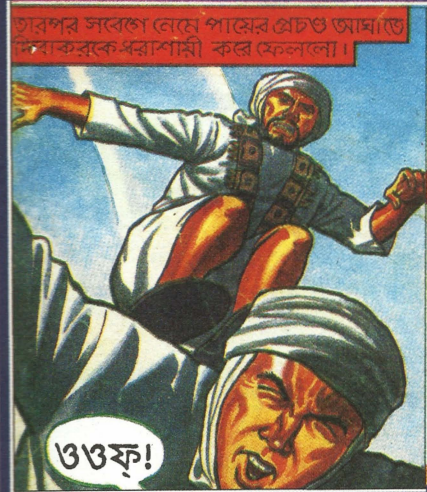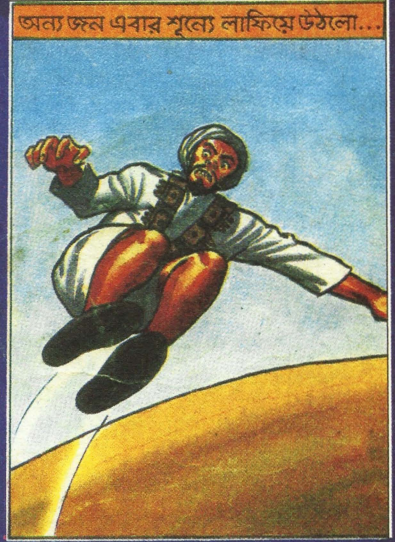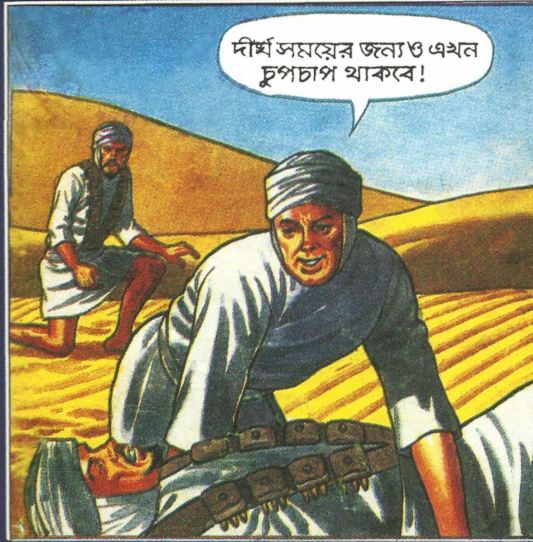
ভয়ঙ্কর অভিযান

কিন্তু আতঙ্কিত উটের পায়ের আঘাত ট্রান্সমিটারটাকে বালির তলায় চাপা দিয়ে দিলো...
হ্যালো, হ্যালো, প্রধান দপ্তর থেকে বলছি... তুমি কি দিবাকর মিশ্র?

এদিকে প্রধান দপ্তরে দিবাকরের জরুরী ডাক আতঙ্কে উত্তেজিত করলো!

হ্যালো, হ্যালো... দিবাকর মিশ্র তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

কোন উত্তর নেই, কৌশিক! ওখানে কিছু ঘটেছে!

আপনি ঠিকই বলেছেন। ও নিশ্চয় কোন বিপদের মধ্যে পড়েছে— মরুভূমির জায়গাটা ভয়ানক নির্জন হতে পারে। বেচারা দিবাকর!

কৌশিক! মনে হচ্ছে দিবাকর কোন কঠিন সমস্যায় পড়েছে,— তুমি আজই লাগোস রওনা হয়ে যাও। ওখানে কি গোলমাল হলো যত তাড়াতাড়ি পারো খোঁজ নিয়ে এখানে সংবাদ পাঠাও!

ভয়ঙ্কর অভিযান

লাগোসের পথে উড়লো কৌশিক...
থেমে থেকো না, দিবাকর! আমিও আসছি।
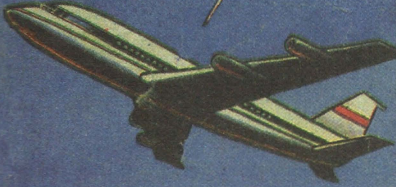
...এবং রাতের বিমান যখন কৌশিককে নাইজিরিয়া নিয়ে এলো... মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানে তখন দিবাকরের চেতনা ফিরে আসছে!

ওহ্, আমার মাথাটা—আমি কোথায়? আপনি কে?
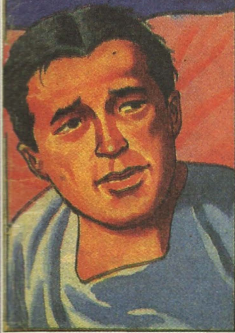
সেটা না জানলেও চলবে। যেটার পিছনে তুমি ঘুরছো সেই আখরোটটা কোথায়?
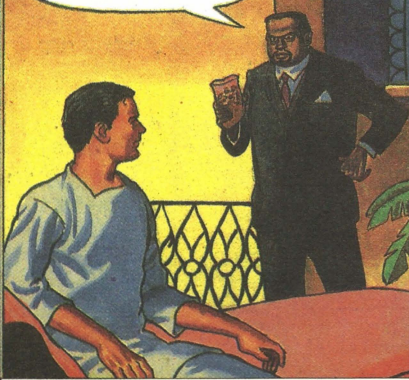
তাড়াতাড়ি আমার কথার জবাব দাও!
ওটা আপনার হাতের ঐ আখরোটের ব্যাগের মধ্যে থাকতে পারে।
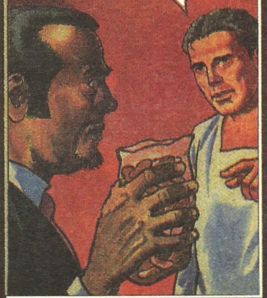
ভয়ঙ্কর অভিযান

দিবাকরের কথায় যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো!
রসিক লোক! এঃ! এই নাও শয়তান নোংরা চর—আমি শীগগিরই তোমার রসিকতা বন্ধ করছি!

কেটে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো বিদেশী কুত্তা!

রাগের বশে ওকে হত্যা করবেন না। তাহলে মাইক্রোফিল্মের আর কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

তুমি ঠিক কথাই বলেছো, লাবাজো! বেশ, এবার তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু খবর চাই, বন্ধু!

ভয়ঙ্কর অভিযান

এই বেয়াড়া চরটাকে গর্তের কাছে নিয়ে যাও— শিগগিরই ওকে আমরা কথা বলাবো!
ঠিক আছে! এটা খুব আমোদের ব্যাপার হবে!

গর্ত দেখে দিবাকরের রক্ত হিম হয়ে গেলো...
এরা সব পবিত্র সর্প হে বন্ধু— এদের কামড় খুবই সাংঘাতিক! এবার তোমার আখরোটের কথা মনে পড়ছে?

দুঃখিত, ভার্গো! আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারলাম না... তবে তুমি এটার যা বিরাট মূল্য দিচ্ছ তাতে এটা নিশ্চয়ই বিশেষ আখরোট!

বেশী চালাকি করো না, ভারতীয় চর। আমরা জানি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর একটা মাইক্রোফিল্ম নেবার জন্যে তুমি এখানে হাজির হয়েছো।
ভালো গল্প, ভার্গো! কিন্তু আখরোট আসছে কোত্থেকে?

আমি বলেছি আমার সঙ্গে কোন চালাকি করবে না!...

ভয়ঙ্কর অভিযান

পৌষ ১৩৯৫ ১৯৮৮

ভয়ঙ্কর অভিযান

মিনিটের কাঁটা সরছে...দিবাকর একটু একটু করে ভয়ঙ্কর সাপেদের কাছে নেমে আসছে।

দড়ি ওর কব্জিতে কামড় বসাতে লাগলো...উদ্বিগ্ন দিবাকর উদ্ধার পাবার আশা করলো...
...একটা পায়ের শব্দ, ভাগ্যে কি ফিরে আসছে?

ধরে থাকো। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

একটু পরেই দিবাকর পাক খেয়ে বেগে ওপরে উঠে এলো!
কে আপনি জানিনা, কিন্তু আপনি আমাকে আজ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

সাপের গর্তটা কেউ দেখে ফেলার আগেই আপনি এখান থেকে পালিয়ে যান।

ভয়ঙ্কর অভিযান

নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে দুর্গের মধ্যে দিয়ে এগোতেই ...
একটা পুরোনো যুদ্ধের-সময়ের হাফ-ট্রাক ওটা বেরোতে কাজ দেবে!

...কিন্তু আগে ঐ পাহারাদারের ব্যবস্থা করতে হবে!

দিবাকর প্রাঙ্গন বরাবর দেয়াল বেয়ে নামতে লাগলো...
সতর্ক ভাবে করতে হবে প্রহরীরা যাতে জেগে না ওঠে!
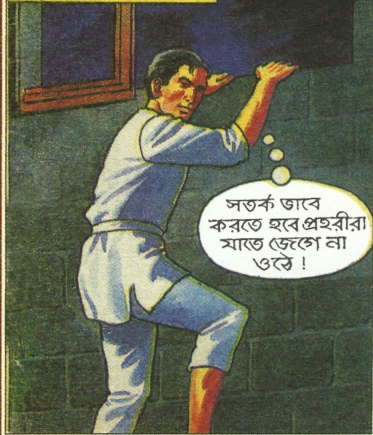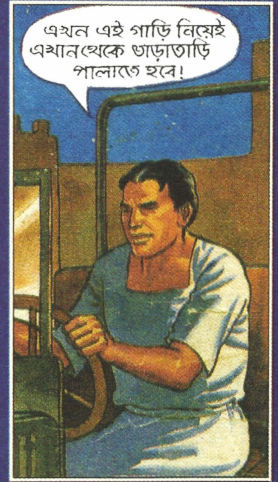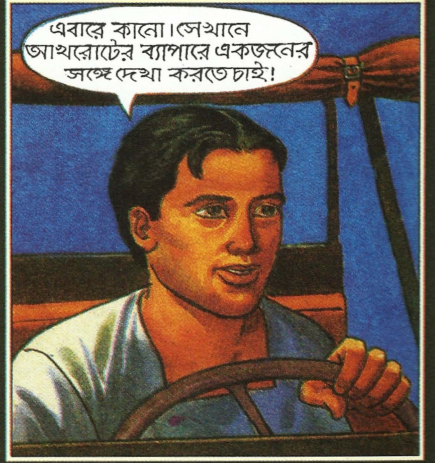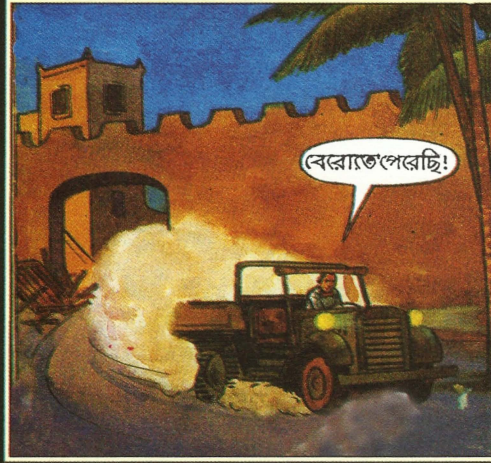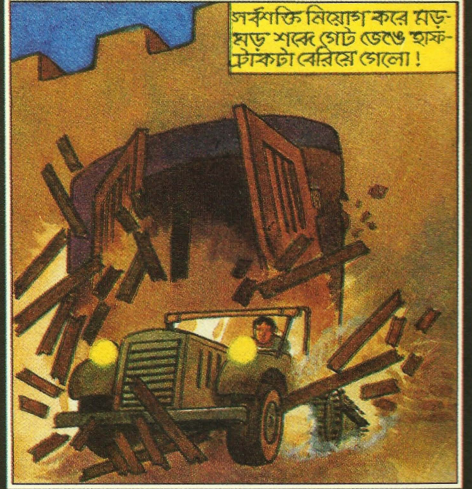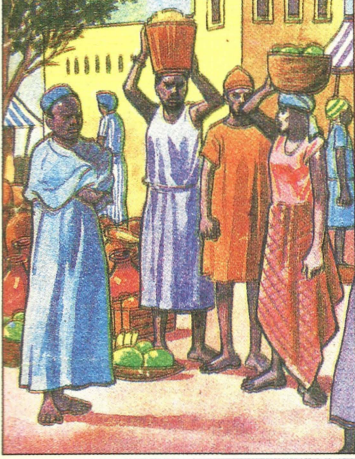
নিঃশব্দে ওকে কাবু করে ফেলতে হবে!

ভয়ঙ্কর অভিযান

হিসাবটা সমান সমান হলো, বন্ধু ল্যাবাজো!
আ-আগ্‌হ্‌!

মরেনি—তবে বেশ কিছু সময় এখানে শুয়ে থাকতে হবে।

এখন এই গাড়ি নিয়েই এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে!

আমি এবারে গেট আক্রমণ করতে যাচ্ছি!

...আচমকা হাফ-ট্র্যাকটা উঠোন পেরিয়ে গেটের দিকে চললো...
থামো থামো!

ভয়ঙ্কর অভিযান

থামো! না হলে আমি গুলি করবো।
নির্দেশ না মেনে গতি আরো বাড়িয়ে দিলো দিবাকর...

সর্বশক্তি নিয়োগ করে মড়-মড় শব্দে গেট ভেঙে হাফ-ট্রাকটা বেরিয়ে গেলো!

বেরোতে পেরেছি!

এবারে কানো। সেখানে আখরোটের ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই!

ভয়ঙ্কর অভিযান

পরদিন কানোর বাজারে...

... কৌশিক রায় তার অনুসন্ধান শুরু করলো...
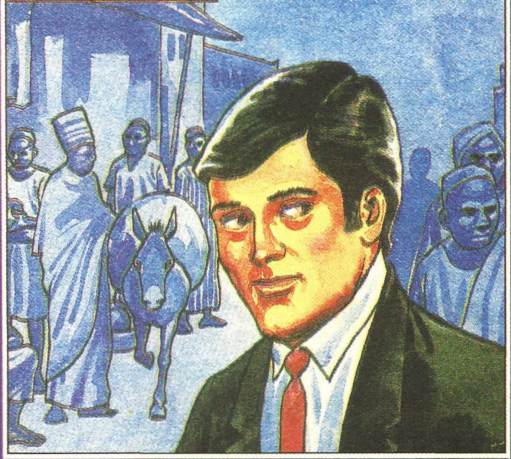
...কৌশিক রায় স্মরণ করলো দিবাকরের শেষ বার্তা ভারতের প্রধান দপ্তরে এসেছিলো মরুভূমি থেকে— তার মনে হলো সেখানে যাবার জন্যে সে নিশ্চিত উট ভাড়া করেছিলো!...
উট ভাড়া পাওয়া যায়
বিশেষ সুবিধায় ঔষধ
দিবাকর এখান থেকেই উট ভাড়া করেছিলো!

আসুন, আসুন! আপনি কি জু-জু ম্যাজিক কিনতে চান?

ভয়ঙ্কর অভিযান

আষাঢ় ১৩৯৬ ১৯৮৯
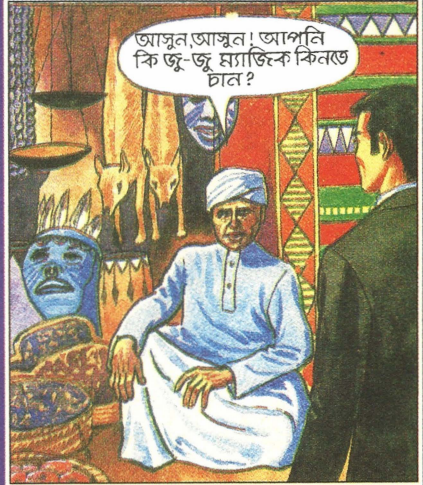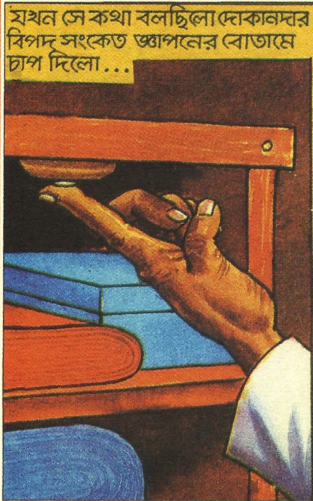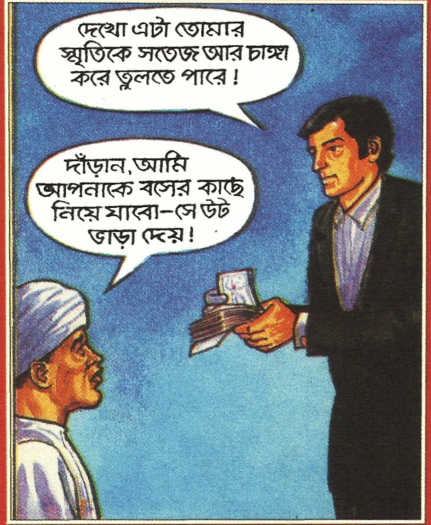
ভয়ঙ্কর অভিযান

দোকানী আর কৌশিক তাদের গন্তব্যস্থলে বাজারের ভিতর দিয়ে চলল, আর তারা যখন একদল ছেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল . . .
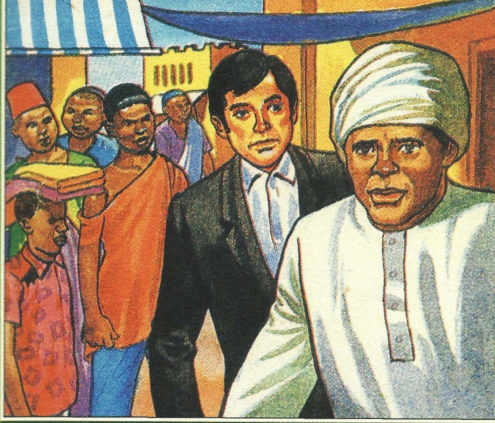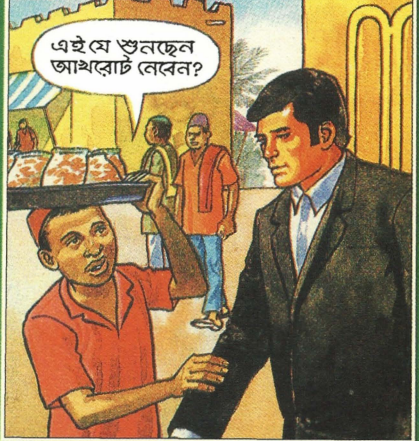
. . তাদের মধ্যে একজন কৌশিকের হাত আঁকড়ে ধরলো . . .
এই যে শুনছেন আখরোট নেবেন?

তুমি কি আখরোটের কথা বললে?
হ্যাঁ! ভালো আখরোট? আপনি খুঁজছেন অ্যাঃ? বড় ব্যাগ মাত্র দশ পিয়াস্টারস!

ঠিক আছে বাচ্চু, তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি হলো—একটা ব্যাগ দাও!
আখরোট

ভয়ঙ্কর অভিযান

ভাদ্র ১৩৯৬ ১৯৮৯

ভয়ঙ্কর অভিযান

এর জন্য তোমাকে পরিতাপ করতে হবে, বন্ধু!
তুমি একটি মোটা বুদ্ধুরাম!

ভার্গোর সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলেনি!
বাজি রাখছি তোমার উটেরা বলে!

প্রহরী এই লোকটাকে ধরো!

পরমুহূর্তে...
আহ! বড় বন্ধুকেরা দৃশ্যে এসে যোগ দিলো, এঃ?

এটা কি হলো? আমি শুধু আমার বন্ধুর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম আর মাঝখান থেকে উটকো গোলমালে জড়িয়ে গেলাম!

আহ! আমার কবল থেকে যে পালিয়েছে সেই গুপ্তচরটা তোমার বন্ধু! তাহলে তুমিও ওদের একজন এবার বলো যে জন্যে তুমি এসেছো সেই মাইক্রোফিল্ম কোথায়?
মাইক্রোফিল্ম!!— কিসের মাইক্রোফিল্ম?

ভয়ঙ্কর অভিযান

সেই বিশেষ আখরোট-
সেটা কোথায় এখনি
আমাকে বল!

এই তো এক ব্যাগ
রয়েছে নিজেই নিয়ে
নিন!

ক্রুদ্ধ ভাগো তার হাতের ব্যাগটা
কৌশিকের দিকে ছুঁড়ে দিলো...
বিদেশী কুত্তা!

কৌশিক এবার তার নিজের
আখরোটের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলো
ভাগোর দিকে...
এরকম ব্যাপার
হলে আমারটাই
নিন!

কৌশিকের লৌহ মুষ্টি থেকে
গুলি ছুটে আখরোটের
ব্যাগে রাখা গ্যাস ক্যাপসুল
ফেটে গেলো!

আগ্‌হ্‌!

ভয়ঙ্কর অভিযান

আমি পিছন দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা খুঁজে দেখি!

ওহ্, ওহ্, এখানকার আবহাওয়া খুবই গরম হয়ে উঠছে!

দুঃখিত, বন্ধুরা! আমাকে যেতেই হবে!

ওকে দেখতে পাচ্ছি না—ও বাজারের ভিড়ের ভিতর দিয়ে সরে পড়েছে!

আবার তুমি! দুঃখিত, আমি শুধু একটা বিশেষ আখরোটের জন্যে আগ্রহী।
একটা আখরোট? আসুন আমার সঙ্গে।
আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি!

শহর প্রাচীরের বাইরে ছেলেটি পথ দেখিয়ে কৌশিককে একটা ত্রিপল চাপা বড় পিরামিডের কাছে নিয়ে গেলো।
এই! পিরামিডের নীচে কি আছে?
আখরোট আছে, সাহেব! আখরোট!

ভয়ঙ্কর অভিযান

আখরোট তেলের জন্যে- কিন্তু আমি একজনকে একটা বিশেষ আখরোটকে এই থলেতে রাখতে দেখেছি!

তুমি এ ব্যাপারে এতো নিশ্চিত হলে কি করে যে এটাই সেই থলে?

বিদেশী বন্ধু! আমি সেই লোককে এই চিহ্নটা দিতে দেখেছি!

হঠাৎ...
দারুণ কাজ, বাচ্চু... আরে এ আবার কি?

খুব শান্ত আর সহজভাবে এখান থেকে কেটে পড়ো! বুঝেছো?
আরে, এই গলার স্বর আমার জানা! আমরা একই সংস্থার লোক!

ভয়ঙ্কর অভিযান

আমার জানা উচিত... কি তোমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে, কৌশিক?
দপ্তর প্রধানের মনে হয়েছে মাইক্রোফিল্ম পেতে অবশ্যই তোমার কিছু সাহায্য দরকার! ...আর তাই আমি এখানে...

এই নাও তোমার অসাধারণ কাজের জন্যে পুরস্কার!
...ঠগগুলো হাজির হবার আগেই থলিটা নিয়ে নিতে হবে!

কিন্তু হঠাৎ...
বড়ো দেরী করে ফেলেছো, বন্ধুরা— আমি ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে হাজির থাকি!

হাত ওপরে তোল আর কোন চালাকি করবে না!
চটপট এই থলির পিরামিডের পিছনে চলে যাই!

তোমরা খুবই চতুর চর সন্দেহ নেই—কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমরা নিশ্চিত মরবে... কিন্তু এখন আমি জানি কোথায় মাইক্রোফিল্ম আছে...!

...কিন্তু আখরোটের বস্তার পিরামিডের আড়ালে!
আর একটা প্যাঁচ!

ভয়ঙ্কর অভিযান

চৈত্র ১৩৯৬ ১৯৯০

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

কাহিনী– দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্ররূপ – নারায়ণ দেবনাথ
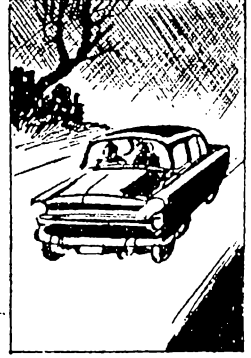
ইন্দ্রজিৎ রায় গোয়েন্দা কমিক্স সিরিজের প্রথম গল্প। প্রকাশ ১৯৬৯ অক্টোবর শারদীয়া কিশোর ভারতী পত্রিকায়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে (১৩৮৮ আশ্বিন) অযোধ্যা এন্টারপ্রাইজ তিনটি খণ্ডে এই সাদা-কালো কমিক্সগুলি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে প্রকাশনা সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

কিন্তু শিকারী কুকুরের মত তার পিছু নিয়েছে সশস্ত্র পুলিশ

ছুটন্ত গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ

দুম!
দুম!
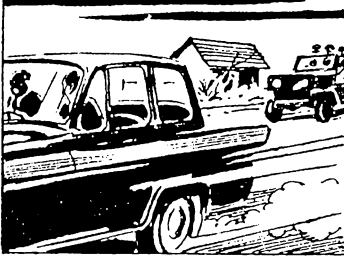
অব্যর্থ লক্ষ্য

দৌড়ে আসে পুলিশ

কিন্তু ভোঁ ভাঁ
পাখী পালিয়েছে দেখছি!
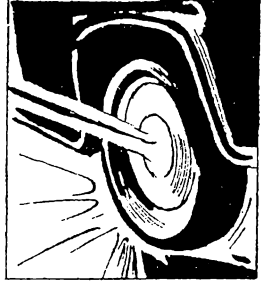
ওদিকে পুলিশের গাড়িতে
টুঁ শব্দটি করেছ কি—

হতভম্ব পুলিশের নাকের ওপর দিয়ে তাদেরই জীপ নিয়ে অদৃশ্য হল পলাতক

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

পরদিন
এক জীপ আর্মড পুলিশ নিয়ে সামান্য একটা স্মাগলারকে ধরতেই নাস্তানাবুদ! রাবিশ!

কয়েকদিন পরে
ক্রিররিং!
ক্রিররিং!

হ্যালো! কে? ও গজেন! কি বললে? ওয়াটারপ্রুফ গায়ে? WHAT? কনস্টেবল ধ্যান সিং আধঘন্টা আগে তাকে এদিকেই আসতে দেখেছে? ও.কে.! ও.কে.!!

সুপার পিস্তল বার করে টেবিলে রাখলেন
সাব, একঠো ওয়াটারপ্রুফ লোগ আপকো পাশ—
ওয়াটারপ্রুফ! জলদি ভেজ দো!!

HANDS UP ব্ল্যাকি! ভেবেছিলে বার বার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়বে! আজ আর সেটি হচ্ছে না!
—কাকাবাবু, আমি—

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

চমৎকার! কাকাবাবু! জ্যাঠামশাই বলছ না
এ আমার বাপের ভাগ্যি! এবার আর অত
সহজে ভুলছি না। সেবার চক্রধরপুরে
তুমি আমার হবু জামাই সেজে এসে
হপ্তাখানেক আমারই কোয়ার্টারে
রাজভোগ খেয়ে—

অবশেষে আমারই
মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ
করে পালিয়েছিলে!
কিন্তু তোমার লীলা-
খেলার আজই ইতি—
এবার দেখি তোমার
চাঁদ মুখখানি একবার!

একি! এযে—
ইন্দ্রজিৎ!
তুমি! কি কাণ্ড!

দৈনিক সংবাদ
রহস্যোদ্ঘাটনে আন্তর্জাতিক
খ্যাতি সম্পন্ন গোয়েন্দা
ইন্দ্রজিৎ রায়কে তলব

তারপর কদিন ধরে ইন্দ্রজিৎ
রায়কে শহরের নামকরা সব
জুয়েলারী দোকানের সামনে
দেখা যেতে লাগল। কোথাও
পাক্কা সাহেবের বেশে—
য়েলারী

কোথাও মাড়োয়ারী—

কোথাও বা পাঞ্জাবীর
বেশে
য়েলা

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

দি গ্রেট জুয়েলার্স
দি গ্রেট জুয়েলার্স এর দোকান। একধারে বসে একটি লোক।

ঘন্টাখানেক এভাবে কাটিয়ে লোকটি কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায়
কত ?
চার রকম দশ করে।

লোকটা কাউন্টার পেরিয়ে ভেতরে যায়— দোকানে ঢোকে এক চীনাম্যান

ইয়া হু তিড়িং ? ইয়া হু তিড়িং ?
কি তিড়িং বিড়িং করছে রে বাবা !

ভেতরে যাওয়া লোকটি বেরিয়ে এসে অপলক ভাবে চীনাম্যানটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে

তারপরেই
সাবাশ্ ! গুরু তুমি ! চেনাই যায়না একদম !

তারপর দুজনে একটা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়

অদূরে আর একখানি গাড়িতে
হ্যালো, লালবাজার ! ইন্দ্রজিৎ রায় SPEAKING.....

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

আলোকিত শহর পেরিয়ে দুটি গাড়ি ছুটে চলেছে

একটা বাঁকে এসেই
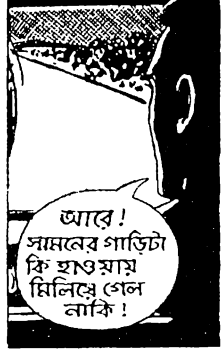
আরে! সামনের গাড়িটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

দূরের আকাশে লাল আলোর একটি বিন্দু
ওটা কিসের আলো!

দূরবীনে ধরা পড়ল রক্তরঙা বাতি বসান এক সৌধশীর্ষ

এমন সময়
যাক, ঠিক সময়েই এসে গেছেন।
ঐ টাওয়ারটাই আমাদের লক্ষ্য। আপনি ফোর্স নিয়ে এখানেই থাকুন, হুইস্‌ল্ শুনলেই—

বাঁদিকের ঝোপের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন ইন্দ্রজিৎ

সহসা তীব্র হিস্ হিস্ গর্জনে থমকে দাঁড়ালেন
হিস্‌স্! হিস্‌স্!
একি! সাপের চোখ কি অন্ধকারে জ্বলে?

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আঙুল
ঢুকিয়ে দিলেন
অজগরের চোখে

এযে হীরে !

ঘড় ঘড়
একি ! অজগরের মূর্তি দুফাঁক হয়ে যাচ্ছে, তার মানে গুপ্ত সুড়ঙ্গ !

পিপ ! পিপ !

হুইসল শুনে পুলিশ ছুটে আসে
এ সুড়ঙ্গ পথে নেমে দেখতে হবে।

সুড়ঙ্গ পথে সবাই এগিয়ে চলে

কিছুদূর এগুতেই সামনে চালকহীন লিফ্‌ট

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

ইন্দ্রজিৎ ভিতরে ঢোকা মাত্রই লিফট হু হু করে উঠতে সুরু করে
আরে আরে একি !

লিফট থামল একটা বড় হলঘরের সামনে

ঘরে ঢুকে পড়েন ইন্দ্রজিৎ
আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম মিঃ রায় !

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন ইন্দ্রজিৎ
কৈ, কেউ নেই তো !

সহসা একটা সিন্দুকের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে একটি মূর্তি
দাঁড়িয়ে কেন, বসুন মিঃ রায় !

ভয় নেই , পালাবোনা । সে ইচ্ছে থাকলে — কই , আপনি বসুন ।

অদূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসেন ইন্দ্রজিৎ

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

কিন্তু পরমুহূর্তেই
পিপ্! পিপ্!
ছ্যাং ছ্যাং ছ্যাং!
পড়তে পড়তেই হুইস্‌লে ফুঁ দিলেন ইন্দ্রজিৎ রায়

এখান থেকে বেরোবার একমাত্র উপায় ঐ ভেন্টিলেটর!

পকেট থেকে দড়ি বের করে ভেন্টিলেটর লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন

কড়াং!
আটকেছে!

আমার হুইস্‌ল্ শুনে পুলিশ এসে থাকলে—

আমার এই সংকেত ওদের চোখে পড়তে পারে!

বাইরে পুলিশ তখন সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। তাদের একজনের চোখে পড়ল
নিশ্চয়ই মি: রায় কোন বিপদে পড়েছেন!

অবশেষে ইন্দ্রজিৎ মুক্ত হলেন
খুব বেকায়দায় আটকে ফেলেছিলো— কিন্তু এখনই আমাদের এরোড্রোমে যেতে হবে। ব্ল্যাকিকে ধরার শেষ সুযোগ ওখানেই—

আবার পুলিশের জীপ ছুটলো দুরন্তবেগে

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

এরোড্রোমের কাস্টম হাউস। বৃদ্ধের ছদ্মবেশে ইন্দ্রজিৎ রায় বসে
CUSTOM H

খানিক পরে
বাঃ! কুকুরটা হাঁটছে তো বেশ!

কিছু মনে করবেন না, আচ্ছা আপনার কুকুরটা কোথাকার?
খাঁটি বিলিতি মশাই! ভারী INTERESTING কুকুর!

হ্যাঁ সত্যিই INTERESTING! বিশেষ করে ওর হাঁটবার ধরনটা।
কেন বলুন তো?

কুকুরের পা তো হাঁটবার সময় কোণাকুণিই পড়ে, কিন্তু —

না না, পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। লক্ষ্মী ছেলেটির মত হাত তুলে দাঁড়ান!

আসুন মিঃ সান্যাল! HERE IS YOUR MAN!
আর হ্যাঁ, কুকুরটাও নিতে ভুলবেন না। মহা মূল্যবান ওটি! আসলে ওটা খেলনা আর ওর পেটেই যত বুদ্ধি!
শেষ

কাহিনী • চিত্রনাট্য • সংলাপ
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

• চিত্ররূপ •
নারায়ণ দেবনাথ

শ্রেষ্ঠাংশে
ইন্দ্রজিৎ রায়
চন্দ্রকোলী দাস • সুবীরা রায় • জীবন দত্ত • নিরাপদ মজুমদার • রমণীমোহন ঘোষ • রামতনু বসু • ডঃ হাজরা • তেজেশ বর্ধন • পরমেশ্বরী সিং • ধূলি মিত্তির
এবং
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড

বিশিষ্ট অতিথিশিল্পী
মাঃ নন্টে ও মাঃ ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ অঙ্কিত ইন্দ্রজিৎ রায় গোয়েন্দা কমিক্‌স সিরিজের শেষ গল্প। কিশোর ভারতী পত্রিকার ১৯৭৯ সালে পূজাবার্ষিকী ও অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত

হ্যাঁ, নিরাপদ। ছেলেবেলাতেই ও বাপ-মাকে হারায়। সেই থেকে আমার এখানে।
মামা-ভাগনে যেখানে, আপদ-বালাই সেখানে! খুব খাঁটি কথা।
কী বললেন?
বলছিলুম, ব্ল্যাক ডায়মণ্ড যেখানে, ইন্দ্রজিৎ রায় সেখানে।
ও। আমি যেন অন্যরকম— কী ধূলিবাবু? সব ভালো করে দেখে দিয়েছেন তো? নাকি দুদিনে যেতে না যেতেই আবার— ডাক্ ধূলিবাবুকে!
কী যে বলেন স্যার! ধূলি মিস্তিরের কাচে ওটি পাবেন না। সমস্ত একেবারে পাই টু পাই দেকে দিইচি।
বেশ। এখন তাহলে—
ও লাইন ফেলে দিতে হবে।
সে কী! এই যে বললেন দেখে দিয়েছেন?
না দেকলে আর বলচি কি স্যার। আপনার আগের মেকানিক ছেল, খগেন না কী নাম, সে-ই লাইনের বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দিয়েচে! এখন চলি স্যার। কাল দুকুরে আসব খন। ও লাইন ফেলে নতুন লাইন ফিট করে দিয়ে যাব।
ঠিক আছে। কালই কিন্তু কাজ শেষ করা চাই। খুবই অসুবিধা হচ্ছে আমার।
তা আর আমাকে বলতে হবে না স্যার।

উহুঁ, ওদিকে যাবেন না।
না, মানে—
বাথরুমে যাবেন তো? এক মিনিট। নিরু! নিরাপদ! কিছু মনে করবেন না, বাথরুমের ব্যাপারে আমি একটু খুঁতখুঁতে, আমি ছাড়া—
এই যে নিরু, এই ভদ্রলোককে একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দাও তো।
আসুন।
আপনার চাকর-বাকররা সব কোথায়?
রামকিশোরীর কাল থেকে দাঁতের গোড়া ফুলে ধুমজ্বর। ওপরের কাজকর্ম ও-ই করে। ও ছাড়াও দারোয়ান আছে দুজন।
আর?
আর যে সব কর্মচারী আছে, যেমন স্টেনো, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ম্যানেজার এরা কেউই এখানে থাকে না। দশটা-ছটা ডিউটি সেরে যে যার বাড়ি চলে যায়।
নিরাপদবাবু কী করেন? কাজকর্মের কথা বলছি।
'প্রেস অ্যাণ্ড এক্সপ্রেস'-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও।

তার মানে ওকে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা চলে। ভেরি ফাইন। এই বয়সেই—
হ্যাঁ, বরাবরই ও খুবই শাইনিং।
ষড়বিংশ মুদ্রণে।
ষড়যন্ত্র? কিসের ষড়যন্ত্র?
ষড়যন্ত্র নয়, বলছিলাম সম্প্রতি আমার 'ভূতচতুর্দশী' মহাগ্রন্থের ষড়বিংশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।
ওঃ, তাই বলুন! আমি বলি বুঝি... ঠিক আছে নিরু, তুই এখন যেতে পারিস।
বলুন মিঃ রায়, এখন কী করণীয়?
একেবারে জিরো আওয়ারে আমাকে খবর দিলেন! তাববারও তো কিছুটা— কাল সকালেই তো ক্যাশ ডাউন করতে বলেছে?
হ্যাঁ, টেলিফোনে তো সেই রকমই... কালই তো তেসরা?
হুঁ।... মিঃ দত্ত, আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়াই আপনার উচিত কাজ হবে।
কী বলছেন মিঃ রায়! অতগুলো টাকা এক অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্টের হাতে তুলে দেবো অকারণে?
অকারণে নয় মিঃ দত্ত, ফর ইওর লাইফস সেক। আমি বুঝি, আপনার মতো মাল্টিমিলিওনীয়ারের কাছেও ফাইভ ল্যাকস ফেলনা নয়। তার থেকেও বড় কথা, এ টাকা ওকে দেবার অর্থই হল তার কাছে সারেণ্ডার করা, ইনডাইরেক্টলি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। তবু হাতে সময় খুবই কম বলেই আমি আপনাকে এত বড় রিস্ক নিতে বারণ করছি। অন্য কোন ক্রিমিনাল হলে আমি বিন্দুমাত্র ভাবতাম না। বাট দিজ ইজ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড হুম আই নো বেস্ট।

এক কথায় দুর্বৃত্তকুলের ব্রহ্মাসুর এই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড, বুঝলেন কিনা গাঁটে গাঁটে দুর্বুদ্ধি একেবারে ঠাসা! সেই রহস্যময় সেই বাড়িটার আমল থেকে ব্যাটা কম জ্বালান জ্বালাচ্ছে আমাদের! তবে আমিও ছাড়বার পাত্র নই, একবার তো টেপেই ক্যাচ করে ফেললুম পাজীটাকে!
টেপে ক্যাচ! বলেন কী!
তবে আর বলছি কী! চাঁদনী রাতের বেলায়, বুঝলেন, আমার শব্দ-ধারিক যন্ত্রখানি বগলদাবা করে গুটিগুটি একপা, দুপা—
থাক সেসব কথা এখন। মিঃ দত্ত, ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম।
বড় স্বস্তি পেলাম মিঃ রায়, বাঁচালেন আমাকে!
বাঁচালাম আপনার টাকা, আপনাকে বাঁচাবার সময় এখনো আসে নি মিঃ দত্ত। এবার আমার কয়েকটা নির্দেশ আছে, মন দিয়ে শুনুন।
বলুন।
এক নম্বর—কাল ও পরশু আপনি এঘর ছেড়ে নীচে নামবেন না। দু নম্বর—অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।
অপরিচিত দুরস্থান, পরিচিত কারুর সঙ্গেই দেখা করছি না আমি।
মাই গুডনেস! আমরা তো আপনার পরিচিতেই মধ্যেই!
ও হ্যাঁ, তা-ই তো! দেখছেন তো, গোলমালে আমার মাথা ঠিক—

রাখতে হবে। তিন নম্বর— কাল-পরশু দু'দিনে আপনাকে না খেয়ে থাকতে হবে। কষ্ট হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় নেই।
নির্জলা উপোস!

না, জল খেতে পারেন। ওয়াটার বটলে পিউরিফায়েড ওয়াটার ভরে ঐ আলমারিতে চাবি দিয়ে রেখে দেবেন, তেষ্টা পেলে নিজে বার করে খাবেন মনে থাকবে?
আলবাত মনে থাকবে।

ও. কে. আজ চলি। কাল ঠিক সময়েই ঠিক জায়গায় প্রেজেন্ট থাকব আমরা।

পরদিন সকালে ইন্দ্রজিতের ড্রয়িংরুমে
কারেক্ট! এবার বলুন তো, মিঃ দত্তকে উপোস করতে বলেছি কেন?
ইয়ে.... মানে চিত্তশুদ্ধির জন্যে?

হল না। ওকে উপোসী রাখাটা হচ্ছে সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স— খুনের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পথটা মেরে রাখলাম এই করে।
আচ্ছা!

দেখুন, খুনের যে অসংখ্য প্রসেস আছে, সেগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এক, কোন কিছুর আঘাতে— তা সে লাঠিরও হতে পারে, বুলেটেরও হতে পারে, দুই, কোন কিছুর প্রয়োগে— তা সে খাইয়েই হোক কি ইনজেক্ট করেই হোক। মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা রেখেছি, ফলে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র বা অনুরূপ কিছু নিয়ে ঢুকতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে, আর কিছু না খেলেই দুনম্বর পথটাও কানা।
এতও ভাবেন, আশ্চর্য!

দত্তমশাইয়ের একটা মুদ্রাদোষ দেখলাম, খুবই অড্‌লুকিং। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে উনি কনস্ট্যান্ট ডানহাতের একটি আঙুল চুষে যাচ্ছিলেন। মার্ক করেছিলেন?
তা আর করি নি? এই বয়সে কোথায় তর্জনী-হেলনে সব কিছু চালাবি, তা নয়, বাচ্চা ছেলের মতো তর্জনী-লেহন করে চলেছে! একেবারে বেবীফুড টাইপ! ছ্যাঃ!
ক্রিড়িরিং ক্রিং!
ক্রিড়িরিং ক্রিং!

হ্যালো। শ্রীচন্দ্রকালী দাস সাহিত্যশ্রী কথা বলছি। আরে না না, কালীদাস নয়, শ্রীচন্দ্রকালী দাস সাহি—ও, দত্তমশাই?... ধরুন দিচ্ছি ডায়রাকে।

বলুন মিঃ দত্ত।... শুনুন, ও ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে! লেট হিম ডু হিজ ওয়ার্ক।... হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাখছি।

দত্তমশাই জানতে চাইলেন আজ দুপুরে ধূলি মিত্তিরকে তাঁর ঘরে অ্যালাউ করবেন কিনা।

সেখানে তখন
ডাগ্‌দারবাবু আসিয়েসেন।
উঃ জ্বালালে! এ কদিন প্রেশার চেক না করলে কী এমন— পাঠিয়ে দাও।

কেমন আছেন? একটু শুকনো দেখোচ্ছে যেন।
দেখাবে না? সকাল থেকে খালি জল খাচ্ছি আর বাথরুমে যাচ্ছি।

শুধু জল খাচ্ছেন! কেন?
মিঃ রায়ের সেরকমই—
যাচ্চলে, বলেই ফেলেছিলাম একটু হলে!
কে মিঃ রায়? ফিজিশিয়ান? কী বলেছেন তিনি?
না না, বলেন নি কিছুই, খাইয়েছেন জোর। কাল রাত্রে তাঁর ওখানে ডিনারের...
তা-ই বলুন! স্টম্যাক আপসেট! আজ টানা উপোস, কেমন?
হোপলেস! নিন, শুয়ে পড়ুন।
সেদিন সন্ধ্যায়
মৃত ব্যক্তির লেখা এই স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সবশেষে এই ঘরে আসেন তেজেশ বর্ধন—বিকেল চারটে ছত্রিশে। ছিলেন চারটে পঞ্চান্ন পর্যন্ত এবং জীবন দত্তের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ হয়। যাবার আগে তেজেশবাবু মিঃ দত্তকে দেখে নেবেন বলে শাসিয়ে যান।...তেজেশবাবু?
বলুন।

আপনাদের মধ্যে কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল সে সবে আমি যাব না। আমি শুধু জানতে চাই— আপনার হুমকির সঙ্গে মিঃ দত্তের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে কী?
কী বলতে চান আপনি?
আমি জানি, আপনি চলনে-বলনে সবসময়েই আপনার নামের প্রতি সুবিচার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার কাছে তেজ দেখিয়ে তো লাভ হবে না তেজেশবাবু, উলটে আপনি মুশকিলে পড়বেন।
বল, মিঃ রায় যা জানতে চাইছেন, তার জবাব দাও।
আচ্ছা অভদ্র লোক তো!
উনি আপনাকে কিছু বলছেন না স্যার, আমাকে বলছেন। ওর চাউনিই ওইরকম।
অঃ! বক্রলোচন!
দেখুন, বড়বাবু ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তার মৃত্যু—
ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন।... আপনারা সকলেই যেতে পারেন।
...জীবন দত্তমশাই যে কতটা বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাবধানী মানুষ ছিলেন, এই স্টেটমেন্টই তার প্রমাণ। আমিও যথাসম্ভব গার্ড নিয়েছিলাম, তবু কোন এক অলক্ষ্য ছিদ্রপথে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এসে তার কাজ হাসিল করে চলে যায়! ঘটনাটা আমার পক্ষে যে কতখানি গ্লানিকর তা আমি বোঝাতে পারবো না।
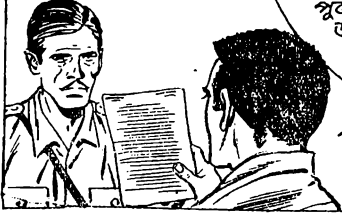
মিঃ দত্তের মৃত্যুর সময়টা ঠিক আঁচ করতে পারছেন ?
পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট না পেলে সেটা সঠিক বলা শক্ত। তবে রাফলি সোয়া পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার ভেতর। তেজেশবাবু এ ঘর থেকে গেছেন ফোর ফিফটি ফাইভে, কেমন? "তেজেশ চলে যাবার পর বেশ উইক ফীল করতে লাগলাম। উপোসী শরীরে অতটা উত্তেজনা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। বাথরুমে গিয়ে বেশ করে ঘাড়ে মাথায় জল দিতে হবে। বাথরুমের সুইচ অন করতে গিয়ে সুইচ পেলাম না। তাকিয়ে দেখি, আরে, সুইচ নেই। ধূলি মিস্তির কি তবে পুরোনো লাইন ফেলতেই সারাটা দুপুর কাটাল ? রেগেমেগে তাকে ডাকতে পাঠাব, হঠাৎ খেয়াল হতে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, এই তো সুইচ বসিয়েছে, তবে বাঁ দিকে নয়, ডাইনে, আরে আরে, এই পয়েন্টটা তো প্রথমবার খেয়াল করিনি!... ইন্টারেস্টিং! বাঁয়ের সুইচ ডাইনে... বাঁয়ের—
এক্সকিউজ মি মিঃ রয়, এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।
তুচ্ছ? তাহলে। তবু কেন জানি না, আমার মন বলছে, দেয়ার ইজ সামথিং ইন ইট।...আলো আসছে। তবে তা এত ফেন্ট যে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
আমিও যেন কিঞ্চিৎ আলোকাভাস পাচ্ছি ভায়রা।
বলে ফেলুন।
দত্তমশাই তড়িদ্ধত হন নি তো? মানে—
বুঝেছি। আপনি বলতে চাইছেন, জীবন দত্ত সুইচ অন করতে গিয়ে এক দফা তড়িৎ সেবন করে বাথরুমে গেলেন, বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুইচ অফ করবার সময় আর এক দফা তড়িৎ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বিছানায় গিয়ে বসলেন, এবার বৈদ্যুতিক, থুড়ি, তাড়িতিক প্রেরণায় কয়েক লাইন স্টেটমেন্ট লিখলেন এবং তারপরই তাঁর টনক নড়ল—ইস্, বড্ড অপরাধ করে ফেলেছি তো, দু-দুবার তড়িৎ খেয়েও বেঁচে আছি! এইভাবে দু-দুবার তড়িৎগ্লাস করে হত হলেন তিনি, অর্থাৎ কিনা তড়িদ্ধত! কেমন?... আমরা উঠছি মিঃ তালুকদার, আপনি যাবার সময় এ ঘরটা সিল করে যাবেন। আর হ্যাঁ, পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটা আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

পরদিন সকালে
অনেকদিন ডান্স ড্রামা দেখা হয়না। কাল রবীন্দ্র সদনে 'শ্যামা' আছে গেলে হয়।
বুঝলেন না জামাইবাবু, কারেন্ট খাইয়ে খুন করার অর্থই হচ্ছে নিজেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া — এই আমিই হচ্ছি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড অতই কাঁচা!
কারা করছে?
করছে নতুন একটা গ্রুপ। তবে সমালোচনার খানিকটা যা তুলে দিয়েছে, তাতে মনে হয়—
দেখি কী লিখেছে।...
হুঁ, এই তো। "শ্যামার ভূমিকায় নবাগতা শিল্পী বৈশালী রায় চরণপাতের সাবলীলতায় রকমারি মুদ্রার নিপুণ প্রয়োগে—"
দাঁড়াও, দাঁড়াও! কী পড়লে যেন? রকমারি মুদ্রার নিপুণ প্রয়োগে—

কী হয়েছে তাতে
না, হয় নি কিছুই। আমি ভাবছি ঐ মুদ্রার ব্যাপারটা। নাচের বেলায় এটা গুণ, অথচ সাধারণভাবে এটা—
পেয়েছি! পেয়েছি!!
কী হল?
আয়্যাম আ ফুল! আয়্যাম—
ক্রিড়িরিং ক্রিং
ক্রিড়িরি ক্রিং

হ্যালো! ইন্দ্রজিৎ রায় স্পিকিং!... পাঁচটা সাতাশ মিনিটে?... বিষক্রিয়ায়?...শুনুন মিঃ তালুকদার, আমি এখুনি আসছি।

আমাকে এখুনি—
এ কী, তোমরা!

পরদিন বিকালে
এবার যে কূট চালটি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড চেলেছে তা তুলনাহীন।

কিন্তু বন্ধুগণ, ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তো বিধাতা নয়, সে মানুষ। তার আশ্চর্য বুদ্ধি যেমন আছে, সেই সেই বুদ্ধির তেমনি সীমাবদ্ধতাও আছে।
কী ধূলিবাবু? কিছু বলবেন?
লাইনটা দেকতে এয়েছিলুম। আচ্ছা, পরে আসব না হয়।
এসেছেন যখন, তখন আপনিও বসুন না। বেশীক্ষণ লাগবে না আমাদের।

মিঃ তালুকদার এ ঘর সিল করে চলে যাবার পর রাতের অন্ধকারে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে পাঁচিল টপকে এ বাড়ীতে এসেছিল ব্ল্যাক ডায়মণ্ড খুনের চিহ্ন লোপ করবার জন্যে। ঘটনাচক্রে আমার এই ক্ষুদে দুই বন্ধুও তখন এখানে উপস্থিত, কাউকে না জানিয়ে এই খুনের তদন্ত চালাবে ভেবেছিল তারা। এটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, নন্টে আর ফন্টে সে রাতে যদি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের উপর আচমকা চড়াও হয়ে তার পকেট থেকে এই মন্ত্রটি—
– হাতিয়ে নিতে না পারত, তবে খুন কীভাবে হয়েছে বা খুনী কে সেটা বোঝা গেলেও প্রমাণাভাবে খুনীর হাতে হাতকড়া পরানো শক্ত হত। সেদিক থেকে আমার এই লিটল ফ্রেণ্ডদের কাছে আমি গ্রেটফুল।
আমি কি এখন আসতে পারি, মিঃ রয়?
সরি ডঃ হাজরা।... এই মন্ত্রটা ব্ল্যাক ডায়মণ্ড সে রাতে নিয়ে এসেছিল গোটা সুইচবোর্ড খুলে নিতে এবং এখানেই তার ভুল হয়েছিল।

সুইচে মাখানো বিষ মুছে ফেলার জন্যে এক টুকরো ন্যাকড়াই ছিল যথেষ্ট। তা না করে— না না, অস্থির হয়ে লাভ নেই ধুলিবাবু ওরফে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। মিঃ তালুকদার!

পল্টন সিং! উনকো হাতমে হাতকড়া লাগাও!

মুদ্রাদোষ যে সময় সময় কতখানি মারাত্মক হতে পারে, জীবন দত্ত সেটা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন। তার মুদ্রাদোষটাকে আশ্চর্যভাবে কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড সুইচবোর্ডটাকে বাঁ দিক থেকে তুলে ডাইনে বসিয়ে দেয়, যার ফলে বাথরুমে যেতে গেলে জীবনবাবুকে ডান হাতটি ব্যবহার করতে হয়। ও.কে. মিঃ তালুকদার, আমরা চলি। রবীন্দ্রসদনের টিকিট কাটা আছে আবার। কাম অন মাই লিটল ফ্রেণ্ডস! তোমরাও যাবে।

ছবিতে
বিবেকানন্দ

আঁ- আঁ- আঁ- ওঃ!
পিশাচী! শয়তানী!

পদাঘাতে উত্তেজিত হয়ে
রাজকুমার তখুনি তাঁকে
আক্রমণ করলেন।

দুর্গেশনন্দিনী

দিল্লীর সিংহাসনে চিন্তিত মুখে বসে আছেন মোগল সম্রাট আকবর। কারণ, পাঠান কতলু খাঁ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর কার্যত: দখল করে নিয়েছে।
মহারাজ মানসিংহ। বাংলা-বেহারের ভার গ্রহণ করুন আর উড়িষ্যা উদ্ধার করুন।
যে আজ্ঞে সম্রাট!

মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ কতলু খাঁর শিবিরের সমস্ত খবর নিতে এসেছিলেন উড়িষ্যায়।
পিতা মহারাজ মানসিংহের কাছ থেকে নিজেই চেয়ে নিয়েছি কর্মভার। সন্ধ্যা হয়ে গেল এখন আশ্রয় পাই কোথায়?

গড় মান্দারণের কাছে বিষ্ণুপুর। সেইখানে কতলু খাঁর শিবির। অশ্বারোহী জগৎসিংহ বিষ্ণুপুর থেকে গড় মান্দারণের পথে। তুমুল ঝড়বৃষ্টি, রাতের অন্ধকার।
কি এ? ঘোড়া হোঁচট খেল কিসে? নেমে দেখতে হচ্ছে।

জগৎসিংহ লক্ষ্য করেন, পাথরের সিঁড়িতে পা বেধে ঘোড়া হোঁচট খেয়েছে। সিঁড়ি এক দেবমন্দিরের।
এযে দেখছি ভেতর থেকে বন্ধ! কে আছেন ভেতরে? দোর খুলুন।

দোর খুলে দেওয়ায় জগৎসিংহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। দেখতে পান, শৈলেশ্বরের পেছনে বসে আছে সুন্দরী তিলোত্তমা ও তার চেয়ে বেশী বয়স্কা বিমলা। ঈষৎ অবগুন্ঠিতা তিলোত্তমা সঙ্কুচিতা।
এযে দেখছি অপূর্ব সম্মিলন!
কিলা দেখছিস কি? শিবসাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি নাকি?
ধ্যেৎ! তুমি মরো!

জগৎসিংহ ওঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ওরা পরিচয় দিলেন না। জগৎসিংহও তাঁর পরিচয় জানালেন না। খানিক বাদে জলঝড় কমে এল।
এখন ঝড়বৃষ্টি কমেছে। রাতও বেশী হয়েছে। বাড়ী যেতে চান তো আমি আপনাদের রেখে আসতে পারি।
কিন্তু কার সাথে এসেছি জিজ্ঞেস করলে কি বলবো?
বলবেন আমরা মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে এসেছি।
জগৎসিংহ

যৌবনে বীরেন্দ্রসিংহ পিতার অমতে বিবাহ করায় পিতা তাঁকে তাঁর গড়মান্দারণ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তখন দিল্লী যাত্রা করেন যুদ্ধবৃত্তি গ্রহনের আশায়। বীরেন্দ্রসিংহের সেইসব কথাই মনে হচ্ছিল।

সত্যিই পিতা খুব স্নেহপ্রাণ ছিলেন। আমি যখন ছিলাম না, পর্ণকুটীর থেকে আমার বিবাহিত পত্নীকে এখানে আশ্রয় দেন। তিলোত্তমাকে জন্ম দিয়ে সে পরলোকে গেছে। পিতাও আজ নেই---

সবচেয়ে বড় লাভ, গুরুতুল্য ঋষি অভিরামস্বামীকেও দিল্লী থেকে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মাতৃহারা কন্যা তিলোত্তমাই একমাত্র সমস্যা।

অভিরাম স্বামী তাঁর কুটীরে পড়াশুনায় রত। সহসা বিমলার প্রবেশ।

মন্দিরে সাক্ষাতের পনেরো দিন পরে। আজ বিমলা সেখানে যাবে তাই----

বীরেন্দ্রসিংহের কাছ থেকে বিমলা আশমানির কাছে এল।

আশমানি! আমার সঙ্গে তোমাকে আজ একটু যেতে হবে। কিন্তু সেকালের কোন লোক, যেমন জগৎসিংহ, সে যদি তোমায় দেখে তাহলে তোমায় চিনতে পারবে কি?

নিশ্চয় পারবে। কিন্তু কুমারের সঙ্গে কি দেখা হবে?

দুর্গেশনন্দিনী

বিদ্যাদিগ্গজ কথা কয়েছে, খাওয়া ফেলে উঠে পড়েছে। কাজেই সে আর খেতে চায়না। কিন্তু আশমানি তাকে খাওয়াবেই প্রেমের অভিনয় করে।

না, না, খাও তুমি। কাউকে বলবো না। আমার ইচ্ছে, তোমার পাতের প্রসাদ পাবো। আমার সে সাধটা মেটাবেনা? এই তোমার ভালবাসা?

আশমান, তোমার জন্য সব পারি।

ঐরে! বিমলা এসেছে। লুকোও, ঠাকুর লুকোও।

অ্যাঁ???

আশমানির পরামর্শে বিদ্যাদিগ্গজ ডালের হাঁড়িটা উল্টে মাথায় দিলে। সমস্ত ডাল তার মাথা থেকে সারা গায়ে গড়িয়ে পড়লো। সে কেঁদে ফেললো তৎক্ষণাৎ!

কেঁদোনা। বাকি ভাতটা খেয়ে ফেলো, কাউকে বলবোনা। তারপর চান করে এসো।

নারায়ণ, নারায়ণ!

বিদ্যাদিগ্গজ স্নান সেরে ঘরে ঢোকে। তারপর কাপড় ছেড়ে আসতেই, বিমলা শুরু করলো তার আপন কথা।

রসরাজ তুমি আমাদের ভালবাস?

বাসিনে! খুব বাসি। দুজনকেই।

তাহলে চলো আমরা পালাই। তোমাকে নিয়ে ঘর করবো।

বিমলা ও আশমানির সঙ্গে বিদ্যাদিগ্গজ বেরিয়ে এলো। কিন্তু আশমানি এরই মাঝে কেটে হাওয়া।

"দূর্গা শ্রীহরি!"

কই, আশমানি কোথা? সেতো এলোনা!

আবার তাকে কেন? আমিইতো আছি!

দুর্গেশনন্দিনী
অন্ধকার বনপথে বিমলা ও তার আঁচল ধরে বিদ্যা-দিগ্‌গজ এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে পথে অনেক ঘোড়ার পায়ের ছাপ, মরা ঘোড়া, সৈনিকের পাগড়ী।
গজপতি। দেখছ একটা মুমূর্ষু ঘোড়া! আবার ঐ দেখ একটা সৈনিকের পাগড়ী।
আমার বড্ড ভয় করছে বিমলা!
শৈলেশ্বরের মন্দিরে। মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিমলা সেখানে গিয়ে করাঘাত করে।
কে?
আমি পথশ্রান্ত স্ত্রীলোক।
দাঁড়াও খুলছি!
মন্দিরের কাছাকাছি। বিমলা তখন গজপতিকে তাড়াতে চায়।
দেখেছ, ঐ সাদা জিনিষটা? তোমার ইষ্টদেবের নাম জপ কর।
ও বাবাগো!—ভূত!
মন্দিরে মধ্যে বিমলা ও জগৎসিংহ। বিমলা তাকে তিলোত্তমার পরিচয় দেয়। জগৎসিংহের বুক ভেঙ্গে যায়!
তাহলে বুঝতে পারছি তোমার সখীকে আমি কোনদিনই পাব না। তবু আর একবার যদি তাকে দেখতে পারতাম!
তাহলে আসুন আমার সঙ্গে!
চল। কিন্তু তোমার পরিচয় তো দিলেনা।
আমার পরিচয় দিব। কিন্তু আজ নয়।
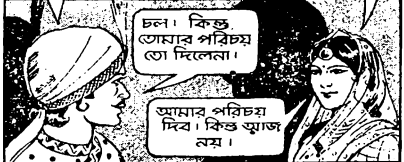
দুর্গেশনন্দিনী

বিমলা ও জগৎসিংহ চললো গড় মান্দারণের পথে। অন্ধকারে কে যেন তাদের অনুসরণ করে! অবশেষে এসে গেল তারা দুর্গের নিকট।

কে যেন আমাদের পিছু নিয়েছে!

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয় কুমার!

ঐ গাছের মাথায় যেন কি দেখছি! দুটো বর্শা এনে দিতে পার?

একটু অপেক্ষা করুন। এনে দিচ্ছি।

দুর্গেশনন্দিনী
রাজকুমারের অব্যর্থ সন্ধানে গাছের ওপর থেকে এক পাঠান সৈন্য মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। রাজকুমার ও বিমলা দুজনেই ছুটে গেল সেইদিকে।
ওঃ! লোকটা পাঠান সৈন্য। মরে গেছে একদম! পকেটে চিঠি? দেখিতো কি লেখা আছে!
বিমলা ছাদের আলসেয় ঝুঁকে দেখছিল। সহসা পেছনে কার স্পর্শে চমকে উঠে ফিরে দেখে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক পাঠান যোদ্ধা।
বিমলা জগৎসিংহকে তিলোত্তমার ঘরে বসিয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিতা বিমলা আয়নার সম্মুখে বসে বুঝি নিজের রূপেই মুগ্ধ!
কিও? দুর্গের ভেতর এমন যুদ্ধের দামামা বাজলো কেন? ছাদে গিয়ে দেখতে হচ্ছে!
চুপ! চীৎকার করোনা। চীৎকার করলে বিপদ হবে।
কে তুমি? কেমন করে এখানে এলে।
তোমারই দয়ায় সুন্দরি! ভুল করে দরজা খোলা রেখেছিলে তাই- আমি ঢুকতে পেরেছি। আমি ওসমান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি। তোমার আঁচলের ঐ চাবিগুলো দাও, নইলে জোর করে নেবো।

দুর্গেশনন্দিনী

ওসমান খাঁ বিমলাকে ছাদের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে, পাহারায় রয়েছে রহিম সেখ। বিমলা ভালবাসার অভিনয় করে।
বাঃ! বাঃ! বড়ি খুসিকা বাৎ! জরুর বৈঠেগা!
সেখ সাহেব! আমার কেমন ভয় করছে, তুমি আমার কাছে বসোনা!
মেরা জান! তুমি এত ঘামছ! বাঁধনটা খুলে দাওনা, তোমায় একটু হাওয়া করি।
আপকা মেহেরবানি বিবিজান!

বিমলার প্রেমের অভিনয়ে রহিম সেখ মশগুল!
সেখজী, তুমি সাদী করেছ?
হাঁ জী, কিন্তু কেন?
নিশ্চয়।
তোমার স্ত্রী তোমায় ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধ করতে? আমি হলে দিতুম না সেখজী।

রহিম সেখ বিমলাকে নিয়ে আহ্লাদে ডগমগ। বিমলা তবু তাকে খেলিয়ে চলছে। সহসা পাঠানের আবারও জয়োল্লাস!
দুর্গ তো প্রায় জয় হয়ে এলো!
তবুও ভরসা নেই দেখছি। জগৎসিংহ দুর্গের পাশে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে!
তাই নাকি? তাহলে তো সেনাপতিকে জানাতে হয় এক্ষুনি।
নিশ্চয়

বিমলা রহিম সেখকে ভাঁওতা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর বীরেন্দ্রসিংহকে বিপদের খবর দিতে গেল।

দুর্গেশনন্দিনী

কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের ঘরে তখন তুমুল কাণ্ড ! বিমলা উঁকি দিয়ে দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে।

কি সর্বনাশ ! একা এত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ !

দুর্গেশনন্দিনী

তিলোত্তমার ঘরে ছুটে যাচ্ছিল বিমলা। কিন্তু পথিমধ্যে আবার সেই রহিম সেখ! সে বিমলার হাত চেপে ধরে।

দুর্গেশনন্দিনী
কুতলু খাঁর দুর্গে বন্দী, আহত জগৎসিংহ।
আমি কোথায়?
চঞ্চল হবেন না। আপনি ভাল জায়গায়ই আছেন।
পূর্ববর্নিত সেই কক্ষ। জগৎসিংহ আবারও সংজ্ঞাহীন।
পরম শত্রুকে সেবা করার জন্য তোমায় প্রশংসা করতে হয় আয়েষা।
সেবা করা নারীর ধর্ম। কিন্তু তুমি যা করছ, তা খুবই অদ্ভুত!
আমার এতে স্বার্থ আছে আয়েষা! এক স্বার্থ মহারাজ মানসিংহকে সন্ধিতে বাধ্য করা। অপর স্বার্থ তোমার হৃদয় জয় করা।
ওসমান, তুমি আমার ভাইয়ের মত। তাই তোমার কাছে আসি। কাজেই বেশী বাড়াবাড়ি করোনা।
প্রায় দুপুর রাত, জগৎসিংহ অচৈতন্য। হঠাৎ তার জ্ঞান হলো প্রায় দু'দিন পর।
আমি কোথায়?
আপনি কতলু খাঁর দুর্গে চিকিৎসার জন্য আছেন। আপনি অসুস্থ।
না, আমি বন্দী। তুমি কে?
আমি আয়েষা, কতলু খাঁর কন্যা।

দুর্গেশনন্দিনী

নবাব কতলু-খাঁর দরবার। তাঁর সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী বীরেন্দ্রসিংহ। পারিষদবর্গ ও ওসমান খাঁ উপস্থিত।
বীরেন্দ্রসিংহ! তুমি আমার আদেশ মত আমাকে অর্থ আর সৈন্য পাঠালেনা কেন?
নবাব, তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু। তোমায় কেন সাহায্য করবো?
বটে! আচ্ছা আরো একটু দেখা যাক।

সভাস্থ সকলেই ভয়ে তটস্থ! নবাব যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করে আবারও তাঁকে জিজ্ঞেস করেন।
আমি বিদ্রোহী হলেও তুমি আমারই অধিকারে বাস করছিলে তো? আমার কথা কি তোমার শোনা উচিৎ ছিল না?
নবাব তুমিযে আমায় হাসালে দেখছি! তুমি বিদ্রোহী দস্যু। দস্যুর আবার একটা অধিকার?

নবাব কৎলুখাঁর চোখে এবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিজিতে বন্দীর কাছে এত অপমান! তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তারপর বাজের মত গর্জে ওঠেন।
বন্দী বীরেন্দ্রসিংহ! তুই কি বাঁচবার আশা একেবারেই করিস না?
না, একেবারেই করিনা। যে শয়তান আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়েছে, আমার তিলোত্তমাকে পর্য্যন্ত — না, না, তার দয়ায় প্রাণ বাঁচাবো ভেবেছিস।

বিজয়ী কৎলু খাঁ ও বিজিত বীরেন্দ্রসিংহের পরিচয় আরো সুপষ্ট হয়ে ওঠে। কৎলু খাঁ তবু আর একবার তাঁকে পরীক্ষা করতে চান।
বীরেন্দ্রসিংহ! মৃত্যুর আগে তোমার কন্যাকে একবার দেখতে চাও না।
সে যদি তোমার গৃহে জীবিত থাকে, তাহলে দেখতে চাইনা। যদি মৃত হয়, তাহলে নিয়ে এসো। তাকে কোলে করে মরবো।
বটে! যাও, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

আয়েষার কক্ষ। পালঙ্কে শয়ান জগৎসিংহ। আয়েষা শুশ্রূষায় রত।
একটা কথা বলবে? বীরেন্দ্রসিংহের কি হয়েছে?
তিনি বন্দী আজ তাঁর বিচার হবে।
গড়-মান্দারণ কার দখলে?
আমাদের

দুর্গেশনন্দিনী
বীরেন্দ্রসিংহের বিচার হবে, এই দুঃসংবাদ শুনে অসুস্থ জগৎসিংহ সে অবস্থায়ও পালঙ্কে উঠে বসেছেন।
আর একটা কথা জানতে চাই। বীরেন্দ্রসিংহের অন্যান্য পৌরবর্গ কোথায় কি ভাবে আছেন?
আমি সব খবর জানিনা কুমার!
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি, কোন দেবকন্যা আমার শুশ্রূষা করছেন। সে কে? তুমি, না তিলোত্তমা?
আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখে থাকবেন।
কুৎলু খাঁর দুর্গমধ্যে ওসমান ও বিমলা। দুজনেরই মুখমণ্ডল বিমর্ষ।
মা! বীরেন্দ্রসিংহকে আপনার চিঠিখানি দিয়েছিলাম। তিনি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।
সেনাপতি সাহেব! আরো একটা অনুরোধ আছে। বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণদণ্ডের সময় আমি উপস্থিত থাকবো।
মা! একাজ বড় কঠিন! তবু আপনি তৈরী থাকবেন।
বধ্যভূমি। শৃঙ্খলা-বদ্ধ বীরেন্দ্রসিংহ কথা কইছেন ভিখারীবেশী অভিরাম স্বামীর সঙ্গে। বিমলা ছুটে এসে বীরেন্দ্রসিংহের পায়ের তলায় পড়ে গেল।
আজ প্রকাশ্যেই বলবো, স্বামী, প্রভু, প্রাণেশ্বর!
প্রিয়তমে! আমি যাচ্ছি। তোমরা পেছনে এসো!
নিশ্চয়! কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পর—
বধ্যভূমি। বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণহীন দেহ ও ছিন্নমুণ্ড পড়ে আছে। নিকটে দণ্ডায়মান জল্লাদ, ওসমান খাঁ, অভিরাম স্বামী ও বিমলা দূরে দর্শকবৃন্দ।
মা! মা! এ হাতে বল দাও, শক্তি দাও মা!

দুর্গেশনন্দিনী
তিলোত্তমা ও বিমলাকে নবাব কৎলুখাঁর বিলাসপুরীতে বন্দী করে দুটি ভিন্ন কক্ষে রাখা হয়েছে নবাবের উপভোগের জন্য। তিলোত্তমা অসহায় ভাবে অঝোরে কাঁদছে, আর সদ্য বিধবা বিমলা কাঁদছে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা নিয়ে।

বিধবা বিমলা তার সমস্ত গয়না এক দাসীকে দিয়ে দিলেন।
নে বোন, আমার সব কিছু নে। শুধু একটু কাজ কর্। ওসমান খাঁকে বলবি আমি আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই শেষবার।

ওসমানের কক্ষে ওসমান ও বিমলা। বিমলার হাতে একখানি সুদীর্ঘ চিঠি।
মা! বন্দী জগৎ সিংহকে আপনার চিঠি দিতে বলছেন। কিন্তু সে যে নিয়ম বিরুদ্ধ।
কেন?
না পড়ে কোন চিঠি বন্দীকে দিতে পারিনা।
তাহলে আপনি পড়েই দিবেন।

ওসমান বিমলার দেওয়া চিঠিখানি একমনে পড়ছেন।

ওসমান তখনও বিমলার চিঠি শেষ করতে পারেন নাই। পড়ছেন----

যুবরাজ জগৎসিংহ! একদিন এক ধনী পাঠান আমাদের কুটীরে অতিথি হন। রাতে এক চোর তাঁর বালক পুত্রকে চুরি করতে উদ্যত হয়। আমি চীৎকার করায় সে তা পারেনি। আমার তখন এক মুসলমানী নাম ছিল — মাহরু!-------

ঐ পর্য্যন্ত চিঠি পড়েই ওসমানের সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তিনি বিস্মিত হয়ে বিমলার দিকে তাকান।

কৃতজ্ঞ ওসমান, তাঁর প্রাণরক্ষাকর্ত্রী বিমলাকে হাতের একটি আংটি দিলেন।
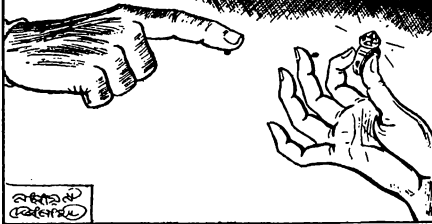
আয়েষার কক্ষমধ্যে কুমার জগৎ-সিংহ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওসমানের প্রবেশ।

ওসমান জানালা দিয়ে লোকটাকে দেখে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—

জগৎসিংহ জানতে চান বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমার খবর। ওসমান কোন বাধা দিলেন না।

কক্ষমধ্যে জগৎসিংহ, ওসমান ও গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসে কথা বলছেন।

দুর্গেশনন্দিনী

বিমলা ও তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী, একথা শুনে রাতেও জগৎসিংহ ঘুমোতে পারলেন না। কেবলই ছটফট করছেন।

দিগগজ কি সাংঘাতিক খবরই না বলে গেল। ওসমানও তার প্রতিবাদ করেনি তো!

তিলোত্তমা,তুমিও নবাবের উপপত্নী?

দেখি ঘুমোতে পারি কিনা! মাটিতেই শুই। কিন্তু— তিলোত্তমা— নবাবের উপপত্নী!

সুসজ্জিত গৃহমধ্যে কুমার জগৎসিংহ ও ওসমান। জগৎসিংহ তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

নবাব কৎলু খাঁর জন্মদিন। পুরীর সকলেই আনন্দে মশ্‌গুল। বিমলা অপরূপ সুন্দরীর সাজে তিলোত্তমার ঘরে প্রবেশ করল।

বিমলা দেখিয়ে দিল, তার কোমরে লুকানো আছে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। তিলোত্তমা তাই দেখে শিউরে ওঠে।

দুর্গেশনন্দিনী

তারপর বিমলা আবার বলে।
শোনো, তিলোত্তমা! গভীর রাতে ফটকে যে তোমাকে এমনি আংটি দেখাবে, তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যেও। চলে যেও অভিরাম স্বামীর কুটীরে।
আর তুমি?
আমি অন্য উপায়ে যাব।

দুপুর রাতে তিলোত্তমা ফটকে চলে আসে। একজন সিপাহী তার নিজের আংটির সঙ্গে তিলোত্তমার আংটি মিলিয়ে দেখে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।
বলুন মা! কোথায় আপনাকে নিয়ে যাব?
তাইত! কোথায় নিয়ে যাবে? একবার কুমার জগৎসিংহের সঙ্গে দেখা হয় না?
জগৎসিংহ? তিনি কারাগারে বন্দী। তা হোক, চলুন আমার সঙ্গে।

সিপাহী কারারক্ষীকে ওসমান খাঁর আদেশ জানিয়ে কক্ষের তালা খুলিয়ে নেয়। তিলোত্তমা এক-পা দু-পা করে অতি সসঙ্কোচে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।
কে?

দুর্গেশনন্দিনী
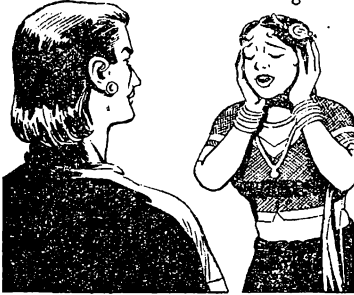
কুৎলু খাঁর অন্তঃপুরবাসিনী বলে জগৎ-সিংহ তার সতীত্বে সন্দেহ করায় তিলোত্তমা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। বন্দী জগৎসিংহ মহা বিব্রত হয়ে পড়লেন।

আয়েষা খবর পেয়ে দাসীকে সঙ্গে নিয়ে জগৎসিংহের কারাকক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন।

রাজপুত্র! একি সংবাদ? ইনি কে?

ইনি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করে বসেছিলেন। আয়েষার শুশ্রূষায় তিলোত্তমা সংজ্ঞালাভ করে উঠে বসলো। দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে।

দুর্গেশনন্দিনী

আয়েষা তাঁর দাসীর সঙ্গে তিলোত্তমাকে তাঁর নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

কুমার: বলুন আমি আপনার আর কি কাজ করতে পারি?

আর কিছু চাইনে রাজপুত্রী! আমার সব সাধ মিটে গেছে। আমি আর বাঁচতে চাইনা আয়েষা!

কুমার জগৎসিংহের ব্যথার সুরে আয়েষার মনেও ব্যথা লাগে। সন্দেহ জাগে, তবে কি তিলোত্তমার জন্যই কুমারের এত কষ্ট?

কুমার: এ দারুন দুঃখ তোমার কিসের জন্য? বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি —

না, না, সে স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে।

জগৎসিংহের মনোবেদনায় আয়েষার মনও কেঁদে ওঠে। তিনি চরম বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও তাঁকে মুক্ত করবার সঙ্কল্প করেন।

দুর্গেশনন্দিনী

আয়েষা যখন দেখলেন যে, জগৎসিংহ নিজের মুক্তিলাভেও অনিচ্ছুক, তখন আর তিনি আপনাকে সামলে রাখতে পারলেন না।

জগৎসিংহ আয়েষার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আয়েষা ও জগৎসিংহ কারাকক্ষে কথা বলছেন, এমনি সময় নবাবপুত্রী! এ উত্তম! একথা বলতে বলতে সহসা উদয় হলেন ওসমান। আয়েষা বিরক্ত ও সন্ত্রস্ত হলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর দিলেন।

আয়েষার দু'চোখ জ্বলে উঠল। তিনি ঘুরে ওসমানের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

দুর্গেশনন্দিনী

কৎলু খাঁর জন্মদিনে নবাবের প্রমোদ-ভবনে তখন নবাবকে ঘিরে চলছে অসংখ্য নারী ও সুরার এক অপূর্ব হুল্লোর। তার পুরোভাগে নৃত্য সঙ্গীত সহযোগে বিমলা।

ভর পিয়ালা সরাব পিও
আও মেরীজান্!
বসোরা গুলাব মেরা
খুসিকা তুফান!

দুর্গেশনন্দিনী

পানোন্মত্ত নবাবের দিকে বিমলা এগিয়ে যায়। তারপর বা-হাতে নবাবের গলা জড়িয়ে ধরে, তারপর চকিতে ডান হাতে তার গুপ্ত ছুরিকা বার করে নিলে।

বিমলা নবাবকে ছুরি মেরেই ছুটে পালায় অভিরাম স্বামীর কুটীরের দিকে।

দুর্গেশনন্দিনী

মুমূর্ষু কৎলু খাঁ ডেকে পাঠিয়েছেন জগৎসিংহকে। সিপাহী তাঁকে নবাবের সম্মুখে নিয়ে এলো।
যুবরাজ আমি মরতে বসেছি। এসময় আর রাগ বা বিদ্বেষ —
সেসব পরিত্যাগ করলাম।
কুমার, একটা সন্ধির অনুরোধ —
তারই চেষ্টা করবো।

একটু থেমে আবার বলেন কৎলু খাঁ —
বেশ মুক্ত তুমি! আর এক কথা। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা পবিত্রা। তাকে গ্রহণ করো।

কুমার জগৎসিংহ কৎলু খাঁর পক্ষ থেকে সন্ধির সুপারিশ করতে পিতা মানসিংহের দরবারে উপস্থিত। জগৎসিংহের সঙ্গে আছেন নবাবের ছেলেরা, সেনাপতি ওসমান খাঁ ও রাজমন্ত্রী খাজা ইসা।
কুমার জগৎসিংহ! পাঠানের পক্ষ হয়ে তুমি কেন সন্ধির আবেদন করছ?
পিতা! মৃত নবাবের নাবালক পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কখনো মোগলের গৌরব হতে পারে না!

তিনি তখন ওসমান খাঁ ও খাজা ইসাকে জিজ্ঞাসা করলেন —
আপনাদেরও কি সেই অভিমত?
হ্যাঁ মহারাজ! আমাদেরও সেই অভিমত।
আচ্ছা সন্ধি মঞ্জুর।

দুর্গেশনন্দিনী

জগৎসিংহ পাটনায় ফিরে যাবার আগে একদিন বিদায় নিতে গেলেন সেনাপতি ওসমান খাঁর কাছে।

ওসমান খাঁর কাছে অপমানিত হয়ে কুমার গেলেন আয়েষার গৃহদ্বারে। একজন সিপাইকে দিয়ে আয়েষাকে খবর পাঠালেন।

আয়েষার গৃহ থেকে বেরিয়ে আসছেন জগৎসিংহ, এমনি সময় দেখতে পেলেন, ওসমান খাঁ তাঁর পিছু পিছু আসছেন।

এক নিবিড় শালবন। সেইখানে অতি প্রাচীন এক ভাঙা অট্টালিকা। জগৎসিংহকে ওসমান খাঁ সেইখানে নিয়ে এলেন। প্রাসাদের মাঝে একপাশে একটি গভীর কবর, অপর পাশে একটি চিতা।

এ আমায় কোথায় নিয়ে এলেন? আর এসবের মানে কি?

শুনুন কুমার! আয়েষার প্রেমাস্পদ দুজনে কখনো জীবিত রইবে না। যুদ্ধ করুন আমার সঙ্গে। যুদ্ধে আপনার মৃত্যু হলে আপনাকে চিতায় তুলে দিব। আর আমার মৃত্যু হলে আমাকে কবরে ফেলে দিবেন।

দুর্গেশনন্দিনী

ওসমান খাঁ কুমারকে যুদ্ধে আহ্বান করেই তাঁকে আক্রমণ করে বসলেন।

সাধ্য থাকে আত্মরক্ষা করুন কুমার।

দুর্গেশনন্দিনী

রাজকুমারকে তাতিয়ে দেবার জন্য ওসমান খাঁ তাঁকে গালিগালাজ ও পদাঘাত করেন।
ভীরু! কাপুরুষ! যে রাজপুত্র যুদ্ধ করতে ভয় পায়, এই তার যোগ্য পুরস্কার!

পদাঘাতে উত্তেজিত হয়ে রাজকুমার তক্ষুনি তাঁকে আক্রমণ করলেন।

মুহূর্ত মধ্যে তাঁকে মাটিতে ফেলে তাঁর বুকে চেপে বসলেন ও তাঁর হাত পা একসাথে বেঁধে ফেললেন।
যাও সেনাপতি! এবার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও। উপকার করেছিলে একদিন, তাই তোমার প্রাণটা রয়ে গেল।

ভাঙ্গা অট্টালিকা থেকে রাজপুত্র বেরিয়ে এলেন। শালগাছে বাঁধা ছিল ঘোড়ার লাগাম। সে লাগাম খুলতে গিয়ে দেখেন এক মহা বিস্ময়।
একি! লাগামের সঙ্গে এক চিঠি বাঁধা! বাঃ! বেশতো! ওপরে লেখা দেখছি, 'দুদিনের মধ্যে খুলবেন না'।

দুর্গেশনন্দিনী

রাজপুত্র শিবিরে ফিরে এসে দূত মারফৎ একখানি চিঠি পেলেন। চিঠি — আয়েষার চিঠি।
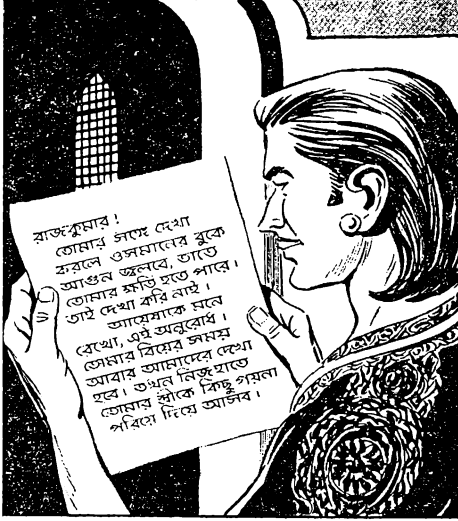
রাজপুত্র চিঠির নির্দেশ অনুসারে লাগামে বাঁধা চিঠিখানি দুদিন পরে পড়লেন। চিঠির ভাষায় আবার এক নতুন বিস্ময়!

পত্র অনুযায়ী ভাঙ্গা অট্টালিকায় প্রবেশ করে দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্য!

দুর্গেশনন্দিনী

রাজপুত্র চিতার কাছে এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, তিনিই পত্র লেখক ব্রাহ্মণ, ও তাঁর নাম অভিরাম স্বামী- তিলোত্তমার মাতামহ।
আপনি রোদন করছেন কেন?
শোনো, তিলোত্তমার মৃত্যু কাল উপস্থিত। তাই তোমায় ডেকেছি। চলো, তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

অভিরাম স্বামী রাজকুমার জগৎসিংহকে নিয়ে তিলোত্তমার কক্ষে প্রবেশ করেন।
তিলোত্তমা, রাজকুমার. জগৎসিংহ এসেছেন।

থাক, উঠোনা, আমি বসছি।

অভিরাম স্বামী বেরিয়ে গেলেন। কক্ষমধ্যে শুধু তিলোত্তমা ও তাঁর শয্যায় পদপ্রান্তে রাজকুমার জগৎসিংহ।
স্বপ্ন দেখেছি, তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলাম। তোমার তরোয়ালে লেগে তা ছিঁড়ে গেল।

জগৎসিংহ তরোয়াল খুলে তিলোত্তমার পায়ের কাছে রাখলেন।
কিচ্ছু ভেবোনা। এই আমার তরোয়াল তোমার পায়ের তলায় রেখে দিলুম। এবার মালা দিয়ে দেখো।

দুর্গেশনন্দিনী
অভিরাম স্বামী তাঁর পুঁথি-পত্তরের মধ্যে পাঠে নিরত ছিলেন। এমনি সময় জগৎসিংহ সেখানে উপস্থিত হলেন।
এই ভাঙ্গাবাড়ীতে আপনারা আর কষ্ট পাবেন কেন ? চলুন গড়-মান্দারণে চলুন। আর আপত্তি না থাকলে তিলোত্তমাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন।
প্রিয়ের প্রস্তাবে অভিরাম স্বামীর মহা আনন্দ। আশমানী আর বিমলাও ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে সেইখানে উপস্থিত হলো।
আমরা যে এতদিনে এই আশায়ই বেঁচে রয়েছি কুমার !
গড়-মান্দারণে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের বিবাহ উৎসব।
আয়েষা তাঁর সহচরীদের নিয়ে সে বিবাহে যোগদান করলেন।

দুর্গেশনন্দিনী
দুর্গের একটি সুসজ্জিত কক্ষে।
নবাবজাদী! আপনার শুভকাজে আমরা নিমন্ত্রিত হব নিশ্চয়!
সে সৌভাগ্য কোনদিনই কারো হবেনা।
বিষাদের সুরে আয়েষা উত্তর দিলেন—
দেখা না হলেও আয়েষাকে ভুলোনা।
আয়েষাকে ভুললে যুবরাজ আমার মুখ দেখবেন না।
বিয়ের পর আয়েষার বিদায়ের পালা এসে গেল। তিনি ভাঙা বুকে বিদায় চাইলেন তিলোত্তমার কাছে।
আমি এখন চলি বোন! মনে প্রাণে আশীর্বাদ করি, তুমি অক্ষয় সুখে থাকো।
আবার কতদিন পরে আপনার দেখা পাব?

দুর্গেশনন্দিনী

আয়েষা তাঁর বিদায়-বেলায় তিলোত্তমায় মুখ থেকে হঠাৎ যুবরাজ জগৎসিংহের নাম শুনে বড় দুঃখের সঙ্গে তাকে সাবধান করে দিলেন।
আর একটা কথা বোন: প্রতিজ্ঞা করো যুবরাজের কাছে কখনো আমার নাম করবেনা ?
সে কি ?

উত্তরে আয়েষা বললেন—
হ্যাঁ, তাই করতে হবে। শপথ কর বোন।
আচ্ছা।

আয়েষা তাঁর প্রেমাস্পদ জগৎসিংহকে অপরের হাতে সঁপে দিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কাজেই তাঁর তখন কত বেদনা।
বোন! বিদায় নিতে বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তবু বিদায় নিতে হচ্ছে। তাহলেও আমায় ভুলোনা কোনদিনে।
না, না, সে কোন দিনই ভুলবোনা।

আয়েষা তাঁর গহনার বাক্স উজাড় করে, সমস্ত গহনা তিলোত্তমাকে পরিয়ে দিয়ে ধন্য হতে চান।
এসো বোন, এবার তোমায় কিছু স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে যাব। এগুলো পরে থাকবে, কখনো খুলবেনা।
একি! এত অলঙ্কার! এযে সাত রানীর ঐশ্বর্য্য!

দুর্গেশনন্দিনী

সমস্ত গহনা, আয়েষা তিলোত্তমাকে পরিয়ে দিলেন।

সর্বাঙ্গ গহনায় সুসজ্জিত তিলোত্তমা তখন আয়েষার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে রইলেন। বিদায় বেলায় কে কাকে বিদায় দিবেন সেই হলো সমস্যা।
বোন, বোন আমার!
নবাব পুত্রী! দিদি!
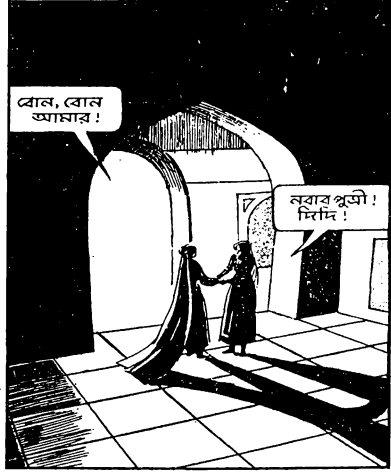
আয়েষা বাড়ীতে এসে, নিজের কক্ষে বসে গত জীবনের কত কথা- আশা- আকাঙ্খা, প্রেম- ভালবাসা - সব কিছুই ভাবতে লাগলেন।
যাক এবার নিজের হাতে সব শেষ করে দিয়ে এসেছি। এখন কি করবো? এখন কি নিজেরে জীবনটাকেও শেষ করে দেওয়া যায়না।

ভাবতে ভাবতে আয়েষা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
এইতো, এর মাঝে যে বিষ রয়েছে, তাই তো যথেষ্ট। এখন কি সেই পথই বেছে নেবো।

দুর্গেশনন্দিনী

মনস্থির করতে না পেরে আংটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

আয়েষা কিছুতেই মন স্থির করতে পারেন না। আত্মহত্যা অথবা সারা জীবন দুঃখ-বহন? অবশেষে তিনি যেন পথ খুঁজে পান।

কিন্তু আয়েষা তখনও সংশয়াকুল মাঝে মাঝে মন তাঁর বিদ্রোহী হতে চায়। আয়েষা তা বুঝতেও পারেন।

আপন মনের দুর্বলতা বুঝতে পেরে আয়েষা এবার তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠেন। আমরণ দুঃখকে বরণ করে নেওয়াই তাঁর সিদ্ধান্ত হলো।

আয়েষা তাঁর গরলাধার আংটিখানি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দুর্গ-পরিখার গভীর জলে সেই আংটি একটি ক্ষুদ্র আবর্ত রচনা করলো।

ছবিতে বিবেকানন্দ
প্রার্থনা
ভুবনমোহিনী একাগ্রমনে শিবপূজা করেন। পূজাশেষে প্রত্যহ প্রার্থনা করেন।
ঠাকুর! একটি সুপুত্র দাও প্রভু!

স্বপ্নদর্শন
রাতে নিদ্রিতা ভুবনমোহিনী স্বপ্ন দেখলেন — যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হতে উঠে পুত্ররূপে উপস্থিত।

বিস্ময়
ভুবনমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসে বিস্মিত ভাবে বললেন —
শিব: শিব: একি স্বপ্ন, না সত্যের ইঙ্গিত?

জন্ম
জানুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ, পৌষ সংক্রান্তি মকরবাহিনী পূজা সূতিকাগৃহে শিশু ভূমিষ্ঠ হল।

ছবিতে বিবেকানন্দ

নামকরণ
মাস কয়েকমাসের শিশুকে দেখিয়ে মা প্রতিবেশিনীদের বললেন —
এর ডাকনাম রইলো বীরেশ্বর বা বিলে। ভাল নাম নরেন্দ্রনাথ।

নামের মাহাত্ম্য
শিবের নাম করে দুরন্ত শিশুর মাথায় জল ঢাললেই সে একেবারে ঠান্ডা।
শিব! শিব!

দুরন্তপনা
শিশুর দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হয়ে বোনেরা তাকে তাড়া করে।

আশ্রয়গ্রহণ
নরেন্দ্র ছুটতে ছুটতে এক আস্তাকুঁড়েয় গিয়ে বসে পড়েন।
এখন ধরো দেখি! এখানে এসেই স্নান করতে হবে!

ছবিতে বিবেকানন্দ

গোপন প্রার্থনা
ভাবুক নরেন্দ্রনাথ শিশুবয়সেই চিলেকোঠায় খিল দিয়ে প্রার্থনা করেন।

জাতের লেবেল
হুঁকোর গায়ে-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইত্যাদি লেবেল দেখে নরেন্দ্র বিস্মিত!
হুঁকোয় কড়ি বাঁধা কেন বাবা?
এক জাত অপর জাতের হুঁকোয় খেলে জাত যাবে যে: তাই ঐ কড়ির লেবেল আঁটা হয়েছে।

নরেনের সংসার
নরেন তাঁর পোষা জীবজন্তু ও পাখী নিয়ে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা
নরেন জানালাপথে এক স্বাধীন গাড়োয়ানকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।
নরেন, বড় হয়ে তুই কি হবি বলতো?
বাবা, আমি গাড়োয়ান হতে চাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

জাতের পরীক্ষা
নরেন্দ্রনাথ বুঝতেই পারেনা মানুষের জাত যায় কি করে। তাই মুসলমানের জন্য আলাদা রাখা হুঁকোয় মুখ দেয়।
কিরে কি করছিস ?
এই হুঁকোয় মুখ দিলে জাত যায় কিনা দেখছি !

রাজা রাজা খেলা
নরেন্দ্রনাথ রাজা রাজা খেলায় রাজা হয়েছে, কেউ হয়েছে মন্ত্রী, কেউ হয়েছে সেনাপতি, কেউ কোটাল ইত্যাদি। নরেন জিজ্ঞাসা করে।
মন্ত্রী! রাজ্যের সংবাদ কি ?
চুরি হচ্ছে খুব, এই একটা চোর ধরা পড়েছে।
কোটাল! ধরে নিয়ে যাও-কাল এর প্রাণদণ্ড হবে।

ভক্ত কিশোর
মায়ের কাছে রামায়ণ শুনে নরেন হনুমানের চরিত্রে মুগ্ধ হয়।
হনুমানকে কি দেখা যায়না ? সে কোথায় থাকে মা ?
কলাবনে থাকে। ভক্তি করে ডাকলে তাঁকে দেখা যায় বইকি।

বিশ্বাসী কিশোর
মায়ের কথায় নির্ভর করে নরেন কদলীবনে বসে হনুমানের প্রার্থনা করে। এভাবে দেখে সবাই স্তম্ভিত। একজন জিজ্ঞাসা করে।
ওকিরে ! কি হচ্ছে !
হনুমানের আরাধনা করছি !

ছবিতে বিবেকানন্দ

গঙ্গার ঘাটে

কিশোর নরেন্দ্রনাথ একদিন নৌকায় ফিরে আসছিলেন চাঁদপাল ঘাটে। সঙ্গে একদল ছেলে। একটি ছেলে নৌকায় বমি করে ফেললো। নৌকা তখন ঘাটের কাছে।

উপস্থিত বুদ্ধি

নরেন্দ্রনাথ দেখেন একটু উপরে কয়েকজন গোরা সৈন্য। তিনি ছুটে যান তাদের কাছে। তাদের সাহায্য চান।

দুরন্ত কিশোর

মঞ্চে অভিনয় চলছে। চতুর্দ্দিকে দর্শক। সহসা এক পেয়াদার আগমন।

ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা

যুবক নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্র পড়ে ঈশ্বর জিজ্ঞাসু হয়ে পড়েছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই জিজ্ঞাসা করেন কেউ ঈশ্বর দেখেছেন কিনা।

ছবিতে বিবেকানন্দ

মনের মত জবাব
এরপর তিনি যান ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। তাঁকেও ঐ একই প্রশ্ন করেন।
আপনি ঈশ্বর দেখেছেন ?
হ্যাঁ দেখেছি। তোকেও দেখাতে পারি।

ঈশ্বর অনুভূতি
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল। তাই ঠাকুরের কাছে যান।
আমাকে ঈশ্বর দেখান ঠাকুর!
দেখবি ? বোস।
এ তুমি কি করছ ঠাকুর ? আমার যে সব রয়েছে গো। বাপ, মা, ভাই, বোন।

দুঃখ-দৈন্যের মুখে
পিতার মৃত্যুতে মুণ্ডিত শির নরেন্দ্রনাথ সংসার চিন্তায় বিব্রত।
বাবা! তোর ঠাকুরকে বলনা কোন কাজ কর্মের কথা।

মহামায়ার প্রলোভন
এক সুন্দরী ধনী কন্যার প্রস্তাব।
আপনি আমাকে ও আমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করে চিন্তামুক্ত হউন।
শিব! শিব! এ অসম্ভব!

ছবিতে বিবেকানন্দ

পার্থিব সুখের প্রার্থনা
অভাবে বিব্রত হয়ে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরকেই অনুরোধ করেন।
ঠাকুর : একটা কিছু করে দাও। এত অভাব আর যে সয়না।
তুই নিজেই মাকে বলনা। তাহলেই পাবি।

মায়ের সম্মুখে
নরেন্দ্রনাথ মহা উৎসাহে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন।
আমায় ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য দাও মা!
হলোনা! আবারও চেয়ে নে!

বৈরাগ্য
এবারও নরেন্দ্রনাথ ভুলে গেলেন টাকা-কড়ি চেয়ে নিতে। তখন ঠাকুর বললেন- তোদের সংসারে কখনও অন্নাভাব হবেনা।
তুং হি তারা!
সমাধি অভ্যাস
নরেন্দ্রনাথ সমাধি অভ্যাস করতেন। আরও অনেকে করতেন।
উঃ: কি মশারে বাবা!

ছবিতে বিবেকানন্দ

বিদ্যুৎস্পর্শ
ঠাকুর ছুঁয়ে আছেন নরেন্দ্রনাথকে। ঠাকুরের শক্তি নরেনের মধ্যে প্রবেশ করছে।
ওরে, আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হয়ে গেলুম।

মৃত্যুশয্যায় ঠাকুর
ভক্তরা ঠাকুরের শয্যা ঘিরে রয়েছেন। ঠাকুর নরেনের হাতখানি তুলে নেন।
ওরে, তোর হাতে এদের দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, তুই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী!

মহাপ্রস্থানের পর
শোকাকুল ভক্তগণ ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করছেন।

তিরোধানের পর
নরেন্দ্রনাথ ও অন্য ভক্তদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা।
এই কাশীপুরের বাগান বাড়ীর মেয়াদ তো আর কয়েকদিন মাত্র! তারপর?
গৃহী ভক্তরা বলছেন, সবাই ঘরে ফিরে যাক। লেখাপড়া শিখে নিজেদের দর বাড়িয়ে নিক!
না, সে হতে পারেনা!

ছবিতে বিবেকানন্দ

সমস্যা ঠাকুর চলে গেছেন। বাগানবাড়ীর মেয়াদও ফুরিয়ে এলো। থাকা-খাওয়া মানেই আর্থিক সমস্যা।

গৃহী ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বলছেন, যুবক-সন্ন্যাসীরা একটা সঙ্ঘ স্থাপন করুন।

কিন্তু থাকা-খাওয়ার টাকা কোথায়?

সে কথা ভাববো কেনরে? আমরা দোরে দোরে ভিক্ষা করে চালাবো।

সমস্যার সমাধান ভক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

ওরে, তোদের সঙ্কল্প সার্থক হোক। আমরা গৃহীভক্তরা তোদের সঙ্ঘের বাড়ীভাড়া চালিয়ে যাব।

বরাহনগরে মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে সঙ্ঘ উঠে এসেছে নতুন বাড়ীতে বরাহনগরে।
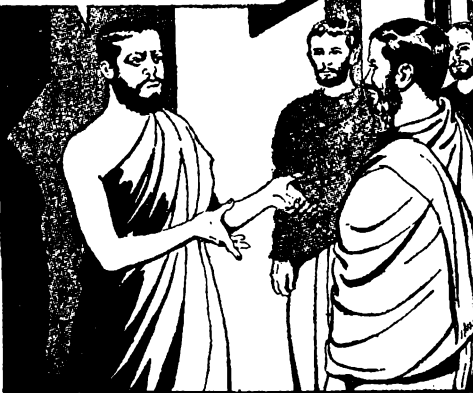
ফিরিয়ে আনা নরেন্দ্রনাথ এরপর গুরুভাইদের দোরে দোরে হানা দেন। পাঠরত গুরুভাই দোর খুলতেই নরেন্দ্রনাথ তাকে বলেন।

জীবনটা কি পরীক্ষা দিয়েই কাটাবি? ত্যাগ ও ভোগবাসনা কি একসঙ্গে চলেরে? চল মঠে চল।

ছবিতে বিবেকানন্দ

প্রত্যাবর্তন

নরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনায় লেখাপড়া ছেড়ে ফিরে এলো সকলেই। নরেন্দ্রনাথ তাদের একদিন বলেন।

কঠোর পরিশ্রম

নরেন্দ্রনাথের বিশ্রাম নাই। কাজ করেন প্রায় সর্বক্ষনই। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে নিদ্রিত গুরুভাইদের ঘুম ভাঙ্গান গান করে।

কাশীধামে

নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যাত্রা করলেন কাশীধাম। কিন্তু দূর্গা বাড়ীর মন্দিরের দিকে যেতেই হলো বিপদ।

ব্রহ্মচারীর সঙ্কল্প

নরেন্দ্রনাথ চিন্তামগ্ন ভাবে বসে আছেন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

সাহসের ফল

নরেন্দ্রনাথ পরিশ্রান্ত। হঠাৎ শুনতে পেলেন, কে তাঁকে বলছে, পালিয়ো না। বীরের মতো সামনে দাঁড়াও। নরেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন— বাঁদররা ভয়ে পালালো।

আগ্রা-বৃন্দাবন

এরপর আগ্রার দুর্গ দর্শন করে নরেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনে আসেন। পথে—

গোবর্দ্ধন থেকে রাধাকুণ্ডে

নরেন্দ্রনাথ কুণ্ডের ধারে কৌপীন রেখে জলে নেমেছেন, এক বানর সেটা গাছে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন গিরি পরিক্রমা কালে বিবেকানন্দের প্রতিজ্ঞা

কারও কাছে হাত পাতিব না। কিছু ভিক্ষা করিব না....। খুব বৃষ্টি পড়ছে।
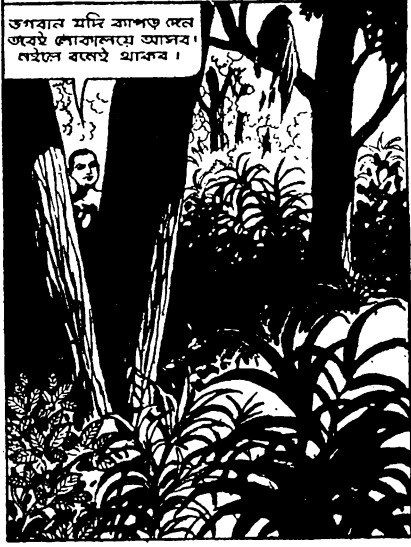
ছবিতে বিবেকানন্দ

অনন্ত দয়া
বনের দিকে ছুটতে ছুটতে নরেন্দ্রনাথ শোনেন, কে তাঁকে ডাকে ! তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।
চলুন মহারাজ, আমার বাড়ী চলুন।
ধন্য ঠাকুর তোমার অপার দয়া।

ট্রেনের কামরায়। ভীষন গরম একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। প্ল্যাটফর্মে পানি-পাঁড়ে জল দিচ্ছে, আর একটা করে পয়সা নিচ্ছে।
পয়সা নেই দেনেসে পানি মিলতা নেহি।
দেখেছ কেমন ঠাণ্ডা জল। তোমার তো পয়সা নেই। সন্ন্যাসী হওয়ার মজা বোঝ এবার।

তাড়িঘাট জংসনে এসে স্বামীজি ও মাড়োয়ারী সপরিবারে নামল। চৌকিদার স্বামীজিকে প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় বসতে দিল না। তিনি ছাউনির সামনে খুঁটিতে হেলান দিয়ে কম্বলের উপর রোদে বসলেন।
পয়সা রোজগার না করার ফল বোঝ।
বাবাজী আমি আপনার জন্যে খাদ্য দ্রব্য আনিয়েছি
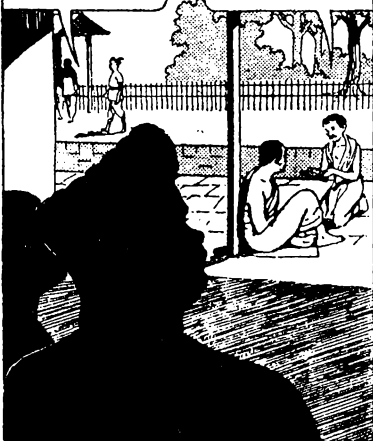
স্বামীজি তাকে প্রশ্ন করাতে সে বললে, আমি হালুইকর। স্বপ্নে এক সন্ন্যাসী বললেন, স্টেশনে আপনি অভুক্ত আছেন।
স্বামীজি মহারাজ, আমি মুর্খ। না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।
কোন অপরাধ হয়নি ভাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

গাজী পুরে
সেখানে পওহারী বাবাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান ও স্থির করেন, তাঁর কাছেই তিনি দীক্ষা নেবেন
"একি হলো? পা এমন ভারী হলো কেমন? চলতে পারছি না। তবে কি এ কাজ সফল হবে না"?

নরেন্দ্র নাথ রাতে স্বপ্ন দেখেন
স্বপ্নে তিনি ঠাকুরের দর্শন পান।
ঘুমের ঘোরেই তিনি কথা বলেন।
আঃ, কি করুণ, স্নেহময় ও সরল মুখমণ্ডল! না,না, এ আমি কি করতে যাচ্ছি? এই ঠাকুর ছাড়া এ হৃদয়ে আর কেউ স্থান পাবে না।

মীরাটে লাইব্রেরী ঘরে
পাওহারী বাবার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি নানা জায়গা ঘুরে মীরাটে আসেন।
"আপনি রোজ একটা মোটা বই নিয়ে যান আর পরদিনই ফেরত দেন- কি ব্যাপার বলুন তো?"
পাতার দিকে তাকালেই সব পড়া হয়ে যায়!

ছবিতে বিবেকানন্দ

আলোয়ার রাজ্যে তারপর দিল্লী ঘুরে স্বামীজি অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ আলোয়ার রাজ্যে উপস্থিত। (রাজসভায়)।

স্বামীজি, মূর্তিতে কি প্রান আছে? আমি মূর্তি পূজার বিরোধী।

ঐ ফটোখানি কার?

ও খানি মহারাজের পিতার ফটো।

আলোয়ার মহারাজের রাজসভায় ফটো খানি মহারাজের পিতার ফটো শুনে স্বামীজি মহারাজাকে বলেন —

মহারাজ, ঐ ফটোখানি কাউকে নামিয়ে আনতে বলুন না।

সূক্ষ্মবুদ্ধি স্বামীজি রাজার আদেশে তার ফটোখানি নামানো হলো। স্বামীজি তখন ছবিখানি মাটিতে রেখে সভাসদদের বললেন

আপ … কেউ এ
… ওপর থুথু
ফেলুন তো।

একি সম্ভব? এযে মহারাজার ছবি! তাঁর মূর্তি!

স্বামীজির যুক্তি রাজার ফটোতে থুথু ফেলতে কেউই যখন সম্মত হলোনা, কেবল তখনই স্বামীজি তাঁর অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করলেন।

তবেই দেখুন মহারাজ, প্রাণহীন ছবিকেও এঁরা আপনার মতই সম্মান করেন। প্রাণহীন মূর্তিকে আমরাও সেইরকম দেবতাজ্ঞানে পূজা করি।

ছবিতে বিবেকানন্দ

রাজপুতানায় ট্রেনে দুজন সাহেব স্বামীজির নিন্দা করছিল ইংরাজীতে। একটা ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল।

ষ্টেশন মাষ্টার এক গ্লাস জল দিতে পারেন!

আপনি ইংরাজী জেনেও প্রতিবাদ করেন নি কেন!

তোমাদের মত অনেক বেকুব দেখেছি কিনা!

মরু ভূমির মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে মরুদ্যান মনে করে সেইদিকে এগোতে লাগলেন।

ও: এর নাম মরীচিকা। যত এগুই তত পিছিয়ে যায়!"

খেতড়ী রাজ্যে স্বামীজি আরও নানা স্থান হয়ে খেতড়ী রাজ্যে যান। খেতড়ীর মহারাজও তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা করলেন।

প্রভু! আমি এখন আপনার শিষ্যত্ব গ্রহন করেছি। পদ সেবা করবার অধিকার হতে বঞ্চিত করবেন না।

ছবিতে বিবেকানন্দ

লিমড়ী রাজ্যে স্বামীজি কিছুদিন পরে গেলেন লিমড়ী রাজ্যের রাজধানী লিমড়ী শহরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে' তিনি কতকগুলি অসৎ সাধুর হাতে বন্দী হয়ে পড়লেন।

দূতপ্রেরণ স্বামীজি সহসা একসময় লক্ষ্য করেন কোন পাহারা নেই। দৈবাৎ সেই সময় একটি বালক রোজের মত সেই দিনও তাঁকে দেখতে আসে।

উদ্ধার লিমড়ীর মহারাজ স্বামীজির বন্দী জীবনের কথা শুনে, তৎক্ষনাৎ একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন তাঁর উদ্ধারের জন্য।

বিপুল পর্য্যটন স্বামীজি এরপর যেন তুফানের মত পর্য্যটন সুরু করে দিলেন। ভাবনগর, শিহোর, জুনাগড়, ভুজরাজ্য, সোমনাথ, পোরবন্দর, দ্বারকা, বরোদা, খাণ্ডোয়া, বোম্বাই, পুনা ইত্যাদি স্থান পর্য্যটন করে মহীশূর রাজ্যে উপনীত হলেন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

মাদ্রাজে মহীশূর হতে বেরিয়ে স্বামীজি কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, পণ্ডিচেরী হয়ে অবশেষে মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হলেন।

হায়দ্রাবাদ স্বামীজি হায়দাবাদ রাজ্যে উপস্থিত হলে, সেখানে ও তাঁকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো।

অনুমতি প্রার্থনা স্বামীজি আমেরিকায় ধর্ম্ম মহাসভায় যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঠাকুরের ও সারদা মায়ের অনুমতি না পেলে সে যেতে পারেন না।

লাভ স্বামীজির দিনরাত শুধু এক চিন্তা। ঠাকুর ও মায়ের অনুমতি চাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

ঘোষনা
ঠাকুর ও সারদামায়ের অনুমতি লাভ করে স্বামীজি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও সকলের কাছে সে খবর ঘোষনা করলেন।

আমি আমার ঠাকুর ও মায়ের অনুমতি পেয়েছি। আর দেরী নয়!
আয়োজন
স্বামীজির ঘোষনার পর পূর্ণ উদ্যমে অর্থ সংগ্রহের কাজ সুরু হয়ে গেল।
ঠাকুর তুমিই ধন্য! বিদেশ যাত্রার আয়োজন তুমিই করে দিচ্ছ ঠাকুর!

আবারও খেতরিতে
বিদেশ যাত্রার আয়োজন হচ্ছে, এমনি সময় খেতরি মহারাজের কাছ থেকে এলো আমন্ত্রন। যেতেই হবে।
কি খবর?
স্বামীজি! আপনার আশীর্বাদে মহারাজের পুত্র হয়েছে। সেই উৎসবে রাজকুমারকে আশীর্বাদ করতে আপনাকে যেতেই হবে।

গুরু শিষ্যে মিলন
মহারাজের অনুরোধ স্বামীজিকে রাখতেই হলো। তিনি উৎসবে যোগদান করলেন।
ওঁ স্বস্তি! স্বস্তি! জয়স্তু!

ছবিতে বিবেকানন্দ

আবুরোড ষ্টেশনে

খেতরী রাজ্য হতে বিদায় নিয়ে বোম্বাই যাওয়ার পথে, আবুরোড ষ্টেশনে গাড়িতে একটি ঘটনা ঘটে গেল। স্বামীজির সঙ্গে এক বাঙ্গালী বন্ধু কথা বলছিলেন। এমন সময়ে ইংরেজ ষ্টেশন-মাষ্টার হাজির।

স্বামীজির রুদ্রমূর্তি

সাহেব চটে গেলেন দ্বিগুন। স্বামীজি তাঁর বন্ধুকে বারন করলেন, তর্ক করোনা। চুপ করে থাকো। সাহেব স্বামীজিকে ধমকে ওঠেন, তুম কাহে বাত করতে হো? আগুন জ্বলে উঠলো তক্ষুনি।

কি? তুম! কথা বলতে শেখনি? তোমার নাম নম্বর বলো। নয় সরে পড়ো!

সমুদ্র পথে

স্বামীজি বিদেশ যাত্রার জন্য জাহাজে উঠলেন। ডেকের ওপর দাড়ানো স্বামীজি জগমোহন, আলাসিঙ্গা ও অপর সকলকে দেখছেন। জাহাজ ছেড়ে দিল।

কলম্বো

জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌঁছুলে অনেকেই বন্দর দর্শনে নেমে গেল। স্বামীজিও নেমে যান।

ছবিতে বিবেকানন্দ

পেনাং

জাহাজ এরপর এসে গেল মালয়ের রাজধানী পেনাং শহরে। স্বামীজি এখানেও নেমে গেলেন শহর দেখবার জন্য।

সিঙ্গাপুর

জাহাজ সিঙ্গাপুরের পথে চলবার সময় কাপ্তান সাহেব দূরে সুমাত্রা দ্বীপের পর্বতশ্রেণীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে স্বামীজিকে বলছেন।

হংকং

স্বামীজি চীনে মঠ দেখতে যান একজন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু সেখানে ছিল বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ।

যাদুক্রিয়া

স্বামীজি একজন ভারতীয় 'যোগী' একথা শোনা মাত্র আক্রমনকারী লোকগুলোর হঠাৎ পরিবর্তন।
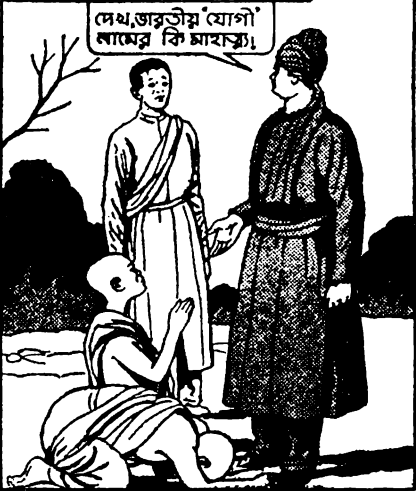
দেখ, ভারতীয় 'যোগী' নামের কি মাহাত্ম্য।

ছবিতে বিবেকানন্দ
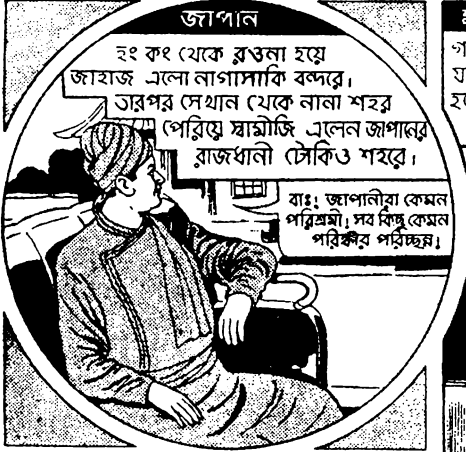
জাপান
হং কং থেকে রওনা হয়ে জাহাজ এলো নাগাসাকি বন্দরে। তারপর সেখান থেকে নানা শহর পেরিয়ে স্বামীজি এলেন জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে।
বাঃ! জাপানীরা কেমন পরিশ্রমী। সব কিছু কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মহাসাগরের অপর তীরে
অবিরাম গতিতে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে যায়। জাহাজ অবশেষে বন্দরে উপনীত হলো। সেখান থেকে ট্রেনে তিনি এলেন চিকাগোয়।
ঠাকুর! ঠাকুর! তুমিই একমাত্র ভরসা!

চিকাগোয় ব্যস্ততা
চিকাগোয় তখন ধর্ম-মহাসভার প্রস্তুতির জন্য ভীড় লেগে গেছে। স্বামীজি সংবাদ সংগ্রহের আফিসে গেলেন বিস্তৃত বিবরণের জন্য।
অধিবেশন সেপ্টেম্বরের আগে হবে না। আর প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ তো পেরিয়ে গেছে!

চিন্তামগ্ন
চিকাগোর এক হোটেলের কক্ষে বসে স্বামীজি হতাশ হয়ে ভাবছেন।
প্রত্যহ এত টাকা খরচ করে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানে থাকবো কি করে। শুনেছি বোষ্টনে নাকি খরচ কম। এবার তাহলে সেখানেই যাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

বোষ্টনের পথে স্বামীজি চিকাগো থেকে বোষ্টনের পথে বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ীর কামরায় এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

অবিচল স্বামীজি সাময়িক ভাবে একটু সুবিধা হলেও বিপদ ও নৈরাশ্য সম্পর্কে স্বামীজি সচেতন ছিলেন। তবু দৃঢ় মনোবলের জন্যে তখনো তিনি অবিচল।

পণ্ডিতের সংস্পর্শে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। স্বামীজির সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। সমানে প্রায় চার ঘন্টা।

আশার আলো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য স্বামীজিকে উৎসাহিত করলেন ও কিছু আশার ইঙ্গিতও দিলেন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজির পরিচয় পত্র

অধ্যাপক রাইট সাহেব স্বামীজিকে একখানি পরিচয় পত্র লিখে দিলেন ও চিকাগো যাওয়ার উপদেশ দিলেন।

বিপন্ন স্বামীজি

চিকাগোয় নেমে স্বামীজি ভাবলেন, এই বিরাট শহরে কোথায় তিনি যাবেন।

এলাম তো! কিন্তু যাবো কোথায়? রাইট সাহেব যে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, সে কাগজখানি যে হারিয়ে ফেলেছি! এখন উপায়?

চিকাগোর রাজপথে

আহার ও বাসস্থানের সন্ধান সুরু করে দিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! সর্বত্রই বিপরীত সংবর্দ্ধনা।

ছবিতে বিবেকানন্দ

ভিক্ষাব্রত অবলম্বন
স্বামীজি নিরুপায় হয়ে তখন দোরে দোরে ভিক্ষা সুরু করে দিলেন।
ওগো! কিছু খেতে দাও! আমি ক্ষুধার্ত!
মার! মার!

নিরাশ্রয়
সারাদিন কেটে গেল অনাহারে। রাত হলে স্বামীজি চিন্তিত হলেন তাঁর নৈশ আশ্রয়ের জন্য। কারণ বাইরে ভীষণ শীত
খাওয়া তো হলোই না। আজ এই বাক্সেই রাত কাটানো যাক!

ভগবৎ কৃপা
ক্লান্ত হয়ে স্বামীজি এক বিশাল প্রাসাদের সম্মুখে পথের ধারে বসে পড়লেন। একটি মহিলা সেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। মহিলার নাম মিসেস জর্জ্জ, ডবিউ, হেল্।
আপনি কি ধর্ম-মহা-সভার একজন প্রতিনিধি?
হ্যাঁ! কিন্তু আমি ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি!
আপনি আসুন, আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে আসুন!

ছবিতে বিবেকানন্দ

ধর্ম-মহাসভা. চিকাগো মিসেস হেল স্বামীজিকে ধর্ম-মহাসভার কার্যা-লয়ে নিয়ে গেলেন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

তারপর ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে বললেন।

SISTERS AND BROTHERS OF AMERICA

ছবিতে বিবেকানন্দ
আমেরিকায় একদল মিশনারী স্বামীজির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে
এই হিন্দু সন্ন্যাসীর জন্যে আমাদের আধিপত্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
এর কথা বলা বন্ধ করা যায় কি করে?
হত্যাই একমাত্র উপায়!

মিশনারীদের একজন আর একজনের সঙ্গে পরামর্শ করল।
এই বিষ ওর পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।
যো হুকুম। আগামী ভোজ সম্বর্দ্ধনায় কাজ হাঁসিল হবে।

তারপর ষড়যন্ত্রকারী, ভোজ সম্বর্দ্ধনার দিন সেই বিষ কমলালেবুর রসে মিশিয়ে দিল।
এতে তীব্র বিষ দিলুম। এই বিষ খেয়ে আজ অবধি কেউ বাঁচেনি।

ভোজসভা। খাওয়া শেষে সকলের হাতেই পানীয়। স্বামীজির হাতেও সেই বিষ মেশান পানীয়।
স্বামীজি আপনি কমলালেবুর রসটা খেয়ে ফেলুন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজি পাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের পানীয়তে তাঁর গুরুদেবের ছবি ফুটে উঠল।
খাসনি, ওতে বিষ মেশানো আছে।

স্বামীজিকে পাত্র হাতে বসে থাকতে দেখে···
কই স্বামীজি খাচ্ছেন না যে?
না আমি খাব না!

ভোজসভার শেষে সকলে চলে যাবার পর শয়নকক্ষে।
ঠাকুর তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ এরা আমায় মেরে ফেলতে চায়। তাই আজ আমায় রক্ষা করলে। প্রণাম নাও।

সে দেশে মিশনারীরা রটিয়েছিল, ভারতবর্ষে হিন্দুরমণীরা সন্তানদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়। স্বামীজি বিদ্রূপ করে তার প্রতিবাদ করেন।
হিন্দুরমণীরা ধর্মের নামে সন্তানকে কুমীরের মুখে ফেলে দেয়?
হ্যাঁ, আমাকেও দিয়েছিল। মোটা বলে কুমীরে খেতে পারেনি।

ছবিতে বিবেকানন্দ

বাইবেলের বাণীতে আছে মানুষ মানুষের সেবা করবে। কিন্তু খৃষ্টানরা তা করেনা। তাই স্বামীজি বক্তৃতায় বলছেন।
তোমরা খৃস্টান বলে গর্ব কর। কিন্ত তোমাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম কই? মারামারি কাটাকাটির মধ্যে যীশুর স্থান কোথায়?
সত্যিই তো! একথা তো জানিনি।

একদিন স্বামীজি বসে আছেন, মহিলা ও পুরুষ দর্শকে ঘর পুর্ণ। একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন।
পৃথিবীর মধ্যে খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ খৃষ্টানরাই সারা পৃথিবী অধিকার করে আছে। আপনারা যদি কোন দেশ জয় করে থাকেন, তাহলে আপনার ধর্ম শ্রেষ্ঠ বলে মানবো।

সেই প্রশ্ন শুনে স্বামীজি বললেন—
জয় করার শক্তি থাকলেও পরের দেশ হরণ করা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ বলেই করিনি।

সিকাগো সহরে স্বামীজি তাঁর কক্ষে বসে আছেন, এমন সময়—
ভেতরে আসুন, ভয় কি মা!

ছবিতে বিবেকানন্দ

মাদাম কালভে ইয়োরোপ আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেত্রী। সকলেই তার ঔদ্ধত্যের সামনে মাথা নত করে।
দুঃখকে জয় করতে হয়। আত্মহত্যার চিন্তা পরিত্যাগ কর।

মাদাম কালভের একমাত্র শিশুসন্তান সম্প্রতি আগুনে পুড়ে মারা গেছে।
আপনি কি করে জানলেন আমি শোকে নিজেকে হত্যা করতে চাইছি।
ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী সর্বজ্ঞ হয় মা।

স্বামীজির উপদেশে মাদাম কালভের শোক দূর হয়।
মন যে বড় অস্থির হয়ে থাকে। কি করে শান্ত হব?
আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হলে শান্তি হবে।

কিছুদিন বাদে বিখ্যাত শিল্পবিদ রকফেলার তাঁর কাছে এলেন।
আমার অংশীদার বন্ধুর কথা শুনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।
আপনি তো মহা ধনশালী?

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজি রকফেলারের চিন্তাধারা পরিবর্তন করবার জন্যে বললেন।
আপনি তো সন্ন্যাসী। আমার ধনসম্পদের কথা বলছেন কেন?
আপনার কল্যাণের জন্য।
তার মানে?

মানুষ ধনসম্পত্তির মালিক হতে পারে না।
আপনার ধনসম্পত্তির মালিক আপনি নন, সব বিশ্ব-মায়ের।
খুলে বলুন।

মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না!
আপনি কি কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন।
না।
পেলেন কি করে?
পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে।

যা মানুষের নয়, তার মালিকও মানুষ নয়।
তাহলেই বুঝছেন, যে জিনিস আপনি সৃষ্টি করেননি তা আপনার হতে পারে না। আপনি বিশ্ব-মায়ের কোষাধ্যক্ষ।
আপনার কথায় যুক্তি আছে। এখন কি কর্তব্য।

ছবিতে বিবেকানন্দ

ধনী.বিশ্বমাতার কর্মচারী।
কোষাধ্যক্ষের কর্তব্য—মায়ের সন্তানের কল্যানে ধন বিতরণ করুন।
আপনার কথা ভেবে দেখবো।

এক সপ্তাহ পরে—
এই দেখুন। এই দলীলে জনসাধারণের জন্যে প্রচুর সম্পত্তি দেওয়া হলো।
আমাকে এজন্যে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ধনদাতা নয় জ্ঞানদাতাই ধন্যবাদের পাত্র।
কেন?
মায়ের কাজ করে আপনি অমর হয়ে গেলেন।

এর পরে স্বামীজি লণ্ডনে ধর্মপ্রচার করতে আসেন। সেখানে মিস্ মার্গারেট-নোবলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।
মিস নোবল! তোমার মতো বিদুষী ত্যাগী মহিলা যদি ভারতীয় রমনীদের সাহায্য করে তো বড় ভাল হয়
বেশ স্বামীজি!

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজি উত্তর দিলেন—
আমাদের দেশের রমণীরা অন্তঃকরণে মহৎ, কিন্তু শিক্ষায় বড় পেছিয়ে আছে।
তবে দেখবো স্বামীজি।

স্বামীজি আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন। সেখানে ধর্ম-প্রচারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন।
স্বামীজি আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করলুম।
আরো চিন্তা করো।
আমায় শিষ্যা করে নিন, আমার জীবন আরো পবিত্র হোক। আমি ভারতে যাব।

বিলাতের সংবাদ পত্রের মতামত।
দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল
স্বামী বিবেকানন্দের মত অধিকতর দর্শনযোগ্য আর কোন ব্যক্তি বর্তমানে ইংলণ্ডে উপস্থিত নাই।

বিলাতের কোন এক গৃহের কোনে মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আলোচনা করছেন। তাঁরা স্বামীজির পরম ভক্ত।
মিসেস, এত লোকের সঙ্গে আলাপ করলুম, স্বামীজিকে তোমার কেমন লাগে।
অদ্ভুত! যিশু থাকলে বোধহয় এই রকমই মনে হতো। ওঁর কাছে দীক্ষা চাইলে হয় না?
আমারও তাই মত।

ছবিতে বিবেকানন্দ

এরপর স্বামীজি সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে জাহাজে করে ভারতে ফিরছেন। জাহাজে দুজন খৃষ্টান পাদ্রী তাঁর সঙ্গে ধর্ম নিয়ে তর্ক করে না পেরে হিন্দুধর্মকে গালাগালি দেয়।

স্বামীজি বিলাত থেকে প্রথমে সিংহলে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন দেওয়া হয়।
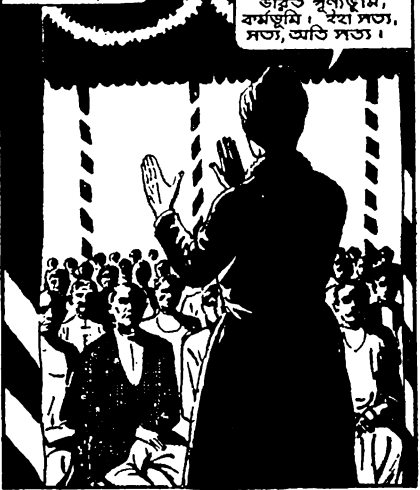
সিংহল থেকে স্বামীজি পাম্বান দ্বীপে এসে ধনুষ্কোটি বন্দরে নামেন। রামনাদের রাজা তাঁকে সেখানে অভ্যর্থনা করেন।

তারপর স্বামীজিকে ফিটন গাড়ীতে বসিয়ে, রাজা আর সকলের সঙ্গে তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন।

ছবিতে বিবেকানন্দ

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সহর ঘুরে মাদ্রাজে।
শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। উপনিষৎ আমাদের শক্তি লাভের উপদেশ দেয়।

মাদ্রাজ থেকে জাহাজে কলকাতায় খিদিরপুরে নেমে রেলে করে শেয়ালদা ষ্টেশনে। সেখান থেকে ছেলেরা স্বামীজিকে ফিটনে বসিয়ে ঘোড়ার বদলে নিজেরাই টেনে নিয়ে চললো হ্যারিসন রোড ধরে।
জয় স্বামীজির জয়!
জয় স্বামী বিবেকানন্দের জয়!

কোলকাতায়, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে জনসভা।
কলিকাতাবাসী যুবকগণ ওঠো, জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে… জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

স্বামীজি মাঝে মাঝে গোপাল শীলের বাগানে এসে থাকতেন। বহুলোক তাঁকে দেখতে আসতো।
স্বামীজি! ইনি গোরক্ষিণী সভার প্রচারক। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
বলুন।

টার থিয়েটারে জনসভা।
বেদান্ত প্রচার দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় হবে।

ছবিতে বিবেকানন্দ

প্রচারক তাঁর বক্তব্য জানালেন।
গো রক্ষার জন্যে লোকের কাছে চাঁদা নিয়ে পিঁজরাপোল তৈরী করি, কশাইদের হাত থেকে গরুকে বাঁচাই।
এখন মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ। সেখানকার লোকদের বাঁচানোর কি উপায়?

মানুষ তার কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। দুর্ভিক্ষে আমরা সাহায্য করি না।
এত নিষ্ঠুর কথা কি করে বললেন। তবে গোমাতারাও কর্মফলে কশাইয়ের হাতে নিহত হচ্ছেন।

তা বটে। তবে গাভী আমাদের মাতা।
তা বুঝেছি। তা না হলে আপনার মতো ছেলে জন্মাবে কোথা থেকে। যারা মানুষের দুঃখ বোঝে না, তাদের উপর আমার কোনও সহানুভূতি নেই।

স্বামীজি, একজন গৃহস্থ শিষ্যের সঙ্গে আলাপ রত।
যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতিটা মরেছে।
আমাদের কি করা উচিত।
সংগ্রামশীলতাই জীবন। বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম চাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজির উপদেশ ----
আমি কখনও বিশ্বাস করিনি যে, আমার দ্বারা কিছু হবেনা ------

---- তাই যে বিদেশীরা আমাদের লাথি ঝাঁটা মারতো তারাই আমাকে গুরু বলে প্রণাম করছে।
আমাদের কি আপনার মতো শক্তি আছে।
নিশ্চয় আছে। আত্ম-বিশ্বাস করা অভ্যেস কর। সুপ্ত শক্তি এখনি জেগে উঠবে।

১৮৯৭ সালে বলরামবাবুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনার সিদ্ধান্ত হয়।
সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ না করলে কোন বড় কাজ সম্পাদন করা কঠিন। এখন দেশে শিক্ষার অভাব। এখন সাধারণতন্ত্র সঙ্ঘে সুবিধা হবে না। তাই একজন DICTATOR বা পরিচালক। তাঁর আদেশ সকলে মেনে চলবে।

আরো বললেন ------
আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে সন্ন্যাসী হয়েছি। গৃহস্থ ভক্তরা তাঁর আদর্শ নিয়ে সংসার করছেন। তাই তাঁর নামেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হোক।
আমরা রাজী।

ছবিতে বিবেকানন্দ

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্থাপন।
সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হবে, সাধারণ-লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, শিল্পকলাদির উৎসাহ দান, বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে যেমন দেখা গেছে তা জনসমাজে জানানো----- রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

সকলে চলে যাবার পর, যোগানন্দ ও স্বামীজি।
সভা করা, বক্তৃতা করা, এসব তো বিদেশী ভাব
তুই কি করে জানলি, এসব ঠাকুরের ভাব নয়? সাধারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যা বুঝেছে তিনি তার চেয়ে অনেক বড়।

উপদেশ।
জীবই ঈশ্বর। জীবে সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

আলমোড়া, উত্তর ভারতে প্রচার করে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কলকাতায় এলেন।
মিস নোবল! আজ তোমায় ব্রহ্মচারিণী ব্রতে দীক্ষা দিলুম— তোমার নাম হলো নিবেদিতা।

ছবিতে বিবেকানন্দ
মিস নোবলের দীক্ষা হবার পর, স্বামীজির শরীর ভেঙে যেতে লাগল।
শরীরটা বড় ভেঙে পড়েছে। একবার দার্জিলিং যাব।
১৮৯৮ সালে বেলুড় মঠের জন্যে জমি ক্রয়। তারপর কলিকাতায় প্লেগের মড়ক। স্বামীজি দার্জিলিং থেকে ফিরে এলেন।
রামকৃষ্ণ মিসনের লোকের দ্বারাই পীড়িতের সেবা হবে। দরকার হলে মঠের জমি বিক্রি করে দেবো।
মঠের জন্যে বেলুড়ে গঙ্গার ধারে জমি ক্রয়ের পর, সেখানে মন্দির তৈরী হলো (পুরানো মন্দির)। স্বামীজির কাঁধে তামার কৌটায় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি।
ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকবো। নিশ্চই জানবি, বহুলোকের কল্যাণের জন্যে ঠাকুর ওখানেই স্থির হয়ে থাকবেন।
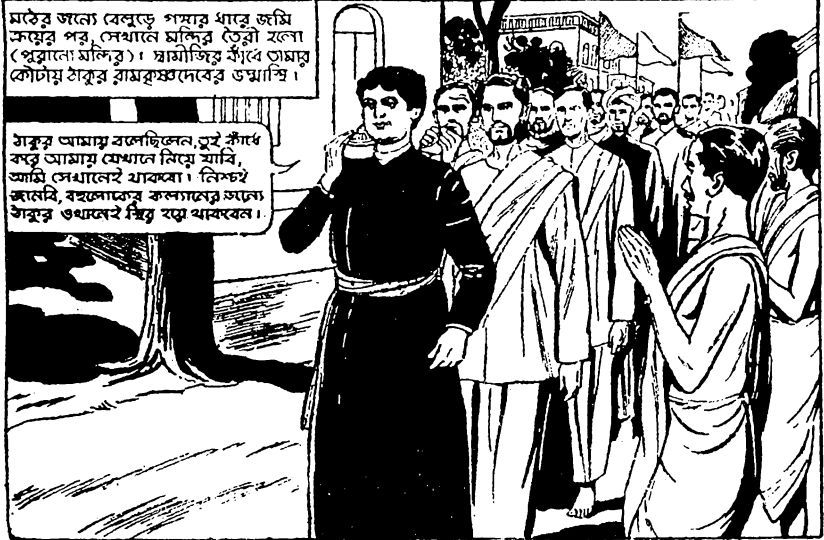
ছবিতে বিবেকানন্দ

১৮৯৯ সালে আবার বিলাত যাত্রা। সেখান থেকে আমেরিকা, সানফ্রান্সিস্কো প্রদেশে। একদিন একটা নদীর সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে একদল যুবক নদীতে ভেসে যাওয়া ডিমের খোলা টিপ করে বন্দুক ছুঁড়ছিল।

কিন্তু প্রত্যেকের লক্ষ্যই ব্যর্থ হচ্ছিল।
দ্যাখ, আমাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হচ্ছে দেখে ঐ লোকটা হাসছে।
ওকে অপদস্থ করতে হবে।

তারা স্বামীজির কাছে এগিয়ে আসে।
হাসছেন কেন? আপনি পারেন ডিমের খোলায় গুলি মারতে?
যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়
বন্দুকটা দিন।

স্বামীজি লক্ষ্য স্থির করে–

ছবিতে বিবেকানন্দ

স্বামীজি ভেসে যাওয়া ডিমের খোলায় গুলি করছেন —
পর পর এগারোটা খোলায় গুলি মেরেছি, এইবার বারোটায়....

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল ।
আপনার বুঝি অনেক দিনের অভ্যেস ?
না...

মনঃসংযমই সফলতার উপায়।
আমি আগে কখনও বন্দুক ছুঁড়িনি। তবে লক্ষ্যভেদ করা অতি সোজা। শুধু তীব্র একাগ্রতা দরকার

আমেরিকায় ধর্মোপদেশ ও মঠ স্থাপনের পাকা ব্যবস্থা করে তিনি প্যারিসে আসেন ।
এখানে ধর্মমহাসভায় ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করতে হবে। তাড়াতাড়ি ভাষাটা শিখে নিতে হবে।

ছবিতে বিবেকানন্দ

ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা —
বেদই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি। আর ভারতীয় সভ্যতা গ্রীকচিন্তার দ্বারা গঠনান্তর প্রাপ্ত হয়নি।

মাদাম কালভের অতিথি হয়ে, প্যারিস থেকে কনষ্টান্টিনোপল হয়ে, ১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে ইজিপ্টে গেলেন।
আমি এবার ভারতে যাব। খবর পেয়েছি আমার পরম ভক্ত মিঃ সেভিয়ার আর নেই।
আমার পিতা! (MON PERE) কবে আবার দেখা হবে।
১৯০২ এর ৪ঠা জুলাইয়ের পর আর হবেনা।

বেলুড় মঠে —
গেট খুলে দাও।
খবর দেইকিড়ি আউচি।

মালীর ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখে স্বামীজির হাসি পেল। কিন্তু তিনি আর মালীর ফেরার অপেক্ষায় থাকলেন না।
পাঁচিল টপকিয়েই ভিতরে যাই।

ছবিতে বিবেকানন্দ

সবাই তখন খেতে বসেছে। এমনি সময় মালী ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো।

একো সাহেবো আউচি।

স্বামীজি এসেছেন! স্বামীজি!

গেট তো বন্ধ, ঢুকলেন কি করে।

ছবিতে বিবেকানন্দ

কৌতূহল।

স্বামীজি আপনি করছেন কেন। এতো আমাদের কাজ।

যীশুখৃষ্টও করেছিলেন।

সেতো শেষ সময়ে!

জাতকের গল্প

নারায়ণ দেবনাথ

অনেকদিন আগে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। এই কলাবুর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক বিরাট বিত্তশালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সে জন্মে তাঁর নাম ছিলো কুণ্ডলকুমার। তক্ষশিলায় পড়াশোনা শেষ করে কুণ্ডলকুমার সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠলেন। তারপর গৃহধর্ম অবলম্বন করলেন। ইতিমধ্যে মাতা পিতার মৃত্যু হলো তখন কুণ্ডলকুমার তাঁর পিতার বিরাট ধনরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—

আমার বাবার যে এতো টাকাকড়ি কিন্তু তার কিছুই তো তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি! আবার উত্তরাধিকারসূত্রে আজ আমি সমস্ত অর্থের মালিক হয়েছি কিন্তু আমাকেও তো সব ফেলে রেখে যেতে হবে!

এই ভেবে কুণ্ডলকুমার দান আরম্ভ করলেন। দান করতে করতে তিনি সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। হিমালয় গিয়ে ফলমূল আহার করে ভগবানের চিন্তা করে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি।
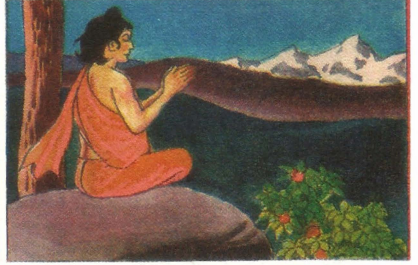
দীর্ঘকাল ফলমূল খেয়ে হিমালয়ে বাস করবার পর কুণ্ডলকুমারের ইচ্ছা হলো লবণ ও অম্ল খেয়ে মুখের রুচি ফেরাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেমে এসে বারাণসীর রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। একদিন ভিক্ষাপাত্র হস্তে কুণ্ডলকুমার রাজ-সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে সেনাপতি তাঁকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করালেন।

আহার শেষ হলে তিনি কুণ্ডলকুমারকে রাজোদ্যানে বাস করবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরে কুণ্ডলকুমার সেই রাজোদ্যানেই বাস করতে লাগলেন। একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্তপ্রায় হয়ে নর্তকীদলসহ উদ্যানে প্রবেশ করলেন— সেখানে তাঁর জন্যে সুকোমল শয্যা রচিত হলো। কলাবু এক নর্তকীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।
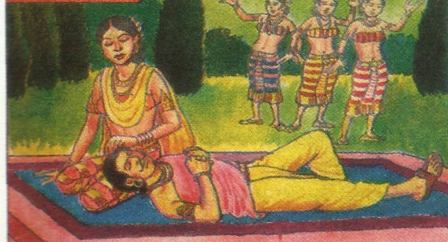
অন্য নর্তকীরা তখন গান-বাজনা ও নাচে তাঁর তুষ্টিবিধান করতে লাগলো। ক্রমে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন নর্তকীরা ভাবলো, যার জন্যে এই নৃত্যগীত তিনিই যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন আর এর প্রয়োজন কি? এই ভেবে তারা নাচ-গান বন্ধ করে উদ্যানে ঘুরতে লাগলো। এক সময়ে তারা দেখতে পেলো দেবতুল্য উজ্জ্বল এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তারা সকলে মিলে তখন গেলো সেই সন্ন্যাসী কুণ্ডলকুমারের কাছে। তারপর তাঁকে প্রণাম করে সকলে বললো—

জাতকের গল্প

কুণ্ডলকুমার ধীরে ধীরে তাদের ধর্ম-কথা শোনাতে লাগলেন। এদিকে রাজা কলাবু হঠাৎ জেগে উঠলেন। তারপর নর্তকীদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—
ওরা সব কোথায় গেলো?
ওরা সব তপস্বীকে ঘিরে বসে আছে।

এই কথায় রাজার ক্রোধ আরও বেড়ে গেলো। তিনি ভাবলেন কুণ্ডলকুমার নিশ্চয়ই একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী। তাই তিনি খড়্গ হাতে নিয়ে ছুটলেন তাকে শিক্ষা দিতে। নর্তকীদের মধ্যে যারা রাজার প্রিয়পাত্রী ছিলো তারা এসে রাজার হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিলো। রাজার ক্রোধও কিছুটা শান্ত হলো। তখন তিনি কুণ্ডলকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—
শ্রমণ, তুমি কোন মতাবলম্বী?
আমি ক্ষান্তিবাদী।

ক্ষান্তি কাকে বলে?
লোকে গালি দিলে, প্রহার করলে কিংবা মনে কষ্ট দিলেও মনে যখন ক্রোধ জন্মেনা তখন সেই মনোভাবকে বলে ক্ষান্তি।

রাজা তখন কুণ্ডলকুমারের ক্ষান্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জল্লাদকে ডাকলেন। জল্লাদ একহাতে কুঠার আর একহাতে কাঁটাওয়ালা ছড়ি নিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করলো। রাজা বললেন—
এই লোকটা ভণ্ড ও চোর। একে ঠেলে মাটিতে ফেলে কাঁটাওয়ালা ছড়ি দিয়ে দুই হাজার বেত্রাঘাত করো।

জল্লাদ তাই করলো। কুণ্ডলকুমারের চামড়া ছিঁড়লো, সর্বাঙ্গে রক্তের স্রোত বয়ে গেলো। কিন্তু সন্ন্যাসী শান্ত নির্বিকার! রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—
এখন বলতো, তপস্বী, তুমি কোন বাদী?
আমি ক্ষান্তিবাদী। মহারাজ! আপনি ভেবেছেন, আমার চামড়ার নীচে বুঝি ক্ষান্তি আছে, তাই চামড়া কেটেছেন। কিন্তু ক্ষান্তি আমার চামড়ার নীচে নয়, সে আমার হৃদয়ে আছে, আপনি তার নাগাল পাবেন না।

তারপর রাজার আদেশে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর হাত, পা নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হলো এবং প্রত্যেকবারই জিজ্ঞাসা করা হলো—
এবার বলো তুমি কোন বাদী?
আমি ক্ষান্তিবাদী। ক্ষান্তি আছে আমার হৃদয়ে, মহারাজ কোন অবস্থাতেই তার নাগাল পাবেন না।

জাতকের গল্প

রাজা যখন আর কোন প্রকারেই কুণ্ডলকুমারকে রাগাতে পারলেন না, তখন তাঁর বক্ষে পদাঘাত করলেন।
হতভাগ্য সন্ন্যাসী এই নাও।

রাজা চলে যাবার পর সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছে দিয়ে হাতে, পায়ে, নাকে ও কানে পট্টি বেঁধে দিলেন, তারপর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন—
রাজা আপনার প্রতি অত্যাচার করেছেন তার জন্যে যদি কারও উপর ক্রুদ্ধ হন, তবে যেন রাজার উপরই হন— অন্য কারো উপর নয়। আপনার ক্রোধে যেন রাজ্যের বিনাশ না হয়।

নাপতির কথা শুনে কুণ্ডলকুমাররূপী ধিসত্ত্ব বললেন—
যিনি আমাকে পীড়ন করেছেন, তিনি চিরজীবী হয়ে থাকুন। আমার পক্ষে ক্রোধ করা কখনও সম্ভব নয়।

ব্যথিত হৃদয়ে কুণ্ডলকুমাররূপী বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

সহসা পৃথিবী ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেলো ভেতর থেকে আগুন বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ফেললো।
রাজা সেই ভূগর্ভে পড়ে মহা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন।

কুণ্ডলকুমারও সেই দিনই দেহত্যাগ করলেন। রাজপুরুষেরা আর নাগরিকগণ যথাবিধানে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

জাতকের গল্প

একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতকের নামকরণ দিবসে রাজা আটশত ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রচুর উপহার দিলেন এবং জাতকের ভাগ্য কেমন হবে, জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণগণ জাতকের দেহে সর্ববিধ সুলক্ষণ দেখে বললেন—
এই কুমার সর্বগুণান্বিত রাজা হবেন। পঞ্চবিধ আয়ুধ বা অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কেউ আর এর সমকক্ষ হবেন না।

ব্রাহ্মণদের মুখে কুমারের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে জনক-জননী কুমারের নাম রাখলেন পঞ্চায়ুধ-কুমার। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হলে একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত পুত্রকে ডেকে বললেন—
গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য আছেন। তুমি সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস করে এসো।
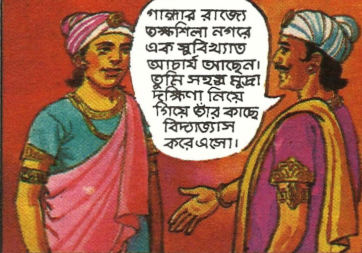
পিতার কথায় পঞ্চায়ুধকুমার তক্ষশিলা চলে গেলেন তারপর সেখানে বিদ্যাভ্যাস করে সর্ববিদ্যানিপুণ হয়ে ফিরে আসার সময় আচার্য তাঁকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দান করলেন। গুরুর আশীর্বাদ এবং পঞ্চবিধ আয়ুধ নিয়ে পঞ্চায়ুধকুমার এক বনপথ দিয়ে বারাণসীর দিকে চললেন। ঐ বনে ভীষণ এক যক্ষ বাস করতো। পথিকেরা পঞ্চায়ুধকুমারকে বার বার সাবধান করে দিলো। তারা বললো—
এই বনে যে যক্ষ বাস করে সে মানুষ দেখলেই মেরে ফেলে। কাজেই এই বনপথে এগোবেন না।

পঞ্চায়ুধ তাদের কথায় ভয় না পেয়ে নিজের শক্তির কথা মনে রেখে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুঃসাহসী মানুষকে একা বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ভীষণ মূর্তি ধরে এগিয়ে এলো যক্ষ। তার দেহ শালগাছের মতো, প্রকাণ্ড মাথা, চোখ দুটি গামলার মতো, উপরের দুটো দাঁত মুলোর মতো, মুখ বাজপাখির মতো, হাত-পা নীল এবং উদরের রং বিচিত্র।
কোথায় যাচ্ছো, দাঁড়াও, তুমি তো আমার খাদ্য'।

যক্ষের কথায় পঞ্চায়ুধকুমার ভয় পেলেন না। বললেন—
তুমি যক্ষ হতে পারো, কিন্তু সাবধানে আমার কাছে এগিয়ো। আমি আমার নিজের বল বুঝে এই বনে ঢুকেছি। বুঝেছো, আমার নিজের বল বুঝেই এই বনে ঢুকেছি। শুনে রাখো, আমার যে-কোন একটা তীরের আঘাতেই তোমার মৃত্যু হতে পারে।
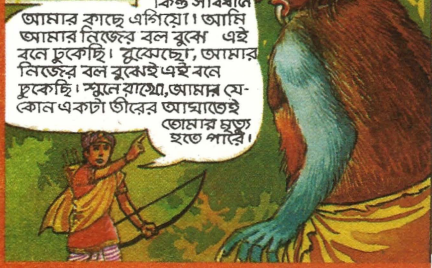
এই বলে কুমার যক্ষের দিকে এক অতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন।

জাতকের গল্প

কিন্তু কি আশ্চর্য—এই তীর যক্ষের দেহ স্পর্শও করলো না। তা যক্ষের দেহের রোমের মধ্যেই আটকে রইলো। কুমার তখন একে একে পঞ্চাশটি তীর নিক্ষেপ করলেন—কিন্তু সব তীরই আগের মতো যক্ষের রোমের মধ্যে আটকে রইলো। তখন যক্ষ একটা গা ঝাড়া দিলো, আর ঝর ঝর করে সব তীরগুলি তার দেহ থেকে মাটিতে পড়ে গেলো।

এদিকে যক্ষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—কুমারকে সে খাবে। কুমার তাঁর যে সমস্ত অস্ত্র সম্বল ছিলো একে একে সবগুলিরই ব্যবহার করলেন কিন্তু কিছুই হলো না। তখন তিনি ঝাঁপিয়ে, পড়লেন যক্ষের উপর। ডান হাত দিয়ে আঘাত করতে তাঁর ঐ হাত যক্ষের রোমে আটকে রইলো। তারপর ক্রমে বাঁ হাত, ডান পা, বাঁ পা এবং শেষপর্যন্ত মাথা দিয়ে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত পা মাথা সমস্ত যক্ষের রোমে আটকে গেলো। কুমার যক্ষের দেহে ঝুলতে লাগলেন॥ কিন্তু তখনও তাঁর মনে ভয় জাগেনি।

কুমারের এই অদ্ভুত সাহস দেখে যক্ষও অবাক হলো। এতোদিন সে মানুষ ধরে খাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষই তো এতোটা সাহস দেখায়নি। যক্ষের নিজের মনেও একটু ভয় হলো—সে পঞ্চায়ুধকুমারকে খেতে সাহস করলো না, তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—

কুমারের কথা শুনে যক্ষ আরও ভয় পেলো। তার মনে হলো, কুমারের কথাই সত্যি। এই ভেবে সে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে বললো—

তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি দেশে ফিরে যাও।

আমি তো মুক্তি পেলাম, কিন্তু তোমার মুক্তির কি উপায় হবে? এইভাবে যদি জীবন কাটাও তবে কোনো জন্মেই আর মুক্তি পাবে না।

এই বলে কুমার যক্ষকে দান, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। যক্ষও ভয় পেয়ে হিংসা ক্রোধ আদি ত্যাগ করে সংযমী হলো। অতঃপর সে বনের দেবতারূপে অধিষ্ঠিত হলো। এবং মানুষের দেওয়া পূজো উপহারাদি গ্রহণ করতে লাগলো।

যক্ষের প্রকৃতি পরিবর্তন বিষয়ে সবাইকে সংবাদ দিতে দিতে কুমার সানন্দে বারাণসীতে ফিরে এলেন।

জাতকের গল্প

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করতেন, তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠী। যেদিন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী পুত্র প্রসব করলেন, সেদিন তাঁদের এক দাসীরও পুত্র হলো। দুটি সন্তানই একসঙ্গে থাকে, খেলাধুলা করে—একসঙ্গেই বড় হয়। বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন পাঠশালায় পড়তে যায়, তখন দাসীর পুত্রও তার সঙ্গে সঙ্গে যায় কাঠের তক্তা নিয়ে। সেখানে গিয়ে দাসীর পুত্রও লিখতে পড়তে শিখলো। কালক্রমে সে একজন মহা চতুর ব্যক্তি হয়ে উঠলো। দেখতে শুনতেও সে বেশ ভালোই ছিলো। দাসীর এই পুত্রের নাম হলো কটাহক।
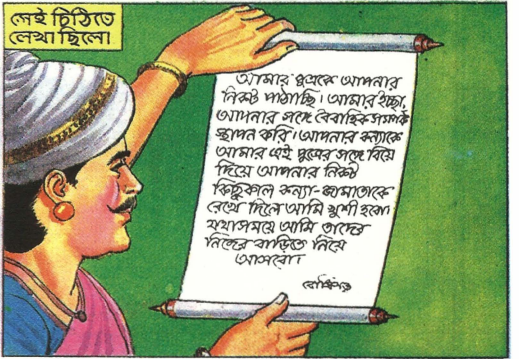
সে চিঠির নীচে বোধিসত্ত্বের নাম লেখা ছিলো। বলা বাহুল্য—এই চিঠি ছিলো কটাহকের নিজেরই লেখা। কিন্তু শ্রেষ্ঠী তো আর অতশত জানেন না! তিনি সুন্দর এবং চতুর কটাহককেই বন্ধু বোধিসত্ত্বের পুত্র বলে ধরে নিলেন এবং মহা আনন্দে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

খুব আনন্দে দিন কাটাচ্ছে কটাহক। তার চালচলনে কোন দোষত্রুটি কেউ দেখতে পায় না। শুধু এক বিষয়ে তার খুঁতখুঁতি—কোন রকম রান্নাই কটাহকের পছন্দ হয় না। সে বলতো—
নগরের বাইরে যারা থাকে, তারা কি রাঁধতে পারে? না, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদের মর্যাদা বোঝে?

তার কথা শুনে সবাই চুপ করে থাকে।

এদিকে বোধিসত্ত্ব ক'দিন ধরে কটাহককে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ করবার জন্যে লোক লাগালেন। একজন এসে জানালো—
সে আপনার শ্রেষ্ঠী বন্ধুর কন্যাকে বিবাহ করে সেখানেই জামাই আদরে আছে।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন—
কটাহক বড় অন্যায় কাজ করেছে, আমি গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবো।

এই ভেবে বোধিসত্ত্ব লোকজন নিয়ে তৈরি হলেন তাঁর পূর্বোক্ত বন্ধুর বাড়ি যাবার জন্যে। খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
শুনেছো! আমাদের শ্রেষ্ঠী নগরের উপান্তে তাঁর শ্রেষ্ঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন।
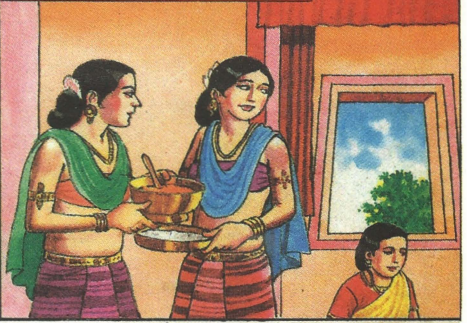
যথাসময়ে কটাহকও সেই খবর শুনতে পেলো।
বুঝতে পারছি, আমার সংবাদ পেয়েই প্রভু আসছেন—নতুবা তাঁর আসবার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। যদি পালিয়ে যাই—তবে আর ফিরে আসার উপায় থাকবে না।

জাতকের গল্প

কিন্তু তাকে দাসের মতো সেবা করতে দেখে লোকে যদি কিছু ভাবে!—এই ভেবে তার উপায় আগেই করে রাখলো! সে লোকদের বলে বেড়াতে লাগলো—
প্রত্যেক সন্তানেরই মাতাপিতার সেবা করা কর্তব্য—মাতাপিতার সেবায় দাসের সঙ্গে পুত্রের কোন পার্থক্য থাকাই উচিত নহে।

এইভাবে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়ে সে তার শ্বশুরকে গিয়ে বললো—
আমার পিতা আসছেন—সুতরাং আমারই উচিত তাঁকে সংবর্ধনা করে নিয়ে আসা।

শ্রেষ্ঠী কটাহকের কথায় খুশি হয়ে তার সঙ্গে প্রচুর উপহার পাঠিয়ে দিলেন। কটাহকও জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার প্রভুকে প্রণাম করে উপহার সামগ্রী তাঁকে প্রদান করলো।
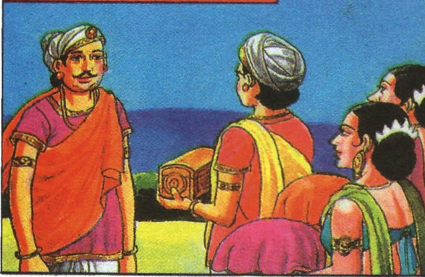
বোধিসত্ত্ব পুরীতে প্রবেশ করে তাঁবু খাটালেন! কটাহক তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে দাসের মতোই সেবা করতে লাগলো। কটাহকের সেবা দেখে বোধিসত্ত্ব খুব খুশি হলেন—এই অবসরে কটাহক তাঁকে অনুরোধ করলো—
প্রভু, দয়া করে আমার প্রকৃত পরিচয় দিয়ে এখানে আমার যা খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, তা নষ্ট করবেন না।
বেশ, এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবো না।

একদিন বোধিসত্ত্ব কটাহকের স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—
কটাহকের আচার-ব্যবহারে কোন খুঁত নেই তো?
তার চরিত্রে দোষ নেই—শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে যা কিছু গণ্ডগোল।

তখন বোধিসত্ত্ব তাকে একটি ছড়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন, সে খেতে বসলে এই মন্ত্রটি বলবে তাহলে আর কোন গণ্ডগোল থাকবে না। বোধিসত্ত্ব চলে যাওয়ার পর যখন কটাহক খেতে বসেছে, তখন তার স্ত্রী মন্ত্রটি বললো।
পরবাসীর দেমাক বেশি ভালো কভু নয়, প্রভু পুনঃ আসবে যবে দেখবে কি যে হয়। এতো বেশি বাড়াবাড়ি তোমার নাহি সাজে, খেয়ে যাও কটাহক আপনার কাজে।
কটাহক বুঝতে পারলো, বোধিসত্ত্ব তার পরিচয় প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তখন থেকে তার দুর্মতিও সব দূর হয়ে গেলো।

জাতকের গল্প

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে জন্মে নিজ কর্মফলে বোধিসত্ত্ব স্বর্গরাজ ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। কোন বিশিষ্ট বংশের একটি যুবকের তখন পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর সেই যুবকটি তার মাকেই দেবতাজ্ঞান করে সেবা-শুশ্রূষা কোরতো। দিনের সর্বক্ষণই সে মাতার জন্যে কিছু না কিছু কাজ করতো। এদিকে মা দেখলেন—ছেলের বয়স হয়েছে, এখন বিয়ে করে তার গৃহ-ধর্ম পালন করা উচিত। তাই ছেলেকে ডেকে বললেন—

কিন্তু যুবকের মনে ভয়—বিয়ে করলে সে আর সর্বক্ষণ মাতৃসেবা করতে পারবে না। এই ভয়ে সে বললো—
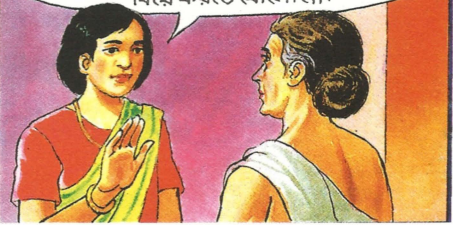
কিন্তু তার মা তার কথায় কান না দিয়ে এক পাত্রী স্থির করলেন। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে না পেরে যুবক বিয়ে কোরলো, কিন্তু সে মন-মরা হয়ে রইলো। এদিকে বিয়ের পর বৌ এসেছে। সে দেখতে পেলো তার স্বামী সর্বক্ষণই মাতৃসেবা করছেন। তখন বৌটি ভাবলো আমিও যদি শাশুড়ীর সেবা করি, তাহলে নিশ্চয়ই স্বামী সন্তুষ্ট হবেন। এই ভেবে বৌটিও শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করতে লাগলো। যুবকটি এই ব্যাপার দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলো। সে খুশি হয়ে স্ত্রীকে নানারকম ভালো ভালো খাদ্য এবং উপহার এনে দিতে লাগলো। তখন বৌটি আবার ভাবলো—

এই ভেবে সে স্বামীর নিকট শাশুড়ীর নামে নালিশ করতে লাগলো। কিন্তু স্বামী তার কথায় কানই দেন না। তখন বৌটি ভাবলো এ বুড়িকেই উত্ত্যক্ত করে স্বামীর অপ্রীতিভাজন করে তুলবো। তারপর থেকে সে শাশুড়ীর সেবা তো করতোই না, উপরন্তু নানাভাবে শাশুড়ীকে নাকাল করতে চেষ্টা করতো। কোনদিন হয়তো তরকারীতে লবণ দিতো না, কোনদিন হয়তো বেশী দিতো। শাশুড়ী যদি বলতেন লবণ কম হয়েছে, তবে বৌটি এক মুঠো লবণ এনে মিশিয়ে দিতো। ফলে লবণ অনেক বেশী হয়ে যেতো। শাশুড়ী বলতেন লবণ বেশী হয়ে গেছে। তখন বৌটি পাড়াপড়শীদের ডেকে বলতো—

এমনিভাবে রোজ রোজ নানাভাবে বৌটি শাশুড়ীকে উত্ত্যক্ত করতে লাগলো। তাছাড়া ঘর-দোরও অত্যন্ত নোংরা করে রাখতো সে। তার স্বামী এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বলতো—

রোজ রোজ মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ শুনে যুবকটি ভাবলো তার মায়েরই বুঝি দোষ। তাই মাকে তাড়িয়ে দিলো। তার মা অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে দিন কাটাতে লাগলেন। এদিকে কিছুদিন পরে বৌটির এক ছেলে হোলো। তখন সে বলে বেড়াতে লাগলো

জাতকের গল্প
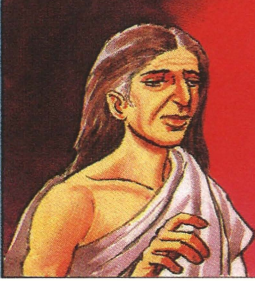
এই ভেবে তিনি স্থির করলেন ধর্মের পিণ্ডি দেবেন। তারপর কিছু তিলবাটা, চাল, একটা হাঁড়ি ও হাতা নিয়ে শ্মশানে গেলেন এবং তিনটি মড়ার মাথার খুলি নিয়ে পিণ্ডি রাঁধতে বসলেন। এদিকে স্বর্গ থেকে বোধিসত্ত্ব দেখলেন—ধর্মের মৃত্যু হয়েছে ভেবে বুড়ি তাকে পিণ্ডদান করতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রাহ্মণের বেশে শ্মশানে গিয়ে বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন—
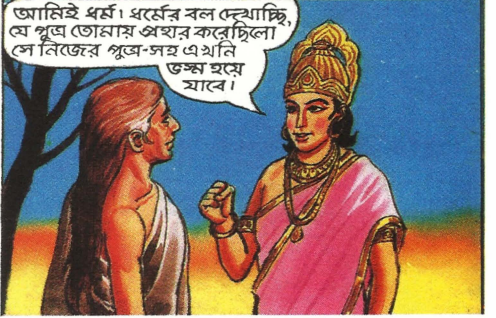
জাতকের গল্প

পুরাকালে বৎসরাজ্যে কৌশাম্বী নামে এক নগর ছিলো। ঐ কৌশাম্বী নগরের রাজা ছিলেন কৌশাম্বিক। তাঁর রাজত্ব-কালে নিগম গ্রামে দু'জন ব্রাহ্মণ ছিলেন — তাঁরা উভয়েই ছিলেন মহাধনী। তাঁদের একজনের নাম দ্বৈপায়ন, আর অপরজনের নাম মাণ্ডব্য। আবার দু'জনেই ছিলেন পরম বন্ধু। বিষয়-বাসনার দোষ দেখতে পেয়ে দু'জনেই নিজেদের সমস্ত ধন দান করে বাড়ি ছাড়লেন। তারপর হিমালয়ে আশ্রম তৈরি করে তাঁরা ফলমূল কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এইভাবে পঞ্চাশ বছর গেলেও তাঁরা ধ্যানবল লাভ করতে পারলেন না।
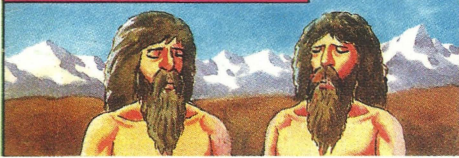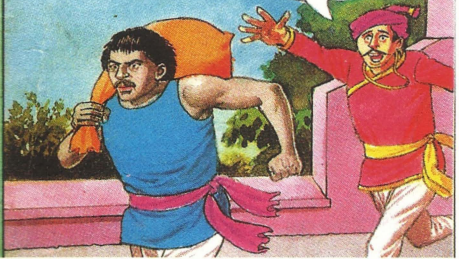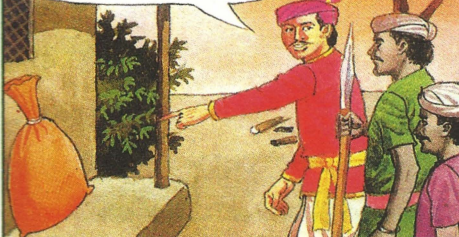
তারপর একদিন তাঁরা লবণ আর টক খাবার ইচ্ছায় ভিক্ষা করতে করতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেখানেও মাণ্ডব্য নামে গৃহী থাকতেন। দ্বৈপায়ন আর তপস্বী মাণ্ডব্য সেই গৃহীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানেই তাঁরা কুঁড়েঘর তৈরি করে বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা আর ঔষধ পেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তিন চার বছর বাস করবার পর এক শ্মশানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। দ্বৈপায়ন কিছুকাল পর আবার এক গৃহীর নিকট চলে গেলেন, কিন্তু মাণ্ডব্য শ্মশানেই রয়ে গেলেন।
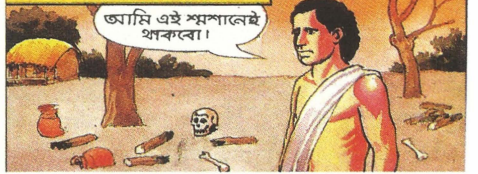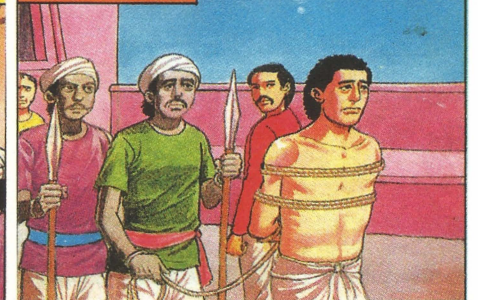
জাতকের গল্প

প্রথমে তাঁকে খয়ের কাঠের শূলে চড়ানো হলো, কিন্তু শূল বিঁধলো না। পরে নিম কাঠের শূলে চড়ানো হলো, কিন্তু সেই শূলও তাঁর দেহে বিঁধলো না। তখন মাণ্ডব্য পূর্ব জন্মের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এক জন্মে আবলুস কাঠের একটা কাঠিতে আমি মাছিকে বিঁধিয়েছিলাম। সেই জন্মে আমি এক ছুতোরের ছেলে ছিলাম। কাঠের কুঁচি নিয়ে খেলার ছলে আমি ঐ কাজটি করেছিলাম। পূর্বজন্মের এই পাপেই আমাকে শূলযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—এ পাপের হাত থেকে মুক্তি-লাভের কোন উপায় নেই।

তারপর তারা মাণ্ডব্যকে আবলুস কাঠের শূলে চড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিকে দ্বৈপায়ন অনেকদিন মাণ্ডব্যকে দেখতে না পেয়ে তাঁর খোঁজ নিতে বের হলেন।
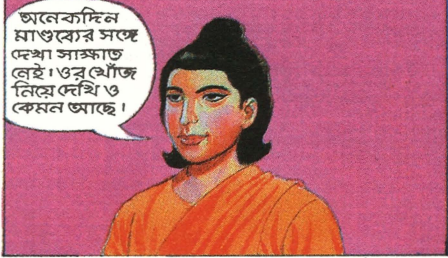
অনেকদিন মাণ্ডব্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত নেই। ওর খোঁজ নিয়ে দেখি ও কেমন আছে।

জাতকের গল্প

এই বলে দ্বৈপায়ন তাঁর ছায়ায় বসে রইলেন। মাণ্ডব্যের দেহের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দ্বৈপায়নের দেহে পড়ে তা কালো কালো দাগে পরিণত হলো। সেই থেকে দ্বৈপায়নের নাম হলো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

প্রহরীরা দূর থেকে এই ব্যাপার দেখে রাজাকে খবর দিলো। তখন রাজার মনে হলো —

তিনি ছুটে গেলেন তাঁদের কাছে। তারপর দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করে বললেন—

রাজা স্বীকার করলেন —

একথা শুনে দ্বৈপায়ন রাজাকে রাজধর্ম বুঝিয়ে দিলেন। তারপর মাণ্ডব্যকে শূল থেকে নামিয়ে আনা হলো। কিন্তু শূল আর তাঁর দেহ থেকে খোলা গেলো না। যে অংশ দেহের বাইরে ছিলো সে অংশ কেটে ফেলা হলো। রাজা তপস্বীদের প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নিজের উদ্যানেই তাঁদের জন্যে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়ে তাঁদের বসবাসের ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন।

শেষ

নারায়ণ দেবনাথের করা স্কেচ।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত নবকল্লোলের গল্পে খসড়া আঁকা

১৯৭৪

১৯৭৯
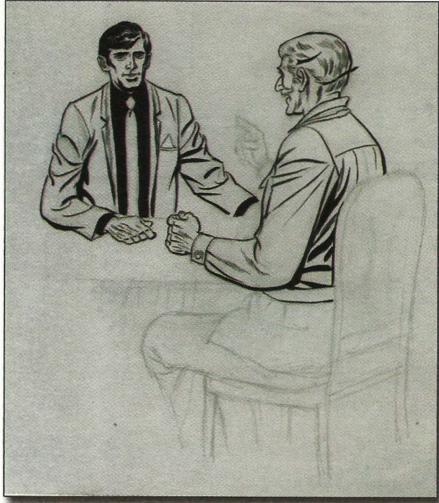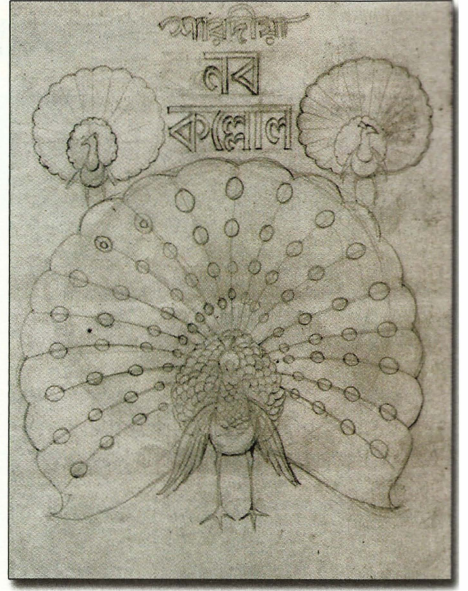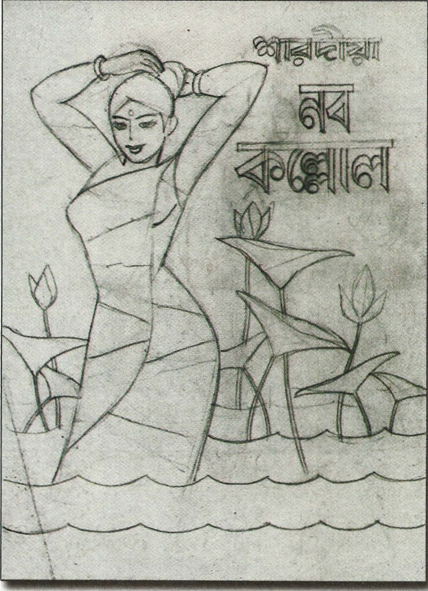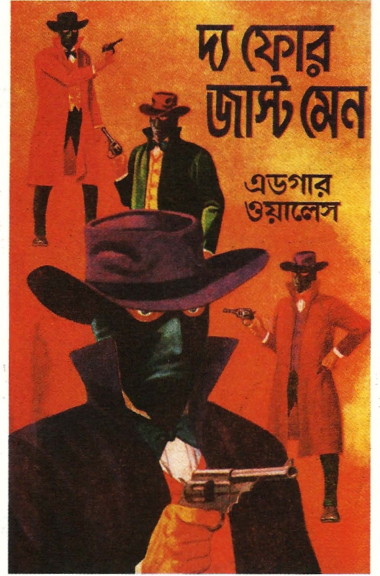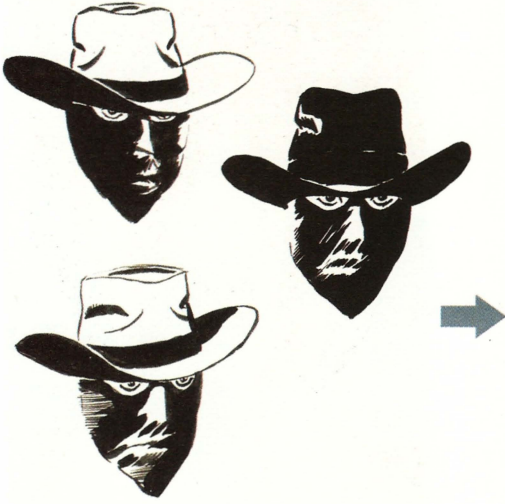
খসড়া স্কেচ ও তার পরিপূর্ণ রূপ।

স্মৃতির সোপান বেয়ে

নারায়ণ দেবনাথের আত্মজীবনী

আমার জন্ম এই হাওড়া শহরের শিবপুর অঞ্চলেই আনুমানিক ১৯২৫ সালে। তখন এই শিবপুর অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল আমাদের এই শিবপুর অঞ্চল। বাড়ির কাছেই পাবলিক লাইব্রেরিতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত আর সারারাত সেই জলসা চলত। কিশোর বয়সে আর পাঁচটা ছেলের মতোই আমাকে বাড়ির কাছেই এক পাঠশালায় দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু হল পড়াশুনা। তারপর স্কুল। আমি যে-স্কুলে ভরতি হলাম সে স্কুলের নাম বি. কে. পাল ইনস্টিটিউশন। সেই সময় এখনকার মতো কিন্ডারগার্টেনের কোনো বিভাগ ছিল না আর এখন যেমন প্রায় দুগ্ধপোষ্যকে নার্সারিতে ভরতি করানো হয় সেসব কিছুই তখন ছিল না। তাই আমাকে প্রথম শ্রেণিতে ভরতি করা হল।

আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের, অধুনা বাংলাদেশের। আমার ঠাকুরদার তিন ছেলে— বড়ো বসন্তকুমার, মেজো হেমচন্দ্র এবং ছোটো বনমালী। আর আমি হলাম ঠাকুরদার মেজো ছেলের ছেলে নারায়ণ। আমার বাবা আর কাকা বহু আগেই এই শিবপুরে এসে সোনা রুপোর ব্যাবসা অর্থাৎ গয়না তৈরির দোকান করেন। সে সময় আমাদের সেই দোকান খুবই সুখ্যাতি লাভ করেছিল। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে পয়লা বৈশাখ হালখাতা হত। অঞ্চলের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসতেন। খুব আনন্দ হত।

মনে আছে হালখাতা খোলা উপলক্ষ্যে দোকান সাজানো হত। বাইরে নীল রংয়ের আলোর ডুম অর্থাৎ বাল্ব দিয়ে সাজানো হত। আমাদের যে দোকান সেটা রাস্তা থেকে প্রায় একবুক সমান উঁচু ছিল তাই দোকানে উঠতে হলে গোটা চারেক ধাপ বেয়ে উঠতে হত আর সেই ওঠার সিঁড়ির দু-পাশে দেবদারু গাছের পাতা দিয়ে সাজানো হত। আর দোকানের গ্রাহক, যাঁদের কাছে টাকা পাওনা থাকত, তাঁরা আসতেন। অবশ্য তাঁদের ছাপানো আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হত। তখন কাগজের নোটের প্রচলন হয়নি। তাঁরা পাওনা টাকা সব কয়েনে দিতেন যাকে বলা হত কাঁচা টাকা। তবে সেই টাকা কিন্তু সব খাঁটি রুপোর টাকা। তখন ইংরেজ রাজত্ব, তাই টাকাতে রানি ভিক্টোরিয়া, পঞ্চম জর্জ তারপর ষষ্ঠ জর্জ এঁদের মুখ থাকত। যাই হোক যা বলছিলাম, সেই নতুন খাতা উপলক্ষ্যে যে নিমন্ত্রিতরা টাকা দিতে আসতেন তাঁদের জন্য মিষ্টি আর শরবতের ব্যবস্থা থাকত। শরবত দু-রকমের হত। দুটো বড়ো জালার একটায় থাকত সিদ্ধি দেওয়া শরবত আর একটায় সাদা শরবত। যিনি যেটা পছন্দ করতেন সেটা খেতেন যত ইচ্ছা। তারপর তাঁদের জন্য মিষ্টি সাজানো থাকত, তাই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হত। তবে শুধু যে গ্রাহকদেরই তা দেওয়া হত তা নয় স্থানীয় ছোটো ছেলেরাও ভিড় করত; তাদের শরবত আর মিষ্টি দেওয়া হত। তবে তাদের অবশ্যই সাদা শরবত দেওয়া হত। সেই আনন্দের দিন এখনও চোখের সামনে ভাসে।

যাইহোক এবার ফিরে আসি হাওড়ার শিবপুরের কথায়। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ারই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। একজন ছিল গায়ক, তবে নামজাদা নয়। আমাদের গায়কবন্ধু আমাদের থেকে বড়ো; দাদা বলে ডাকতাম। সে তখন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে গান গাইত (এখন নাম পালটে হয়েছে আকাশবাণী)। আমরা মাঝেমধ্যে বন্ধুরা মিলে গানের আসর বসাতাম। সবাই উৎসাহ দিত। তখন লোকজনও ছিল কম, সহজ সরল জীবনযাত্রা ছিল। আমাদের শিবপুরের রাস্তায় যানবাহন বলতে সাইকেল, হাতে টানা রিকশা, কস্মিনকালে ভাড়া করা চার চাকার মোটরগাড়ি হুড দেওয়া।

যানবাহন বলতে আর একটা ছিল ঘোড়ার গাড়ি, মানে ঘোড়ায় টানা গাড়ি। আমরা ছোটোবেলায় সেই গাড়িতে করে আন্দুল রাজবাড়ির রাস দেখতে যেতাম। সে সময় আন্দুলের রাস খুব বিখ্যাত ছিল। এখনও হয় কিনা জানি না। ওই গাড়ি করে আমরা রামরাজাতলার রামঠাকুরও দেখতে যেতাম। গাড়ি ছাড়া আমার ঠাকুরমার সঙ্গে হেঁটেও রামরাজাতলায় গিয়েছি। আমার ঠাকুরমা প্রতি বছর প্রথম রামপুজার দিন গঙ্গা স্নান করে পুজো দিয়ে আসতেন। অবশ্য গঙ্গাস্নান তিনি রোজই করতেন। আবার, প্রতি বছরই আমরা বাড়ির সবাই গঙ্গাঘাট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গা থেকে খালের মতো ঢোকা আদিগঙ্গা দিয়ে কালীঘাটের ঘাটে গিয়ে পৌঁছোতাম। তারপর সারাদিন থেকে পুজো দিয়ে আবার ওই নৌকাতেই ফিরে আসতাম। তারপর কাকা মারা যাওয়ার পর বাবার আর এ-বিষয়ে কোনো উৎসাহ রইল না; যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছি। তারপর বিশ্বযুদ্ধ লাগল। দিন তারিখ মনে নেই কিন্তু বছরটা মনে আছে উনিশশো উনচল্লিশ সাল।

তারপর তো যুদ্ধ নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। রটে গেল জাপান কলকাতায় বোমা ফেলবে। অবশ্য তখন কলকাতার রেড রোডে ব্রিটিশ তাদের ফাইটার প্লেন ওঠা নামার রানওয়ে বানিয়েছিল। আর ব্রিটিশ আফ্রিকান সৈন্যদের জন্য ঢালু চালা দেওয়া লম্বা গুদাম ঘরের মতো ক্যাম্প চারদিকে করেছিল। সেই সময় আমি স্কুলের পাট সাঙ্গ করে আর্ট স্কুলে ভরতি হলাম। প্রথমে একটা প্রাইভেট স্কুলে ভরতি হলাম পরে সেই আর্ট স্কুলটা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের সঙ্গে মিশে গেল। আমি যখন আর্ট স্কুলে যাচ্ছি তখন পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। যে বোমা পড়ার কথা বলেছি সেই জাপানি বোমার ভয়ে তখন সবাই, কলকাতা হাওড়াসহ অনেক অধিবাসীরাই যে যার দেশে পালিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ির পাশেই যাঁরা ছিলেন তাঁরাও চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের পূর্ববঙ্গে জ্যাঠামশাই জেঠিমা থাকলেও আমরা শহর ছেড়ে যাইনি। যাক, যে-কথা বলছিলাম আমার আর্টস্কুলে যাওয়ার রাস্তা ছিল এখনকার মতো ভুটভুটি লঞ্চ নয়, ছিল হোর মিলার কোম্পানি নামে একটা কোম্পানির স্টিমার। সেই স্টিমারে উঠে বাবুঘাট, ওখান থেকে ইডেন উদ্যানের ধার দিয়ে হেঁটে এখন যেখানে আকাশবাণী হয়েছে সেটা ছাড়িয়ে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে ধর্মতলায় পড়ে সোজা এগিয়ে ওয়েসলী ওয়েলিংটন ক্রসিং পার হয়ে সোজা একেবারে প্রায় মৌলালির কাছেই ছিল আগের ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। একটা খুব পুরোনো বাড়িতে কলেজ। এখন ওই কলেজ দমদমে চলে গেছে বিরাট বাড়ি তৈরি করে। আমি সেসময় আর্ট কলেজে যাবার পথে রেড রোডে ফাইটার প্লেনের ওঠানামা করতে দেখেছি। আমাদের সময়ের কলেজের প্রিন্সিপাল আমার হাতের ড্রয়িংয়ের কাজ দেখে আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।

যাক সে-কথা, আর্ট কলেজে আমার বিষয় ছিল ফাইন আর্ট। কিন্তু কলেজ থেকে বেরোবার পর কী করব, পেন্টিং কোন কাজে লাগবে তাই নিয়ে ভেবে অস্থির হলাম, কারণ অর্থের প্রয়োজন। এর মধ্যে বাবা মারা গেলেন। আমার শেখা বিদ্যা দিয়ে অর্থকরী কাজ কিছু নেই। সে

সময় এখনকার মতো আর্টের নানা সুযোগ ছিল না। তবু তার মধ্যেই পরিচিতের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ, যেমন, কোনো লোকাল কোম্পানির সিঁদুর বা পাউডারের লেবেলের ডিজাইন এইসব কাজ আর সিনেমা স্লাইডও করতাম। তখন সিনেমা হলে কোনো ছবি চলাকালীন মাঝে বিশ্রাম দেওয়া হত। সেই সময় আবার ছবি শুরু আগে ওই স্লাইড দেখানো হত। ওটাই ছিল তখন ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার মাধ্যম। আবার কিছু চলচ্চিত্রের টাইটেলও লিখেছি। এই ছিল তখন আমার কাজ।

এর মধ্যেই আমার পিতৃদেব আমার বিবাহের ব্যাপার ঠিক করে ফেললেন। যাইহোক বিবাহের দিন ঠিক হল। আত্মীয়স্বজনকেও আমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু ঠিক আমার বিবাহের দিনই অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক ঘটনা। জানা গেল সেইদিনই ঘটে গেছে গান্ধী হত্যার ঘটনা। পরিণতিতে অনেক রাস্তায় আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বত্রই একটা থমথমে ভাব। আমাদের বাড়ির লোকেদের মাথায় হাত। ট্রাম বাস সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমন্ত্রিতরা আসবেন কী করে? পরিবহণের অভাবে অনেকেই আসতে পারেননি আর যাঁরা এসেছেন সব পায়ে হেঁটে। ওই অবস্থাতেই বিয়ের পর্ব মিটল। এই ঘটনা আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে। তারপর যা কাজের কথা বলছিলাম, সেসব আমার

খুব একটা মনোমতো হচ্ছিল না। আমি চাইছিলাম ছবি আঁকার কাজ কিন্তু সে-কাজ আমি পাব কোথায়? কে দেবে? এখন যেমন নানা ধরনের পত্রপত্রিকা আছে সে সময় কিছুই ছিল না বলতে গেলে। এইভাবে চলতে চলতে জানলাম যে শুকতারা নামে একটা ছোটোদের পত্রিকা বেরিয়েছে। একটা পত্রিকা হাতেও এল। পত্রিকা খুলে ভেতরের গল্প আর ইলাসট্রেশন দেখে দারুণ ভালো লাগল। মনে হল আমিও তো এভাবেই গল্পের ছবি আঁকতে চাই। পত্রিকা দেখলাম, কিন্তু কারা এর প্রকাশক তা আমার জানা ছিল না। এর আগেও যে কয়েকটা ছোটোদের পত্রিকা ছিল তা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন একটা খুব নামি ছোটোদের পত্রিকা ছিল 'শিশুসাথী'। কিন্তু সেটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

যা বলছিলাম শুকতারা হাতে পেয়ে ভালো লাগলে কী হবে, কারা এর প্রকাশক, কোথায় তাদের ঠিকানা কিছুই জানা নেই। এইভাবে বছর কয়েক কেটে গেল। আমি সেই পুরোনো কাজই করে যাচ্ছি। এর মধ্যে আমার বিবাহসূত্রের পরিচয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার একজনের সঙ্গে পরিচয় হল। তার কাছে জানতে পারলাম যে শুকতারা পত্রিকার প্রকাশক সংস্থার নাম দেব সাহিত্য কুটীর। এও জেনেছিলাম যে ওদের ছোটোদের জন্য গল্প আর ছবিতে ভরা অনেক বই আছে এবং তখনকার নামকরা শিল্পীরা ওদের বইয়ের ছবি আঁকেন। যাইহোক সেই আলাপ হওয়া ভদ্রলোক আমাকে বললেন সুবোধ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। সুবোধবাবু তখন ছিলেন দেব সাহিত্য কুটীরের কর্ণধার। তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন শুনে আমার মনে যে-আনন্দ হল তা ভাষায় বোঝানো যায় না। মনে হচ্ছিল আমি এতদিন ধরে যা চাইছিলাম তা বোধ হয় পেয়ে গেলাম। যাই হোক একদিন আমাকে বললেন যে কাল আপনাকে সুবোধবাবুর কাছে নিয়ে যাব। একটা কথা বলা হয়নি যিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বলেছেন তিনি ওদের প্রুফ দেখতেন। সেই সুবাদেই সুবোধবাবুর সঙ্গে তাঁর বেশ খাতির ছিল। কথমতো পরদিন আমাকে নিয়ে সুবোধবাবুর কাছে গেলেন। অবশ্য তার আগে আমাকে ওঁর পরিচিত একজন কুমারসম্ভব গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের ছবি করে দিয়েছিলেন সেগুলি দেখাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে দেখলাম রাশভারী একজন বসে আছেন। যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন যে, সুবোধবাবু আমি এর কথাই বলেছিলাম। সঙ্গে আমার আঁকা ছবিও দেখালেন। আমি তখন ভাবছি যেখানে সে সময়ের বাঘা বাঘা ছবি আঁকিয়েরা ছবি আঁকছেন সেখানে আমার আঁকা ছবি কি পাত্তা পাবে। কিন্তু মনের সব দুর্ভাবনা কাটিয়ে উনি বললেন একটা কথা— চলবে। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম আর সেদিনই উনি আমাকে শুকতারা অফিসে পাঠালেন তৎকালীন শুকতারা সম্পাদকের কাছে। চিরকুটে লিখে দিলেন আমাকে ছবি আঁকার জন্য গল্প দিতে। আমি তখন মনে ভাবছি যে আমি এতদিন ছবি আঁকার যে স্বপ্ন দেখেছি তা পূরণ হতে চলেছে। যা হোক আমি চিরকুট নিয়ে সম্পাদকের কাছে যেতে উনি আমাকে গল্পের ম্যানুস্ক্রিপ্ট দিলেন না, কাগজে লিখে দিলেন কী কী আর কীরকম ছবি করতে হবে। আমি সেটা নিয়ে এসে সেদিনই তিনটি ইলাসট্রেশন এঁকে নিয়ে পরদিন গিয়ে দিয়ে দিলাম এবং সঙ্গেসঙ্গেই ছবির পারিশ্রমিক পেয়ে গেলাম। সেই শুরু হল আমার দেব সাহিত্য কুটীরের সঙ্গে যোগাযোগ যা আজও অব্যাহত। ওখানেই আমি তৎকালীন বড়ো শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবন্ধু রায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সমর দে এঁদের দেখেছি। কারণ কর্মসূত্রে ওঁরাও কেউ-না-কেউ আসতেন। সেইসূত্রেই দেখা এবং পরে পরিচয়। ওখানে আরও একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তিনি অধুনা প্রদীপ সরকারের পিতৃদেব জাদুকর পি. সি. সরকার। উনি আমাকে সঙ্গে করে ওঁর বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন প্রদীপ খুব ছোটো।
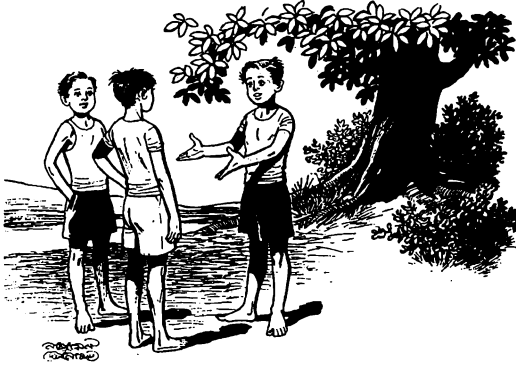
যাক ওসব, এবার আসি ছবি আঁকার ব্যাপারে। তখন পুরোদমে ছবি আঁকা চলছে। সবই গল্পের ছবি, ইলাসট্রেশন। প্রথম দিকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট দিতেন না, পরে গল্পের ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেওয়া শুরু হল। গল্প বাড়িতে এনে পড়ে ভালো জায়গা মতো ছবি এঁকে দিতাম। এইভাবে চলতে চলতে একদিন সুবোধবাবুর ছোটো ভাই ক্ষীরোদবাবু আমাকে বললেন যে বাংলায় তো ছোটোদের কোনো কমিক্স মানে ছবি দিয়ে গল্প নেই। আপনি কি পারবেন? আমি বলে দিলাম, পারব। আমার মনে তখন আমাদের দোকানের সামনে বসে যে তখনকার আমার বয়সের ছেলেরা রাস্তায় খেলা করতে করতে যে দুষ্টুমি করত সেগুলি মনে পড়ল। আমি সেগুলি গল্পাকারে সাজিয়ে তারপর ছবির সাহায্যে তাকে 'ছবিতে গল্প' তৈরি করে হাঁদাভোঁদার কাণ্ডকারখানা নাম দিয়ে করে দিলাম। এবং প্রতি মাসেই নতুন নতুন কাহিনি বেরোতে লাগল। এর কয়েক বছর পরে ক্ষীরোদবাবু আমাকে আরও একটা ছোটোদের জন্য কমিক্স করতে বললেন। তখন আমি অনেক ভেবেচিন্তে 'বাঁটুল দি গ্রেট' নাম দিয়ে একটা কমিক্স করে দিলাম। এখনও সেই হাঁদা-ভোঁদার কাণ্ডকারখানা আর 'বাঁটুল দি গ্রেট' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এইভাবে চলতে চলতে একদিন কিশোর ভারতী পত্রিকার প্রকাশক এবং সম্পাদক দিনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখন প্রায়ই কলেজ স্ট্রিটে যেতাম। ওখানে প্রকাশকের অনুবাদ বইয়ের, অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বইয়ের প্রচ্ছদ, ভেতরের ছবিও করে দিয়েছি। যাইহোক দিনেশবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। উনি আমাকে ওঁর বড়ো ছেলে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটা চিত্রকাহিনির ছবি করে দিতে বললেন। না-হলে উনি খুব বিপদে পড়ে যাবেন। সে-কাহিনি পত্রিকার দ্বিতীয় বছরের পূজাসংখ্যায় যাবে। যাইহোক সে সময় অসুবিধা সত্ত্বেও আমি সেই চিত্রকাহিনির ছবি এঁকে দিয়েছিলাম। এরপর একদিন দীনেশবাবু ডেকে বললেন, ওটা তো উদ্ধার হল কিন্তু এবার প্রতি মাসে চাই। তাই তাঁর অনুরোধে শুরু হল কিশোর ভারতী পত্রিকায় 'নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি', যা আজও সমানে প্রকাশিত হয়ে চলেছে প্রতিমাসে। আজ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে ওই সময়ই আনন্দমেলার প্রতিষ্ঠাতা বিমল ঘোষ (মৌমাছি) আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলার পাতায় 'রবিছবি' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে প্রতি সোমবার বিমলদার লেখা আর আমার আঁকা চিত্রকাহিনি বের করতেন। তারপর বেরিয়েছিল 'রাজার রাজা' নাম দিয়ে বিবেকানন্দের চিত্রকাহিনি।

পয়লা বৈশাখ অনেক প্রকাশনা সংস্থা নতুন বই প্রকাশ করেন। দেব সাহিত্য কুটীর পয়লা বৈশাখ শুকতারা অফিসে সে সময়কার নামি সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। আমিও যেতাম, তবে আমি তখন সেখানে নতুন, বয়সেও ছোটো। সেই আসরে তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং তখনকার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের আমি দেখেছি। তখন দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী প্রতি বছর বিভিন্ন নামে বেরুত, তাতে ওঁদের লেখা থাকত। পরে আমি ওঁদের বার্ষিকীতে লেখা গল্পের অলংকরণ করেছি। এখন ওইসব পুজোবার্ষিকী আর বের হয় না। মাসিক শুকতারা পত্রিকাই পূজাসংখ্যা হয়ে বের হয়। দেব সাহিত্য কুটীর অফিসে আমি আরও এক তখনকার সাহিত্যিককে দেখেছি। তিনি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পরে জেনেছিলাম যে তিনি রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের বাবা।

এবার আমার কথায় আসি। ছেলেবেলায় আমি খুব সাঁতার কাটতে পারতাম। আমাদের বাড়ির গায়েই বেশ বড়ো পুকুর ছিল। সেই পুকুরে সাঁতার কাটা, স্নান দুই হত। তারপর একদিন ঠিক করলাম এবার গঙ্গায় স্নান করব। তখন কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রায় রোজই গঙ্গায় স্নান করতে যেতাম আর সেইসঙ্গে হত গঙ্গায় সাঁতার কাটা। আমাদের যে গঙ্গার ঘাট ছিল তার গায়ে ছিল কী-এক কোম্পানির বিরাট গুদাম। সেখানে বড়ো বড়ো ড্রামে কোনো জিনিস আসত আর সেগুলি আসত গঙ্গা দিয়ে বার্জ ভরতি হয়ে। তারপর গঙ্গা থেকে গুদামের ভিতর
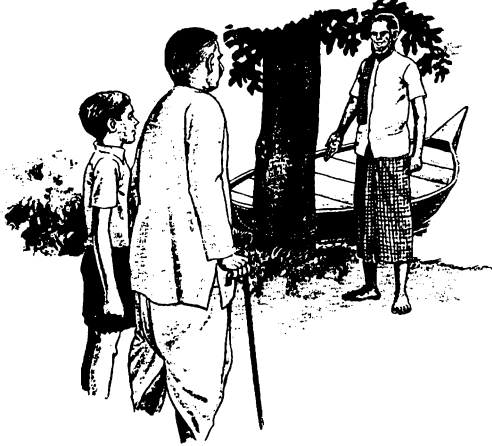
পর্যন্ত লম্বা একটা পুলের মতো স্ট্রাকচার ছিল। ওই স্ট্রাকচারে চাকা লাগানো ছোটো খোপের মতো ট্রলি থাকত; আর কোম্পানির লোকেরা সেই ট্রলি নিয়ে গঙ্গার ওপরে ড্রাম ভরতি দাঁড়িয়ে-থাকা বার্জের কাছে গিয়ে ওপর থেকে শিকল ঝুলিয়ে দিত আর বার্জের লোকেরা তিন চারটি ড্রামের খাঁজে শিকলে লাগানো হুক আটকে দিত তারপর আবার সেগুলি টেনে তুলে সেই স্ট্রাকচার বেয়ে গুদাম ঘরে ঢুকে যেত। গঙ্গার ওপরে পুলের যে অংশটা সেটা প্রায় তিনতলা সমান উঁচু। আমাদের বয়সি অবাঙালি ছেলেরা যারা স্নান করতে যেত তারা স্ট্রাকচারের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গঙ্গায় ঝাঁপ দিত। আমরা শুধু দেখতাম। একদিন মনে হল ওরা অত উঁচু থেকে যদি ঝাঁপ দিতে পারে তবে আমরা পারব না কেন? একদিন সেই ঝাঁপ দেওয়ার বাসনায় তো তিন বন্ধু মিলে ওপরে উঠলাম কিন্তু উঠে নীচের দিকে চেয়েই মাথা ঘুরে গেল। নীচে থেকে উপরের দিকে দেখতে একরকম কিন্তু উপর থেকে নীচের দিকে তাকালেই অন্যরকম মানে নীচেটা যেন অনেকই নীচে। আমার সঙ্গীরা বলল— ওরে বাবা, আমরা পারব না, কিন্তু আমার জেদ চেপে গেল। আমি বললাম যে, আমি লাফাবই। যাদের দেখেছি লাফাতে তারা যদি পারে তাহলে আমি পারব না কেন? এই মনে করে দিলুম ঝাঁপ। মনে হল যেন পড়ছি তো পড়ছিই। তারপর যখন জলে পড়লুম তখন মনে হল যে আমিও পেরেছি। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার সঙ্গীরা ওপর থেকে দেখছে। ওই গঙ্গা স্নানের সুবাদে আমাদের সঙ্গে একজন অবাঙালির বন্ধুত্ব হয়েছিল। গঙ্গার কাছাকাছি একটা ঘরে ওরা দু-ভাই থাকত। ওদের ঘরের পাশেই ওদের বালি সুরকির গোলা ছিল মনে আছে। এক বন্ধু কোনো কারণে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসে ওই অবাঙালি বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছুদিন থাকার পর হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হল। আক্রান্ত হওয়ার পর ওরা দু-ভাই যেভাবে সেবা যত্ন করে সারিয়ে তুলল তা ভোলার নয়। নিজের লোকেরাও কলেরার মতো রোগকে এড়িয়ে চলে কিন্তু ওরা তা করেনি। জানি না ওরা এখন কোথায় কিন্তু ওদের সেই বন্ধুত্বের কথা কোনোদিন ভোলার নয়।

পূর্ব বাংলায়ও আমাদের বাড়ি ছিল। আমার জ্যাঠামশাই সেখানে থাকতেন। ছোটোবেলায় আমি বাবা মায়ের সঙ্গে সেখানে কয়েক বছর অন্তর বেড়াতে যেতাম। পূর্ববাংলা নদী আর খালবিলের দেশ। মাস খানেক কি দেড়েক থাকতাম, বেশ ভালো লাগত। ওখানে প্রায় সব বাড়িতেই ডিঙি নৌকা থাকত, কারণ বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হল নৌকা ভরসা। আমাদেরও একটা ওইরকম নৌকা ছিল। বইঠা বা বাঁশের লগি দিয়ে নৌকা চালাতে হত। জানা না-থাকলে বইঠা বা লগি দিয়ে নৌকা বাওয়া যে সোজা নয় তা টের পেয়েছিলাম। একবার বর্ষাকালে গেছি। বাড়ির গা দিয়েই খাল গেছে। খালের দু-পাশে গাছ, দু-একটা পানের বরোজ। গাছের ডাল জলে এসে পড়েছে, ধারেকাছে বাড়ি ঘর নেই। তখনকার পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে দালানকোঠা প্রায় ছিলই না। বেশির ভাগই করোগেটেড টিনের বাড়ি। কাঠের ফ্রেমে আটকানো টিনের দেওয়াল। উপরে টিনের চাল। আর আমাদের যে-জায়গায় বাড়ি সেখান থেকে অন্য বাড়ি বেশ দূরে। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ। সেজন্য কারো বাড়ি দেখা যেত না। যাক যা বলছিলাম, একদিন ভাবলাম খালে নৌকা বেয়ে একটু ঘুরে আসি। খালে নৌকা ভাসিয়ে বইঠা নিয়ে তো বসলাম কিন্তু বইঠা দিয়ে বাঁ-দিকে খোঁচা দিলে নৌকা ডান দিকে বেঁকে যায় আর ডান দিকে মারলে বাঁ-দিকে বেঁকে যায়। কিছুতেই সোজা চালাতে পারছিলাম না। খালের জলে ডোবা ঝোপ আর গাছের ডালপালার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। কিন্তু হাল ছাড়িনি। কয়েকদিনের চেষ্টায় সফল হলাম। নৌকা ঠিক সোজা চলল। এর মধ্যেই আর এক ঘটনা। বলেছিলাম যে নৌকা চালাতে বাঁশের লগি ব্যবহার হত। ওই বড়োরা যে-লগি ব্যবহার করতেন আমি ছোটো বলে আমার পক্ষে ওই লগি দিয়ে নৌকা চালানো অসুবিধা হত। তাই ভাবলাম সরু বাঁশের লগি জোগাড় করতে হবে। আমাদের বাড়ির

থেকে সামান্য দূরে খাল পাড়ে পানের বরোজের গায়ে একটা বাঁশঝাড় ছিল সেখানে মোটা সরু দু-রকমের বাঁশই ছিল। ঠিক করলাম ওখান থেকেই কেটে আনব। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। বেলা দুপুর, সবাই ঘুমোচ্ছে, নৌকা বেয়ে বাঁশ ঝাড়ে গিয়ে একটু সরু মতো বাঁশ কেটে নিয়ে এলাম, পরে সবাই জিজ্ঞাসা করল। বাঁশ কোথা থেকে কেটে এনেছিস? জায়গা দেখিয়ে বললাম, ওই ওখান থেকে। দেখে বললেন, কী সর্বনাশ ওই বাঁশঝাড়ে যে ভয়ংকর বিষধর সাপের বাসা। তোকে যে কামড়ায়নি এই তোর ভাগ্য ভালো।

এইরকম আরও অনেক কথা মনে পড়ে। যখনকার কথা বলছি তখনও আমি ছবি আঁকার ব্যাপারে যুক্ত হইনি। সেই সময় আমরা দু-তিনজন বন্ধু মিলে সাইকেল চেপে চারদিক ঘুরে বেড়াতাম আর মাঝে মাঝেই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরতে যেতাম। তখন বোটানিক্যাল গার্ডেনের চেহারাই ছিল অন্যরকম। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন কারণ তখন তো এত লোক শহরে ছিল না। যাইহোক একদিন আমরা যথারীতি সাইকেলে বাগানে ঘুরতে গেছি। বাগানের বিখ্যাত বটগাছ চক্কর দিয়ে ফেরার সময় দেখি গাছপালার ফাঁক দিয়ে কোনো চকচকে জিনিসের

উপর রোদের আলো পড়লে যেরকম ঝিলিক দেয় সে-রকম ঝিলিক দিচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখি ছোটো একটা জলাধারের তিনপাড়ে তিনটে রাংতা লাগানো বোর্ড খাড়া করা রয়েছে। তাতেই রোদ পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে আর কিছু লোক ভিড় জমিয়ে কী দেখছে। আমাদের কৌতূহল হল যে ওখানে কী হচ্ছে? গিয়ে দেখি যে সিনেমার শুটিং হচ্ছে। ওই রাংতার আলো প্রতিফলিত হয়ে যারা অভিনয় করছে তাদের উপর পড়ছে। অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল নতুন। পরে অবশ্য সেই সিনেমাটা আমরা দেখেছিলাম— নাম শাপমুক্তি। তখনকার সিনেমা দেখেছি, কিন্তু সেই সিনেমার ছবি কী করে তোলা হয় তা দেখিনি। তাই সেদিন দেখে বেশ একটা আনন্দ পেয়েছিলাম।

আমি তখন যুবক। আমার ছোটো দুই বোন ছিল— বোনেদের মধ্যে যে ছোটো তার সঙ্গে বিয়ে হয় ফিল্ম লাইনের একজন এডিটরের সঙ্গে। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। ও এডিটিং-এ খুব নাম করেছিল। ওর পরিচয়ের মাধ্যমে সে সময় বেশ কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কয়েকজন আমার বাড়িতেও এসেছিলেন। একবার একজন পরিচালক আমাদের খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর একটা ছবির শুটিং দলের সঙ্গে আমরা ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম। সেখানে দিন তিনেক বেশ আনন্দে কেটেছিল। ওঁরা শুটিং করতেন আর আমরা ঘুরে বেড়াতাম। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আগে বলা হয়নি যেটা সেটা হল আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নানা ফেরিওয়ালা যেত তাদের মধ্যে চিনা ফেরিওয়ালাও থাকত। তারা চায়না সিল্কের ছিট কাপড় বিক্রি করত। ছিট কাপড় মাপার জন্য একটা লম্বা ধাতব স্টিক থাকত। আমরাও ওদের কাছ থেকে সিল্কের কাপড় কিনেছি। পরে ওদের নিয়েই একটা সিনেমা হয়েছিল 'নীল আকাশের নীচে' নামে। এ-রকম অনেক কিছু মনের অতলে তলিয়ে গেছে।

এই হল আমার যতটা মনে করতে পেরেছি তার স্মৃতিকথন। আমার আগে শুকতারায় যেসব শিল্পীর কথা বলেছিলাম তাঁরা কেউ আর ইহজগতে নেই। তাঁদের অভাব আর পূরণ হবে না। আর আমার যে কয়জন বন্ধু ছিল তাদেরও বেশির ভাগই আর ইহজগতে নেই। আছে শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি! আমিও এখন বয়স ভারাক্রান্ত, তবু ছোটোদের ভালোবাসি বলে এখনও তাদের জন্য তুলিকলম ছাড়তে পারিনি। বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে মানুষ আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছি। মানুষের ভালোবাসা পাওয়াটাই আমার কাছে সব থেকে বড়ো পাওনা।

অলংকরণ : নারায়ণ দেবনাথ
(বিভিন্ন পত্রিকা থেকে নেওয়া)

নারায়ণ দেবনাথের কর্মজীবনের প্রথম বছরের অলংকরণ
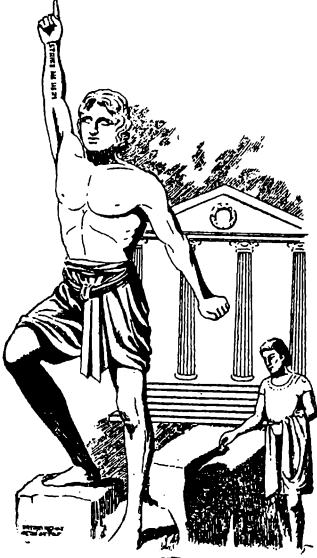
১৯৫০ সাল নাগাদ নারায়ণ দেবনাথ অলংকরণ শিল্পী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকার পাতায়। সুদীর্ঘ ৬২ বছর আগের শিল্পীর কর্মজীবনের প্রথম বছরের আঁকা দুর্লভ কিছু অলংকরণ।

1962
2012 ...
অর্ক পৈতণ্ডী